মানব মনের গতি-প্রকৃতি

ডাঃ মোহিত কামাল

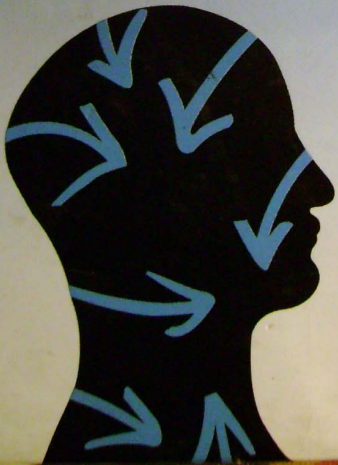

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মন কী? কোথায় থাকে মন?
মন নিয়ে আমরা কতটুকু সচেতন? কতটুকু ভাবি সুস্থ মনের গতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে? মনের আবেগের অনুষঙ্গগুলো জীবনের গতি-প্রবাহ নানানভাবে প্রভাবিত করে। দুঃখ-কষ্ট, বিষণ্নতা, রাগ-ক্রোধ, সন্দেহ, ঘৃণা প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগের জালে আমরা জড়িয়ে পড়ি।
ফলে দেহের ক্ষতি হয়। মনের ক্ষতি হয়। সামাজিক সমস্যা বেড়ে যায় আমাদের জীবনে। কতটুকু জানি সেই ক্ষতি সম্পর্কে? কীভাবে রক্ষা করা যাবে মন, দেহ?
সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল থেকে কতটুকু লাভবান হতে পারি আমরা? পজিটিভ ইমোশন কীভাবে আমাদের গতিশীল করে, কীভাবে দক্ষতা বাড়ায়, কীভাবে মানবীয় বন্ধন সমৃদ্ধ করে। জয়ের মুকুট কীভাবে ছিনিয়ে আনা যায় ইতিবাচক আবেগের গভিতে। ভালোবাসা, ক্রোধ, হাসি, কান্নায় কী। ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে দেহে। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে বইটিতে। গদ্য এবং গল্প বলার ঢংগে মনের নানা প্রেক্ষাপটের ওপর দিয়ে ছুটে গেছেন লেখক। বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপসংহার টেনেছেন বিজ্ঞানের আলোকে। উপস্থাপনার কৌশলটি লেখকের লেখালেখির নিজস্ব ধারা। সচেতন জনগণ এবং যারা লেখালেখি কিংবা অভিনয় করেন সবার জন্য মনের বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গগুলো জানার প্রয়োজন রয়েছে। নবীন এবং প্রবীণ লেখকরা বিষয় ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো জানার মাধ্যমে নিজেদের লেখালেখিতে যোগ করতে পারেন নতুন মাত্রা।
বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, মানসিকচাপ এড়ানোর কৌশলসহ মনের রোগ সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কুসংস্কারের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে মনের দাবী। মনের চাওয়া।

মানব মনের গতি-প্রকৃতি

ডা. মোহিত কামাল

সহযোগী অধ্যাপক (সাইকো)

মনোরোগ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই ২০০১
তৃতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
স্বত্ব
মাহবুব ময়ুখ রিশাদ (রিশাদ ময়ুখ)
জিদনি ময়ুখ (স্বচ্ছ)
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
কম্পোজ
শাওন কম্পিউটারস
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (৪র্থ তলা)
দাম
একশ' চল্লিশ টাকা
ISBN 984-422-055-9

Manob Moner Goti Prokriti
Dr. Mohit Kamal

Wherever you go away
take a piece of me
....
....
Whenever you with me
have a soft touch
have a warm breathing

...দের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

...শুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কীভাবে ধারালো করা যাবে
...নঅ্যাটাক অনিদ্রা ও মাথাব্যথা

লেখকের কথা

মন কোথায় ?

প্রশ্নটির উত্তর পেতে নিরন্তর শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন গবেষকরা। জানা যাচ্ছে ব্রেইনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই মনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

দেহের যেমন আছে সুস্থতা-অসুস্থতা, মনেরও তেমনি রয়েছে সুখ-অসুখ। দেহ-মনের উভয় অসুখের জন্যই আছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, অথচ মনের সমস্যা নিয়ে প্রচলিত আছে নানা ধরনের কুসংস্কার, মিথ।

নতুন শতাব্দীতে মিথের কালো দেয়াল ভেঙে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

মন বুঝতে হলে মনের সুস্থতার বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে। বুঝতে হবে আবেগ ও আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলো। সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য কিংবা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলোর বিষয়ে 'বেসিক' ধারণা থাকা খুবই জরুরী।

আবেগীয় উপাদানগুলো মানব মনকে কীভাবে প্রভাবিত করে বিষয়টি নিবন্ধ কিংবা গল্পাকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি বইটিতে। প্রতিটি অধ্যায়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে নিজস্ব স্টাইলে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যা, পর্যালোচনা এবং উপস্থাপনের কৌশলটি এসেছে আমার দীর্ঘদিনের লেখালেখির অভ্যাস, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার আলো থেকে।

ভালোবাসা, হাসি, কান্না, ক্রোধ, দুঃখ-বিষাদ, ঘৃণা, অবিশ্বাস নানারূপে মানুষের জীবন প্রবাহের ছোট ছোট গাঁথুনি গড়ে তোলে। কখনো এই গাঁথুনির শক্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা উল্লসিত হই, কখনো আবার বিপর্যস্ত হয়ে যাই, ভেঙে পড়ি।

দ্বন্দ্ব-হতাশা, মানসিক চাপ আমাদের নিত্যসঙ্গী। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, উত্তর পাওয়া যাবে বইটিতে। বেকারত্বের তীব্র দহন, ডিপ্রেশন এবং মনের জটিল ব্যাধি সিজোফ্রেনিয়া নিয়েও সহজ আলোচনা করা হয়েছে, সহজ কৌশলে মূল ইস্যুগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি বিষয়ক দু'টি নিবন্ধও আছে বইটিতে।

কৌতূহলী পাঠকের মনের বৈজ্ঞানিক খোরাক জোগানোই মূল উদ্দেশ্য। যারা নবীন লেখক কিংবা প্রবীণ অথবা অভিনয় শিল্পী সবার জন্যই বইটির মূল অনুষঙ্গগুলো জানার

Personal Library
Book No.........

প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। মনে রাখা জরুরী, রহস্যময় মনের একবিন্দু আলো হয়ত দেখা যাবে বইটিতে। আলোকবিন্দুটি পুরোপুরি বিজ্ঞান নির্ভর।

লেখার কৌশল সম্বন্ধে যারা উৎসাহ দিয়েছেন সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, শৈলী'র সম্পাদক কবি কায়সুল হক, প্রথম আলো'র গিয়াস আহমেদ, চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক শিশির দত্ত ও দৈনিক আজাদীর আনন্দন সম্পাদক রাশেদ রউফের কথা।

সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার সহকর্মী ডাঃ মোঃ এনায়েত করিম, ডাঃ মোঃ ফারুক আলম ও ডাঃ তন্ময় প্রকাশ বিশ্বাসের প্রতি। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই 'অন্যদিন'-এর প্রতিবেদক আহমেদ শাহবুদ্দীনকে।

বইটি প্রকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভালোবাসা জানাচ্ছি বিদ্যাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী মজিবর রহমান খোকার প্রতি।

সবার জন্য ভালোবাসা।

বইটির বিষয়ে যে-কোনো মতামত, আলোচনা, সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

ডা. মোহিত কামাল
সহযোগী অধ্যাপক (সাইকো)
মনোরোগ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১-৮৩২৯৫৫

চেম্বার ঃ কনসালটেন্ট
সেন্ট্রাল হসপিটাল লিমিটেড
এনেক্স বিল্ডিং ঃ ২ (ফিজিওথেরাপি ভবন)
বাড়ি # ২, রোড # ৫, ধানমন্ডি, ঢাকা, (১৮ গ্রীণ রোড)
ফোন ঃ নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য
৯৬৬০০১৫-১৯, ৮৬২৪৫১৪-৮, এক্স ২২১৪, ৮২০১
মোবাইল ঃ ০১৭৬-১০৪৭৯৫
কনসালটেশন : বিকাল ৫টা-৯টা
সাইকোথেরাপি ঃ পৃথক সিডিউল অনুযায়ী
(ছুটির দিন বন্ধ)

সূচিপত্র

মন ঃ সুস্থ মনের স্বরূপ সন্ধানে ১১
আবেগের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ ঃ কেন জানতে হবে আবেগের গতি-প্রকৃতি ১৭
কোথায় সুখ কোথায় দুঃখ ৩১
ভালোবাসার ব্যবচ্ছেদ ঃ ভালোবাসার রসায়ন ৩৫
প্রসঙ্গ ব্রেইন, নিউরোট্রান্সমিটর, হরমোন
ইরোটোম্যানিয়া ঃ ভালোবাসার অলিক বিশ্বাস ৪৬
মনের সন্দেহ ॥ প্যাথলজিক্যাল জেলাসি ঃ ওথেলো সিনড্রম ৫১
মনের শক্তি ঃ জয়, ভালোবাসার জয় ৫৬
মনের চাওয়া ঃ ভালোবাসা, লোভনীয় ভালোবাসা ৬৪
ক্রোধের রসায়ন ঃ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল ৬৯
কান্নার রসায়ন ঃ কান্নার ফলাফল ৮৪
বিষণ্নমনের গতি-প্রকৃতি ঃ কালো মেয়ে মিষ্টি মেয়ে ৮৮
হাসির রসায়ন ঃ হাসির ম্যাজিক ৯৩
বৃষ্টিধারায় ভেজা মন, ভেজা দেহ ঃ কেন ভিজতে ইচ্ছে করে ৯৭
মনের দ্বন্দ্ব, মনের হতাশা ঃ প্রশান্তিময় মন পাওয়া কি সম্ভব? ১০০
কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ঃ নিজেকে রক্ষা করার কৌশল ১১১
ডিপ্রেশন ॥ প্রসঙ্গ ঃ বেকারত্ব ও কর্মক্ষেত্রে জটিলতা ১১৫
উৎপাদনশীল কাজের পরিবেশ নির্মাণের কৌশল ১২০
প্রসঙ্গ ঃ মানসিক স্বাস্থ্য ও ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স
মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন কাজের নিশ্চয়তা ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা ১২৪
মানসিক চাপ মুক্ত পরিবেশ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে ১৩১
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান ঃ মানসিক রোগীদের কাজের দক্ষতা বজায় রাখে ১৩৩
মনের স্বাস্থ্য সমস্যা ঃ প্রচলিত মিথ ও বৈজ্ঞানিক সত্য ১৩৫
ভুল সংবাদ, মনের চাপ ও প্রতিক্রিয়া ॥ প্রসঙ্গ ঃ রেজাল্ট ১৩৮
কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানমনস্ক মন ঃ কল্পনার রথে যখন ভেসে যায় ওরা দুজন ১৪৮
মনের ঘৃণা ও ভালোবাসা ঃ প্রসঙ্গ ॥ ছোবল ১৫৯
মনের চাওয়া, দেহ নাকি ভালোবাসা ঃ প্রসঙ্গ ॥ ভিতরের চোখ ১৭০
মনের একটি জটিল ব্যাধি ঃ সিজোফ্রেনিয়া ১৮২
মনের ব্যায়াম ঃ স্মরণ শক্তি যেভাবে শাণিত করা যায় ১৯০
মনের চর্চা ঃ বুদ্ধি যেভাবে ধারালো করা সম্ভব ১৯৬
দ্বন্দ্ব হতাশার ভিতর বাহির ঃ কীভাবে এড়াবেন মানসিক চাপ ২০৫

মন ঃ সুস্থ মনের স্বরূপ সন্ধানে

পিউ একটি ঝলমলে তরুণী, সুন্দরী, অনিন্দ্য সুন্দরী। কেবল বাইরেই নয়, ভেতরেও সুন্দর।

সুন্দর মুখের মায়াময় আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না উপল। দিনে দিনে কাছে আসে। ঘনিষ্ঠতা জমায়।

পিউ'র নান্দনিক ফিগারের চুম্বকীয় টানই এখানে মুখ্য নয়, মনের ঔদার্য, বিশালত্বও গুরুত্বপূর্ণ।

উপল বিমোহিত, মুগ্ধ। ভালো লাগার তীব্র দহনে পুড়ছে, জ্বলছে। জ্বলে-পুড়ে কী খাঁটি সোনায় পরিণত হচ্ছে?

না, কিছুই জানে না সে।

পিউ তাকে নিয়ে কী ভাবে? ওর অতলে কী ভালো লাগার কোনো ছাপ ফেলতে পেরেছে? দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে উপল। মুখ ফুটে কিছুই বলে না। বলতে পারে না বলেই পিউ'র কমনীয়তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য অভিব্যক্তির সামনে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে থাকে।

অথচ কী আশ্চর্য! সব বিচরণক্ষেত্র, ক্লাস কিংবা আড্ডায়, যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে একদম স্বাভাবিক থাকে পিউ। মুখে হাসি লেগেই থাকে, নিজের মাঝে ফুটিয়ে রাখে লাবণ্যময় এক প্রতিচ্ছবি। সবার সঙ্গে সমান তালে মিশতে পারে, যে-কোনো কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারে, গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সবার সঙ্গেই সুসম্পর্ক ধরে রাখতে পারে সে। জীবনের দাবি মেটানো যেন অতি তুচ্ছ একটি ব্যাপার।

পিউকে না দেখলে সাবলীল জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয়তো পাওয়া সম্ভব হতো না। ওকে দেখে-দেখেই নিজেকে একটু শক্ত রাখার চেষ্টা করে উপল।

কিন্তু আজকাল যে কী হয়েছে।

পড়ায় মন বসে না। কোনো কাজেই মন স্থির হয় না। অল্পতেই রেগে যায়, মেজাজ খিটমিটে হয়ে যাচ্ছে। খেতে ইচ্ছে করে না। ঘুমও হয় না। বিছানায় ছটফট করতে করতে রাত পার করে দেয়।

ব্যাখ্যা

সুপ্রিয় পাঠক আসুন, পিউ এবং উপল দু'জনের মনকেই আমরা বৈজ্ঞানিক সূত্রের আলোকে ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করি।

'দেহ' ও 'মন' মিলেমিশে একাকার, একইসূত্রে এবং একই ছন্দে গাঁথা। বুকের বাম দিকে আলতো করে হাত রেখে আমরা হৃদয়ের কথা বলি, মনের অভিব্যক্তির স্থান নির্ধারণ করি।

'মন' কী, কোথায়?

আসলে মন ব্রেনেরই অংশ; চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দেহ আমরা দেখি, মন দেখি না। আবেগ, অনুভূতি, আচার-আচরণ এবং নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই 'মনের' চিত্রটি বাইরে বেরিয়ে আসে, প্রতিভাত হয়।

দেহের আছে সুস্থতা, অসুস্থতা। মনেরও তেমনি রয়েছে সুখ, অসুখ।

দেহ অসুস্থ হলে দেহের কলকব্জায় ওলোটপালোট কিছু ঘটলেই আমরা উদ্বিগ্ন হই, ছুটে চাই চিকিৎসকের কাছে।

আর মন যখন বিগড়ে যায়, তখন নানারকম উদ্বিগ্নতা, অসংলগ্নতা এবং হতাশায় আক্রান্ত হই। সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার কটাক্ষ, টিটকারী তো আছেই। উপেক্ষিত হয় মনের দাবি।

চিকিৎসা যে মনেরও হতে পারে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবেই আমরা সচেতন নই, আমাদের সমাজও অন্ধ, উন্নত দেশগুলোর মতো মানসিক স্বাস্থ্যকে মূল্যায়ন করার মতো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে প্রচেষ্টা চলছে। অচিরেই অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের অবহেলা, অন্ধত্ব এবং অজ্ঞানতার সুযোগে ছোট ছোট আঘাত মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে। সেই ক্ষত ক্রমে ক্রমে ফুলে ফেঁপে ওঠে, প্রকট আকার ধারণ করে। তীব্র এবং জটিল মানসিক সংকটের সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ বিশ্বব্যাপী উন্নততর হচ্ছে। দেহের নানারোগের যেমন চিকিৎসা হয়েছে, সব ধরনের মানসিক সংকটেও তেমনি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা রয়েছে।

আমরা পিউকে দেখলাম, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। এখানে স্বাস্থ্য বলতে সুস্থ দেহের কথা বলা হচ্ছে। দেখার বাইরে থেকে যাচ্ছে পিউ'র বিশাল আর একটি জগৎ 'মন'। এই আলোকেই বলা যায়, সে মানসিকভাবেও স্বাস্থ্যবতী। সুস্থ মনের অধিকারিণী।

'মানসিক স্বাস্থ্য' শব্দটি শুনেই চমকে উঠলেন কি? না চমকানোর কোনো কারণ নেই। কারণ 'মানসিক স্বাস্থ্য' মানেই মানসিক কোনো রোগ নয়। আরো জেনে রাখুন, মানসিক রোগ না থাকাকেই মানসিক স্বাস্থ্য বলে না।

পিউ'র মনে শান্তি আছে, সুখ আছে, আছে আনন্দ ও তৃপ্তি। মনের তৃপ্তি আছে বলেই দৈহিক গড়নেও সে নিখুঁত, লাবণ্যময়। পিউ সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে ইমেজ সৃষ্টি করেছে, তার প্রকাশভঙ্গিই হলো 'মানসিক স্বাস্থ্য'। অর্থাৎ, বলা যায় 'মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে সেই পথ, যে পথ ধরে প্রত্যেক মানুষ তার ইচ্ছা, লক্ষ্য, ক্ষমতা, আদর্শ, অনুভূতি, চেতনা ইত্যাদি একসুরে ও ছন্দে এমনভাবে বাঁধে যাতে করে জীবনের দাবি পূরণ হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা ভালো যে, মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা মানসিক সুস্বাস্থ্যের প্রমাণ হিসেবে এককভাবে সুস্পষ্ট। বলা যায়, মানসিক সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে পরিচ্ছন্ন কোনো বিভাজন রেখা নেই। একজন সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, উত্তর পেলেই সুস্থতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

পিউ

পিউ আমাদের সামনে একটি মডেল। ওর বৈশিষ্ট্যগুলোই মানসিক সুস্থতার পরিমাপক। আসুন, আমরা পিউ'র সকল অনুভূতিগুলো জেনে নেই। নিজের অনুভূতিগুলো যাচাই করে তুলনামূলক বিচারে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যটিও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি।

১. নিজের সম্পর্কে পিউ'র অনুভূতি খুবই স্বচ্ছ।

ভয়, ক্রোধ, ভালোবাসা, ঈর্ষা, অপরাধবোধ, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি আবেগ তাকে ধুম্রজালে আবদ্ধ করতে পারে না।

চলমান জীবনের নানা স্তরে হতাশাপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে, কাটিয়েও উঠেছে সহজে।

অন্যের প্রতি পিউ'র রয়েছে সহিষ্ণুতা, নিজের অন্তর্দৃষ্টিও গভীর। সব ধরনের পরিস্থিতি হাসিমুখে গ্রহণ করার রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা।

নিজের ক্ষমতা, অক্ষমতা সম্পর্কে সে খুবই সজাগ। স্বীয় সামর্থ্যকে ছোট বা বড় করে মূল্যায়ন করে না। আপন অক্ষমতা কিংবা দুর্বলতাকে মেনে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারণী সে।

ওর আত্মসম্মানবোধও প্রখর। সম্মানহানি ঘটতে পারে এমন পরিস্থিতি বাস্তবতার নিরিখে বিচার করার ক্ষমতাও অনুসরণযোগ্য।

কখনই মন খারাপ করে থাকে না সে। সাধারণ এবং নৈমিত্তিক বিষয় থেকে অতি সহজেই কুড়িয়ে নিতে পারে আনন্দ, তৃপ্তি।

২. পিউ অন্যদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

সে অপরকে আপন করে নিতে পারে, অন্যের স্বার্থকে বিচার করতে পারে সহজভাবে।

অন্যদের পছন্দ করে সে। বিশ্বাস করে। অন্যরাও তাকে পছন্দ করে, এই বিশ্বাসের ঘাটতি নেই তার মাঝে।

মানুষে মানুষে রয়েছে নানারকম পার্থক্য। বিদ্যমান পার্থক্যগুলো পিউ সনাক্ত করতে পারে, সম্মান করতে পারে।

অপরের ভালো মানুষির সুযোগ নেয় না সে। অপরও যেন সুযোগ নিতে না পারে সে ব্যাপারেও সচেতনতার অভাব নেই তার।

নিজেকে সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মনে করে, তাই আশপাশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ সে।

৩. জীবনের দাবি পূরণ করার সব ধরনের গুণাবলী রয়েছে পিউ'র।

যে-কোনো সমস্যায় ভেঙে পড়ে না সে। সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করে, সমাধানও করতে পারে সহজে।

দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও সে সচেতন। দায়িত্ব স্বীকার করে সহজেই পরিবেশকে আপন করে নিতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতেও অতুলনীয়।

পিউ সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়, আগাম পরিকল্পনা করে, ভবিষ্যতকে ভয় পায় না, নতুন অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে স্বাগত জানায়।

নিজের মেধা খাটিয়ে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে নিপুণভাবে, নিজস্ব বিষয়েও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সঠিক সময়ে। ফলে কাজে সচেষ্ট থাকে। সন্তুষ্টিও লাভ করে নিজের কাজের ভেতর থেকে।

উপল

এতোক্ষণ পিউ'র মনের অলিগলি বিচরণ করে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করলাম। এবার আসুন, উপলকে বিশ্লেষণ করে দেখি।

উপল সুদর্শন, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, শারীরিক কোনো খুঁত নেই তার।

কিন্তু এখন ভালো লাগার মোহময় পরশে ডুবে আছে সে। নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারছে না, সিদ্ধান্তে দোদুল্যমান।

প্রতিনিয়তই পিউ'র চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, ওকে দেখা, ওর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য ব্যাকুল থাকে। সমগ্র চেতনাজুড়ে যেন ধারাল সুন্দরী মেয়েটি আসন গেড়ে শক্ত করে বসে আছে।

উপল ব্রিলিয়ান্ট। তীক্ষ্ণ মেধাবী। পড়ার সময় নিমগ্ন একাকীত্ব নিয়ে ডুবে থাকতো বইয়ের ভেতর। এখন যেন হারিয়ে গেছে সেই অভ্যাস। একাগ্রতা নেই, মনও নিবিড় করে সেঁটে থাকে না বইয়ের পাতায়। ফলে যা পড়ছে ভুলে যাচ্ছে সহজে, concentration নেই বলেই স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয় মাথায়, ঘুমের সমস্যা হচ্ছে, খাওয়ার রুচিও কমে যাচ্ছে।

এবার আমরা কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি?

পিউ'র মনকে ব্যবচ্ছেদ করে 'সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের' যে প্রমাণ পেয়েছিলাম এক্ষেত্রে তার ঘাটতি লক্ষ্য করছি। উল্টো উপসর্গও দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে কি বলা যায় ভালো লাগা বা ভালোবাসা অসুস্থ মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ?

দুটো উত্তর।

প্রথমত 'ভালো লাগা' কিংবা 'ভালোবাসা' মনের এক ধরনের আবেগীয় অবস্থা। স্বাভাবিক আবেগীয় অনুভূতি মানেই অসুস্থতা নয়। দ্বিতীয়ত ভালো লাগা বোধটুকু সফলতার চূড়া স্পর্শ করতে পারছে না বলে মানসিক অস্থিরতা এবং শারীরিক কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে উপলের ভেতর। তার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে। জীবনযাত্রার এই পতনই সাধারণ মানসিক অসুস্থতার দিকে উপলকে টেনে নিচ্ছে।

তাহলে কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় উপল মানসিকভাবে অসুস্থ?

সুস্পষ্ট উত্তর জানার পূর্বে চলুন আমরা বিশ্বের বহুল আলোচিত প্রিন্সেস ডায়ানা এবং প্রিন্স চার্লসের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের দিকে নজর দেই।

বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে উভয়ই জীবনের কঠিনতম সংকটজনক একটি অধ্যায় অতিক্রম করেছিলেন। মানসিক স্বাস্থ্যে ধস নামলেও ভেঙে পড়েননি, উভয়ই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, সাইকোথেরাপি গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে ঘটমান জীবন প্রবাহের জটিলতা কাটিয়ে সুস্থ জীবনযাপনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েননি ডায়ানা, স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করেছিলেন। দু'জনই কেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট গেলেন?

আপনার মনে কি প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন?

মানসিক অসুস্থতা মানেই উন্মাদগ্রস্ততা নয়। চলমান জীবনে প্রতিটি মানুষের জীবনে এ ধরনের সংকট জটিলতা acute stress disorder কিংবা reactive depression আসতেই পারে। প্রাথমিক অবস্থায় সমস্যার সমাধান না হলে দীর্ঘমেয়াদী

মানসিক অস্থিরতা চলে আসতে পারে। তাই একা একা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না পারলে মনের চিকিৎসার জন্য সচেতনতা বাড়ানো উচিত। যেমনটি করেছেন ডায়ানা এবং চার্লস।

মনোরোগ চিকিৎসক, থেরাপিস্ট বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেবেন, সংকট উত্তরণের বৈজ্ঞানিক পন্থাটি খুঁজে দেবেন। মনে রাখতে হবে, সব ধরনের মানসিক অসুস্থতা কিংবা সংকটের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং সমাধান রয়েছে।

উপলের জীবনেও এসেছে এমনি একটি সংকটজনক পরিস্থিতি। সে হয়তো নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে, খাপ খাইয়ে নিতে পারবে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়, হয়তো সফল হবে তার মনের চাহিদা।

বিফল হলেই তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। সে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে। কেবল প্রয়োজন সচেতনতার, ব্যক্তি এবং সমাজের সচেতনতাই মুখ্য। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে আমাদের, সমাজে উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই জরুরি।

এতক্ষণে নিশ্চয় একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মানসিক রোগী মানেই পাগল নয়। 'পাগল' শব্দটি ব্যবহার করে আমরা একটি সামাজিক অপরাধ করছি। কারণ এতে সামাজিক আচরণ স্থূল হয়ে পড়ছে। এই স্থূলতার কারণে 'মন' নিয়ে কারো সমস্যা হলে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে সুস্থ হওয়ার পথে ভ্রান্ত একটি সামাজিক দেয়ালে বাধা পাচ্ছে। লোক লজ্জার বক্রহাসি, কটাক্ষ উপেক্ষা করে সাধারণ নিউরোটিক রোগীরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য যেতে পারছে না। এভাবেই মানুষ তিলে তিলে ভোগে, 'মন'কে অবহেলা করে, আরো গভীরতর সংকটে ডুবে যায়।

শারীরিক এমন অনেক উপসর্গ, ব্যথা আছে যার কোনো দৈহিক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগীরা কেবল চিকিৎসকের পর চিকিৎসক বদলান, গণ্ডায় গণ্ডায় ইনভেসটিগেশন করান, রোগ ধরা পড়ে না।

জেনে রাখা ভালো, এমন অনেক উপসর্গই মনোজাত। এ ধরনের পরিস্থিতিতেও মানসিক চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

আর নয় অনাদর, অবহেলা। এবার চাই 'মন' নিয়ে সচেতনতা, চাই উন্নত সমাজ, উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য।

আবেগের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ
কেন জানতে হবে আবেগের গতি-প্রকৃতি

মানুষ আবেগ প্রবণ। মানুষ চিন্তাশীল।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মানবজাতি অনন্য। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এই বিশিষ্টতা দানা আঙ্গিক থেকে মানুষকে আলাদাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের জীবন-যাপনের মূলে রয়েছে আবেগের বড় ধরনের প্রভাব। কথাবার্তায় ঠাসা থাকে আবেগের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন উপাদান।

আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, ভয়ে আতংকগ্রস্ত হই, ঈর্ষায় ডুবে যাই, ঘৃণায় কুঁকড়ে থাকি অথবা উল্লাসে ফেটে পড়ি। এভাবে আবেগ বা ইমোশন আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা, আনন্দ-বেদনাকে নান আঙ্গিক থেকে রঞ্জিত করে।

আবেগহীন কাজ, আচরণ মানুষকে মানায় না। রোবটই আবেগ ছাড়া সব কাজ করতে পারে। রোবটের সাহায্যে অনেক কাজ করানো গেলেও আবেগীয় উপাদানকে কর্মোদ্দীপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বিজ্ঞানীরা এখনো ব্যর্থ হয়ে চলেছেন। এ কারণেই বিভিন্ন গবেষণায় ইমোশনকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

ইমোশন ও মোটিভেশন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

প্রথমে ইমোশন সৃষ্টি হয়, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় মোটিভেটেড আচরণ। মোটিভেশনের ভেতর আছে চাহিদা, আগ্রহ এবং উৎসাহ। এই অনুষঙ্গগুলো মানুষকে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে, লক্ষ্যে পৌছায়। সফলতা অর্জনের একটি বড় সাঁকো হলো ইমোশন সৃষ্টি, মোটিভেটেড আচরণ।

ইমোশনের সঙ্গে মোটিভেশনের সম্পৃক্ততার নানা উদাহরণ হাজির করা যায়। বলা হয়ে থাকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং মমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে যৌন আচরণ, ক্রোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে সহিংস আচরণ, ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্পৃক্ততাই নিরংকুশ কিছু নয়। ব্যতিক্রমও আছে। স্পর্শকাতর অনুভূতি ছাড়াও যৌন আবেদন আসতে পারে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত বা প্রযোজ্য নয় এমন ক্ষেত্রেও যৌনতার অস্বাভাবিক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে।

পক্ষান্তরে বলা যায়, যৌন আকর্ষণ ছাড়াও ভালোবাসা যায়, সহিংসতা ছাড়াও রাগ জাগতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আবেগই উদ্দীপ্ত করে মোটিভেটেড আচরণ। আবেগের কারণেই লক্ষ্যে পৌছার দুর্নিবার তাগিদ জাগে মানুষের মনে।

মানসিক অস্থিরতা চলে আসতে পারে। তাই একা একা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না পারলে মনের চিকিৎসার জন্য সচেতনতা বাড়ানো উচিত। যেমনটি করেছেন ডায়ানা এবং চার্লস।

মনোরোগ চিকিৎসক, থেরাপিস্ট বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেবেন, সংকট উত্তরণের বৈজ্ঞানিক পন্থাটি খুঁজে দেবেন। মনে রাখতে হবে, সব ধরনের মানসিক অসুস্থতা কিংবা সংকটের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং সমাধান রয়েছে।

উপলের জীবনেও এসেছে এমনি একটি সংকটজনক পরিস্থিতি। সে হয়তো নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে, খাপ খাইয়ে নিতে পারবে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়, হয়তো সফল হবে তার মনের চাহিদা।

বিফল হলেই তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। সে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে। কেবল প্রয়োজন সচেতনতার, ব্যক্তি এবং সমাজের সচেতনতাই মুখ্য। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে আমাদের, সমাজে উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই জরুরি।

এতক্ষণে নিশ্চয় একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মানসিক রোগী মানেই পাগল নয়। 'পাগল' শব্দটি ব্যবহার করে আমরা একটি সামাজিক অপরাধ করছি। কারণ এতে সামাজিক আচরণ স্থূল হয়ে পড়ছে। এই স্থূলতার কারণে 'মন' নিয়ে কারো সমস্যা হলে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে সুস্থ হওয়ার পথে ভ্রান্ত একটি সামাজিক দেয়ালে বাধা পাচ্ছে। লোক লজ্জার বক্রহাসি, কটাক্ষ উপেক্ষা করে সাধারণ নিউরোটিক রোগীরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য যেতে পারছে না। এভাবেই মানুষ তিলে তিলে ভোগে, 'মন'কে অবহেলা করে, আরো গভীরতর সংকটে ডুবে যায়।

শারীরিক এমন অনেক উপসর্গ, ব্যথা আছে যার কোনো দৈহিক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগীরা কেবল চিকিৎসকের পর চিকিৎসক বদলান, গণ্ডায় গণ্ডায় ইনভেসটিগেশন করান, রোগ ধরা পড়ে না।

জেনে রাখা ভালো, এমন অনেক উপসর্গই মনোজাত। এ ধরনের পরিস্থিতিতেও মানসিক চিকিৎসার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

আর নয় অনাদর, অবহেলা। এবার চাই 'মন' নিয়ে সচেতনতা, চাই উন্নত সমাজ, উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য।

আবেগের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ
কেন জানতে হবে আবেগের গতি-প্রকৃতি

মানুষ আবেগ প্রবণ। মানুষ চিন্তাশীল।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মানবজাতি অনন্য। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এই বিশিষ্টতা নানা আঙ্গিক থেকে মানুষকে আলাদাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের জীবন-যাপনের মূলে রয়েছে আবেগের বড় ধরনের প্রভাব। কথাবার্তায় ঠাসা থাকে আবেগের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন উপাদান।

আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, ভয়ে আতংকগ্রস্ত হই, ঈর্ষায় ডুবে যাই, ঘৃণায় কুঁকড়ে থাকি অথবা উল্লাসে ফেটে পড়ি। এভাবে আবেগ বা ইমোশন আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা, আনন্দ-বেদনাকে নান আঙ্গিক থেকে রঞ্জিত করে।

আবেগহীন কাজ, আচরণ মানুষকে মানায় না। রোবটই আবেগ ছাড়া সব কাজ করতে পারে। রোবটের সাহায্যে অনেক কাজ করানো গেলেও আবেগীয় উপাদানকে কর্মোদ্দীপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বিজ্ঞানীরা এখনো ব্যর্থ হয়ে চলেছেন। এ কারণেই বিভিন্ন গবেষণায় ইমোশনকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

ইমোশন ও মোটিভেশন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

প্রথমে ইমোশন সৃষ্টি হয়, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় মোটিভেটেড আচরণ। মোটিভেশনের ভেতর আছে চাহিদা, আগ্রহ এবং উৎসাহ। এই অনুষঙ্গগুলো মানুষকে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে, লক্ষ্যে পৌছায়। সফলতা অর্জনের একটি বড় সাঁকো হলো ইমোশন সৃষ্টি, মোটিভেটেড আচরণ।

ইমোশনের সঙ্গে মোটিভেশনের সম্পৃক্ততার নানা উদাহরণ হাজির করা যায়। বলা হয়ে থাকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং মমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে যৌন আচরণ, ক্রোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে সহিংস আচরণ, ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্পৃক্ততাই নিরংকুশ কিছু নয়। ব্যতিক্রমও আছে। স্পর্শকাতর অনুভূতি ছাড়াও যৌন আবেদন আসতে পারে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত বা প্রযোজ্য নয় এমন ক্ষেত্রেও যৌনতার অস্বাভাবিক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে।

পক্ষান্তরে বলা যায়, যৌন আকর্ষণ ছাড়াও ভালোবাসা যায়, সহিংসতা ছাড়াও রাগ জাগতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আবেগই উদ্দীপ্ত করে মোটিভেটেড আচরণ। আবেগের কারণেই লক্ষ্যে পৌছার দুর্নিবার তাগিদ জাগে মানুষের মনে।

আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারি। এ সময় আবেগই আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল। মোটিভেশন সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে। হানাদার পাক বাহিনীর নৃশংসতা মুক্তির জন্য আমাদের আবেগ তীব্রতর করেছিল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার জন্যে।

কিন্তু মানুষ যখন লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়, চাহিদা যখন অপূর্ণ থেকে যায়, হতাশার কালো থাবা তখন মানুষের মনে নেতিবাচক আবেগের সৃষ্টি করে। বিপর্যস্ত করে তোলে জীবনপ্রবাহ। অ্যাংজাইটি, ক্রোধ এবং বিষণ্নতা তখন নানা দিক থেকে মানুষকে চেপে ধরতে পারে।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আবেগ বা ইমোশন বলতে আমরা কী বুঝি, কীভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় আবেগ?

ইমোশন একটি ইংরেজি শব্দ। বিজ্ঞানের ভাষায়ও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইমোশনের বাংলা অর্থ আবেগ।

আক্ষরিক অর্থে আবেগ হলো, মানুষের আলোড়িত অবস্থা। মনে ও দেহে নাড়া দিয়ে যায় এই আলোড়ন। মনের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আবেগের রয়েছে তিনটি অংশ।

১। প্রথম বলা হয়েছে, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। যেমন আনন্দ, রাগ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয়ত আছে, শরীরবৃত্তীয় বিশেষ আলোড়িত অবস্থা। যেমন দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে আছে হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। দৈহিক পরিবর্তনগুলো বোঝানোর জন্য আমরা নানা ধরনের উপমা এবং ভাষা ব্যবহার করে থাকি। যেমন যখন বিষণ্ন থাকি, প্রায়ই মনে হয় গলায় যেন দলা পাকিয়ে কিছু একটা আটকে আছে, কিংবা যখন আনন্দিত হই শিরশির অনুভূতি শরীর ছুঁয়ে যায়।

৩. তৃতীয়ত, দেহভঙ্গিমা কিংবা মুখের পেশীর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে বিশেষ অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশও ইমোশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এক এক ধরনের ইমোশনের প্রকাশভঙ্গি ঘটে এক এক রকমভাবে।

আবেগের প্রকারভেদ

নানা ধরনের ইমোশন রয়েছে।

ইমোশন প্রকাশের তীব্রতার মাঝেও রয়েছে পার্থক্য। এ কারণেই ইমোশনের শ্রেণীবিন্যাস করা দূরুহ কাজ। বিজ্ঞানীদের মাঝে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নিম্নের শ্রেণী বিন্যাসটি মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১। ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক ইমোশন ঃ

ইতিবাচক বা পজিটিভ ইমোশনের উদাহরণ, যেমন ভালোবাসা, আনন্দ, সুখ ইত্যাদি।

ইতিবাচক আবেগ মানুষের ভালো থাকার ইন্দন জোগায়, অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক ইমোশনের কারণে মানুষের ভালো থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক জটিলতর হতে থাকে। নেতিবাচক ইমোশনের উদাহরণ হচ্ছে রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি।

২। প্রাথমিক বনাম মিশ্র ইমোশন ঃ

প্রাথমিক ইমোশন আবেগের মৌলিক দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে।

দুই বা ততোধিক প্রাথমিক ইমোশনের যৌথ মিলনের ফলে মিশ্র আবেগের সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক আবেগগুলো হচ্ছে ঃ ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, রাগ, বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মিশ্র আবেগের মধ্যে আছে, জেলাসি (ভালোবাসা + রাগ), নিরাশা (দুঃখ + বিস্ময়) ইত্যাদি।

৩। বিপরীত ধর্মী ইমোশন ঃ

এই গ্রুপে আছে বিপরীত মুখি আবেগের বর্ণনা।

আনন্দের উল্টো পিঠে রয়েছে দুঃখ।

ভালোবাসার উল্টো পিঠে রয়েছে ঘৃণা।

প্রকৃত পক্ষে একই সঙ্গে দু'টি অপোজিট ইমোশন অনুভব করা যায় না। সাইকোথেরাপীতে ক্লায়েন্টদের নেগেটিভ ইমোশনের পথ থেকে পজিটিভ ইমোশন জাগানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়।

৪। মাত্রাগত তারতম্যের বিচারে আবেগ ঃ

মাত্রাগত তীব্রতার ব্যবধানের কারণে নানা ঢংগের আবেগের প্রকাশ ঘটে থাকে। যেমন ভয়ের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে।

ভয় ঃ অস্বস্তি—> খিটখিটে—> সন্ত্রস্ত কম্পমান অবস্থা—> অতি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা—> প্যানিক।

এককভাবে প্রতিটি প্রাথমিক আবেগেরই মাত্রাগত হেরফের রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়–

বিরক্তি —> রাগ —> রাগে উন্মত্ততা, ইত্যাদি।

পরবর্তী পর্যায়ে আবেগের বিভিন্ন ধরনের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হবে।

আবেগে দৈহিক পরিবর্তন ঃ আবেগ ও স্নায়ুতন্ত্র

আবেগের তিনটি অংশ বা অনুষঙ্গের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি অংশের মাঝে রয়েছে অন্তর্গত যৌথ ক্রিয়ার ফল।

মূলত অনুষঙ্গগুলো বুঝতে হলে, জানতে হবে কীভাবে স্নায়ুতন্ত্র শরীরবৃত্তীয় এই আলোড়ন কিংবা উদ্দীপনাগুলো জাগিয়ে তোলে। এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম) সম্পর্কে সামান্য ধারণা নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত ঃ

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (সিএনএস) ঃ ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড দ্বারা গঠিত।

২। দূরবর্তী স্নায়ুতন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম (পিএনএস) ঃ এটি দুই ভাগে বিভক্ত–

ক. সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম।

খ. অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম (এএনএস) বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

এই অটোনোমিক অংশই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেহের ভেতরের অঙ্গপ্রতঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন হার্ট, পাকস্থলি ও অন্ত্রের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এএনএস-এর মাধ্যমে। এটি ত্বকের ক্ষুদ্র রক্তনালীর সংকোচন ও ঘামের গ্রন্থির নিঃসরণও নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে দেহের ভেতরগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগ স্থাপিত হয়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

যখন আবেগের শরীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গের কথা বলা হয়, তখন মূলত স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের কথাই বলা হয়ে থাকে।

ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘেমে উঠি আমরা অথবা লজ্জায় রক্তিম হই। এসব দৈহিক পরিবর্তন ঘটে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কারণে।

অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম তথা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দু'টি অংশ রয়েছে ঃ সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক অংশ।

সিম্প্যাথেটিক অংশের স্নায়ুকোষগুলো স্পাইনাল কর্ডের মাঝামাঝি অংশ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে।

পক্ষান্তরে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অংশের নিউরনগুলো ব্রেইন স্টেম এবং স্পাইনাল কর্ডের নিম্নাংশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে।

অধিকাংশে ভিসেরাগুলো (দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রতঙ্গ) সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক উভয় অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যতিক্রম হলো ঘাম গ্রন্থি এবং রক্তনালী। এই দু'টি কেবলই সিম্প্যাথেটিক অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মূলত স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের এই দু'টি অংশ ভিসেরার বিপরীত ধর্মী কাজের গতি-প্রকৃতি সামাল দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সিম্প্যাথেটিক অংশের উদ্দীপনার কারণে চোখের মণি স্ফীত হয়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, পরিপাকতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজের সিগনালের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। পক্ষান্তরে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অংশ চোখের মণি সংকুচিত করে, হৃদস্পন্দন কমিয়ে আনে, পরিপাকতন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক করে, ইত্যাদি।

আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঃ আবেগের অভিব্যক্তি

মুখ ফুটে অনেক কিছুই বলার প্রয়োজন হয় না।

দেহভঙ্গিমার মাধ্যমে অনেক সময় মানুষের মনের খবর প্রকাশ হয়ে যায়। এটিকে বলে 'বডি ল্যাংগুয়েজ'। মুখায়বের অভিব্যক্তির ভাষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জাহির করে দেয়।

মুখায়বে অনেকগুলো আলাদা আলাদা পেশী রয়েছে। পেশীর সংকোচনের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন রকম। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আমরা ভয়ার্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাই। এ কাজেও জড়িত আছে কিছু পেশীর ভূমিকা। মুখের মাঝে যে বিরক্তি ও হতাশা ভেসে ওঠে, সবই পেশীর সংকোচনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মুখের নির্দিষ্ট পেশীর সঙ্গে নির্দিষ্ট আবেগ সম্পৃক্ত রয়েছে। কয়েকটি ইমোশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মুখায়বের পেশীর কথা নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো ঃ

আবেগ	মুখায়বের পেশি
❑ মৃদু এবং উচ্চ হাসি	→ জাইগোমেটিকাস মেজর
❑ দুঃখ	→ লিভেটর লেবি সুপেরিওরিস, লিভেটর এঙ্গুলিওরিস
❑ রাগ	→ ডাইলেটর নেরিস, ডিপ্রেসর সেপটি
❑ বিস্ময়	→ ফ্রনটালিস
❑ সন্দেহ	→ মেন্টালিস
❑ হরর, টেরর, সংঘাত	→ প্লাটিসমা
❑ ঘৃণা	→ জাইগোমেটিকাস মাইনর
❑ শোক	→ ডিপ্রেসর এঙ্গুলার ওরিস
❑ ভুরু কোঁচকানো বিরক্তি	→ কোরুগেটর সুপারসিলি
❑ দেঁতো হাসি	→ রাইসোরিয়াস

চার্লস ডারউইনের যুক্তি ঃ প্রসঙ্গ আবেগ

চার্লস ডারউইন বিবর্তনবাদ থিওরির পাশাপাশি Expression of the Emotion in Man and Animal (1872) গ্রন্থে যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন, বিবর্তনের শুরু থেকেই মানবজাতির মধ্যে আবেগীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। আবেগের বিবর্তনের ধারায় মানুষ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে।

ডারউইনের আবেগ আচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিষয়টির ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কারণেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে, নিজেদের উত্তোরণ ঘটিয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, আতঙ্ক বা ভয় হচ্ছে আবেগীয় আচরণেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে বিপদসংকুল পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে মানুষ আত্মরক্ষা করেছে, প্রকৃতির মাঝে সগৌরবে টিকে আছে।

ডারউইন এই বলে নির্দিষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুখায়বের মাধ্যমে আবেগের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেটি মূলত জীবনের নানা আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষ মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মুখের অভিব্যক্তিই ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়। মোট কথা বলা যায়, মুখের অভিব্যক্তিই সমাজের অন্যান্য সবার সঙ্গে যোগাযোগের সিঁড়ি গড়ে তোলে। মধুর কিংবা তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টিতে প্লাটফরম তৈরি হয়ে যায় এভাবেই।

সবশেষে বলা যায়, ডারউইনের প্রস্তাবিত থিওরি অনুযায়ী, আবেগ মুখের সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই সম্পর্কযুক্ত। তাঁর মতে, আবেগ হচ্ছে সহজাত এবং বিশ্বব্যাপী সব মানুষের আবেগের প্রকাশ ঘটে একই ধারায়।

কমনসেন্স অনুযায়ী, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপভেদে আবেগের প্রকাশেও রয়েছে ভিন্নতা। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় কমনসেন্স নয়, ডারউইনের ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আবেগের থিওরি

আবেগ জাগানিয়া ঘটনা প্রবাহ এবং শারীরিক আলোড়িত অবস্থার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিগত আবেগীয় অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি আমরা।

কীভাবে এই অনুভূতি জাগে, মূলত সেই বিষয়গুলোই আবেগের বিভিন্ন থিওরিতে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক বিতর্কও হয়েছে, পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে।

নিম্নে কেবল মাত্র তিনটি থিওরির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১. জেমস-লেঞ্জ থিওরি ঃ

এটিকে বলা হয় ক্লাসিক থিওরি। ১৮৯০ সালে উইলিয়াম জেমস তাঁর লেখা Principles of Psychology গ্রন্থে এই থিওরির প্রস্তাবনা করেন। প্রায় একই সময়ে ডেনিস গবেষক কার্ল লেঞ্জ (১৮৮৭) প্রায় একই রকম ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হন। এ. কারণেই এটিকে 'জেমস-লেঞ্জ থিওরি' নামকরণ করা হয়।

এই থিওরির মূল ভিত্তি

ইমোশন নিয়ে কিছু সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। জেমস-লেঞ্জ থিওরিতে প্রচলিত ধারণার বিপরীত ব্যাখ্যা দাবি করা হয়েছে।

ইমোশন নিয়ে সাধারণ প্রচলিত ধারণা ঃ ব্যক্তিগত আবেগীয় অভিজ্ঞতার পরই সক্রিয় শারীরিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ

- ❑ আমরা দুঃখ পাই, তাই আমরা কান্না করি।
- ❑ আমরা ভয় পাই, তাই হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়।
- ❑ আমরা সুখবোধ করি, তাই হাসতে পারি।

জেমস-লেঞ্জ থিওরি এই ধারণাটির বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ

- ❑ আমরা কান্না করি বলেই দুঃখ বোধ করি।
- ❑ হৃদস্পন্দন দ্রুত হয় বলেই আমরা ভয় পাই
- ❑ আমরা হাসি বলেই সুখবোধ করি।

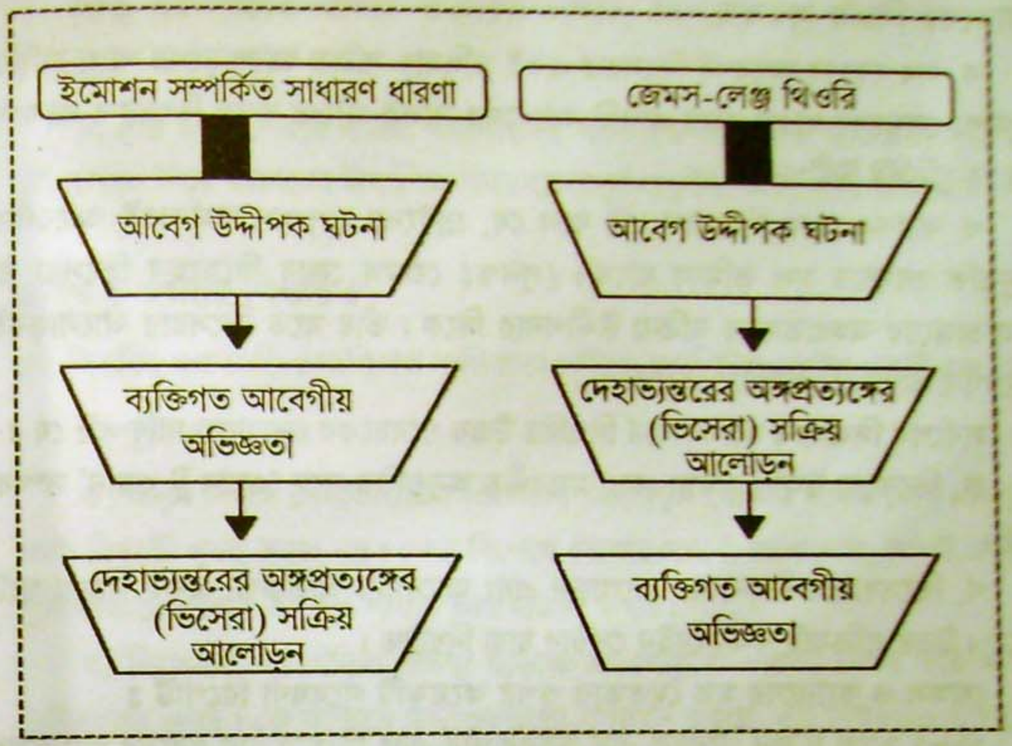

জেমস-লেঞ্জ থিওরির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ

ক. প্রতিটি ইমোশনের সঙ্গে ভিসেরার সক্রিয় উদ্দীপনা জড়িত আছে।

খ. মানুষ ভিসেরার বিশেষ প্যাটার্নের সক্রিয় উদ্দীপনার ফিডব্যাক হিসাবেই আবেগীয় অবস্থা লেবেল করে থাকে।

২. ক্যানন-বার্ড থিওরি ঃ

প্রখ্যাত ফিজিওলজিস্ট ওয়াল্টার বি ক্যানন ১৯২৭ সালে জেমস-লেঞ্জ থিওরির সমালোচনার মধ্যে দিয়ে এই থিওরির গোড়াপত্তন করেন। আমেরিকান গবেষক ফিলিপ-বার্ড ১৯২৮ সালে ক্যাননের প্রস্তাবনাটির বিশদ বর্ধিত করেন। এই কারণে এটির নামকরণ করা হয় ক্যানন-বার্ড থিওরি।

জেমসের ধারণা ঃ ক্যাননের সমালোচনা

ক. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ভিসেরার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ প্যাটার্নের আলোড়িত অবস্থা তৈরি করে না।

খ. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সব ধরনের আবেগীয় অবস্থায় ভিসেরার একই রকম উদ্দীপনা জাগায়, বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো পরিবর্তন ঘটায় না।

ক্যাননের নিজস্ব মতবাদ

ক. সব ধরনের আবেগই ভিসেরার একই ভঙ্গিমায় সক্রিয় আলোড়নের সাথে জড়িত (পুনশ্চঃ জেমসের ধারণা হলো প্রতিটি আবেগের সঙ্গেই জড়িত আছে ভিসেরার আলাদা ঢংগের সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা)।

খ. ক্যানন জোর দিয়েছেন এই বলে যে, ব্রেইনের সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডই আবেগীয় অনুভূতি জাগাতে মূল ভূমিকা রাখে। (পুনশ্চঃ জেমস জোর দিয়েছেন ভিসেরা বা দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় উদ্দীপনার দিকে। তাঁর মতে ভিসেরার আলোড়নই আবেগীয় অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে)।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ঃ ক্যানন-বার্ড থিওরির উভয় গবেষকের জোরালো দাবি এই যে ঃ

ক. ভিসেরার উদ্দীপ্ত অবস্থা এবং আবেগীয় অনুভূতির সঙ্গে 'ওয়ান টু ওয়ান' সম্পর্ক নাই।

খ. ভিসেরার উদ্দীপনা বা আলোড়ন এবং আবেগীয় অভিজ্ঞতা একই সময়ে ঘটে থাকে। উভয় প্রক্রিয়াই কমন ব্রেইন সেন্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জেমস ও ক্যাননের মত দ্বৈততার ওপর কয়েকটি গবেষণা রিপোর্ট ঃ

১৯৮১ সালে দু'জন গবেষক এস উইনবার্গার এবং সিংগার চার ধরনের আবেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শরীরবৃত্তীয় সক্রিয় উদ্দীপনার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন।

গবেষণার ফলাফল

- ❑ সুখানুভূতির সময় হৃদস্পন্দন কমে যায়।
- ❑ ক্রোধ এবং ভয়ের সময় হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়।
- ❑ দুঃখের সময় ডায়াসটোলিক ব্লাড প্রেসার সর্বনিম্নে থাকে।
- ❑ আনন্দের সময় ডায়াসটোলিক ব্লাড প্রেসার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।
- ❑ ক্রোধের সময় ডায়াসটোলিক ব্লাড প্রেসার সর্বোচ্চ সীমায় উঠে আসে।

কমেন্ট ঃ গবেষণার এই ফলাফল জেমসের প্রথম ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

জেমসের দ্বিতীয় ধারণা নিয়ে বিতর্ক

তীব্র আবেগীয় অবস্থায় মানুষ নানা উপসর্গের বর্ণনা দেয়। শারীরিক উপসর্গগুলো হলো ঃ

'যেন একটি দলা গলার ভেতর সেঁটে আছে।'

'যেন একটি প্রজাপতি পাকস্থলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'হার্ট যেন ঘোড়ার মতো ছুটছে' ইত্যাদি।

কিন্তু হ্যান্ডলারের রিসার্চে প্রমাণিত হয়েছে, ভিসারার মৃদু তীব্রতাগুলো মানুষ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে না।

সিদ্ধান্ত ঃ 'ভিসেরার সক্রিয় আলোড়নই ব্যক্তিগত আবেগীয় অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে' এই তথ্যটি নিয়ে ক্যাননের উত্থাপিত সমালোচনাপূর্ণ প্রশ্নটিই যথার্থ বলে প্রতিয়মান হয়।

৩. দি টু ফ্যাক্টর থিওরি ঃ

এই থিওরির মূল ভিত্তি ঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সৃষ্টিতে কগনিটিভ ফ্যাক্টর একটি বড় ইস্যু।

সাম্প্রতিক মতামত

ক. মানুষ নিজস্ব দেহাভ্যন্তরের ভিসেরার আলোড়ন বোঝার সামর্থ রাখে। কিন্তু সব সময় বিষয়টি খুবই সহজ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে বোঝার সামর্থ্য ভাসাভাসা, অস্পষ্ট মনে হয়, সুনির্দিষ্টভাবে সক্রিয় কর্মকাণ্ড শনাক্ত করা যায় না তখন।

খ. ভিসেরার আলোড়িত অবস্থা ছাড়াও আবেগীয় অভিজ্ঞতা নির্ভর করে বাইরের উদ্দীপকের ওপর। কে কীভাবে উদ্দীপকগুলো মূল্যায়ন করছে, এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কেউ হয়ত একই ঘটনার অতিমূল্যায়ন করছে, কেউ হয়ত তেমন ঘটনাটি গণনার মধ্যেই আনেনি। ফলে একই উদ্দীপকের কারণে কারুর ভেতর আবেগ জেগে ওঠে, কারুর ভেতর জাগে না।

কমেন্ট ঃ এই থিওরির উপসংহারে বলা যায়, দু'টি বিষয়ের যৌথ ক্রিয়ার ফলে আবেগীয় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। বিষয় দু'টি হলো ঃ

ক. দেহাভ্যন্তরের ভিসেরার আলোড়ন।

খ. বাইরের আবেগ উদ্দীপকই যে ভিসেরার আলোড়ন সৃষ্টি করছে, বিষয়টি শনাক্ত করতে পারা বা বোঝা।

মূলত দি টু ফ্যাক্টর থিওরিটি জেমস লেঞ্জ এবং ক্যানন বার্ড থিওরির মধ্যবর্তী পন্থার একটি থিওরি।

স্বাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, দেহাভ্যন্তরের ভিসেরার সক্রিয় উদ্দীপনা আবেগীয় অভিজ্ঞতার এমপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

অর্থাৎ মনের আবেগীয় আলোড়নের তীব্রতা ভিসেরার উদ্দীপনার মাত্রাগত অবস্থা বাড়িয়ে দেয়।

কেন জানতে হবে আবেগের গতি-প্রকৃতি

জীবনের জন্য

আবেগ নিয়ে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি ছেলেটি বা মেয়েটি খুব আবেগপ্রবণ, ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না ইত্যাদি।

সহকর্মী বা বন্ধুবান্ধবী কারুর ঘাড়ের ওপর আবেগের এমনি একটি নেতিবাচক ধারণার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমরা দেঁতো হাসি দেই, কৌতুক করি। নিজের ভেতর তখন একটি হাম্বোরাভাব চলে আসে, অন্যকে অপদস্ত করে নিজে আনন্দ পেতে পিছপা হই না। নিজেকে অসাধারণ কেউকেটা ভাবি।

এ ধরনের ভাবনার বৈজ্ঞানিক কোনো ফ্লাটফর্ম নেই। অন্যকে অপদস্ত করে মজা লুটে নেওয়ার কৌশলটি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এক ধরনের সেডিস্টিক আচরণ। আনন্দ বা আড্ডায় জৌলুশ বাড়ানোর জন্য আরো নানা উপায় আছে, সেই সব আনন্দময় পথে এগিয়ে চলাই শ্রেয়।

মনে রাখতে হবে, আবেগের সঙ্গে যুক্ত আছে স্নায়ুতন্ত্রের একটি গোপন খেলা, আছে ব্রেইনের রাসায়নিক উপাদান, নিউরোট্রান্সমিটারস এবং দেহগত হরমোনের এক সমন্বিত ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সুশৃঙ্খল গতিময়তা। এটি সত্যি যে, আবেগ এবং চিন্তন এক নয়।

পঞ্চইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে আমরা তথ্য গ্রহণ করি ও সেনসেশন পাই। প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে এই তথ্যগুলো সংগঠিত ও বিশ্লেষিত হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বোধগম্য হয় তথ্যগুলো। এ পথেই আমাদের মধ্যে কগনিশন সৃষ্টি হয়, চারপাশ সম্পর্কে অবহিত হই।

আমরা চিন্তা করি, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছি। চিন্তনের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবেগীয় অনুষঙ্গগুলো অবশ্যই আলাদা, কথাটি মনে রাখতে হবে।

কিন্তু চিন্তাশীলতার মাধ্যমে কেবল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না। সফলতা বা পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মোটিভেশন বা প্রেষণার তাগিদ।

প্রেষণার অভ্যন্তরীণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ঃ আগ্রহ, চাহিদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই মানুষ লক্ষ্যপানে ছুটে যেতে পারে, বিজয়ী হতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ইমোশন যুক্ত না হলে মোটিভেশন থেকে গতিশীলতা সৃষ্টি হয় না, 'মোটিভেটেড' আচরণ বেগবান হয় না।

নিজেকে উদ্যমী করতে, বেগবান, সক্রিয় ও সাহসী করতে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বা কর্মসম্পাদনের জন্য ইমোশনের ইতিবাচক অনুষঙ্গগুলো অবশ্যই অপরিহার্য। একই সঙ্গে প্রয়োজন নেতিবাচক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞান থাকা, নেতিবাচক ইমোশনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার কৌশল রপ্ত করা।

নানা কারণে আবেগীয় সমস্যা যেমন অ্যাংজাইটি সৃষ্টি হতে পারে, ডিপ্রেশন, ম্যানিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগ হতে পারে। এসব রোগের যথাযথ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্ভব। কেউ আবেগীয় সমস্যায় আক্রান্ত হলে, মানসিকরোগ বলে অবহেলা না করে, উপহাস করে মজা না লুটে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি এবং অবিভাবকদের উৎসাহ দিতে হবে। রোগীকে সক্রিয় কর্মকাণ্ডে ফিরিয়ে আনার জন্য চারপাশের সবাইকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। এটি একটি মানবীয় দায়িত্ব, কুসংস্কারমুক্ত অগ্রসরমান উপায়। মনে রাখতে হবে, আবেগীয় সমস্যার কারণে যে রোগ তৈরি হলো, তা অন্যান্য শারীরিক রোগের মতোই অসুস্থতা। আমরা যেমন শারীরিক রোগের জন্য চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করি, তেমনি মানসিক রোগের জন্য গ্রহণ করতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা।

সাহিত্যের জন্য

সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক এই আবেগের গুরুত্ব অনেক বেশি। যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করতে হলে, বৈজ্ঞানিক মূল ইস্যুগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে লেখকদের।

চারদিকে এখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার। সাহিত্য রচনার গাঁথুনিতে যদি বৈজ্ঞানিক ধারণার অসঙ্গতি থাকে সেই রচনা সমসাময়িক বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়িত হবে না। কল্পনার ডালাপালা যতোই বিস্তৃত হোক, যতোই শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে পান্ডিত্য ফুটে উঠুক, বর্তমান বিশ্বে বড় ধরনের পুরস্কার বা স্বীকৃতির জন্য কেবলমাত্র সেই সব কল্পনার বিন্যাসকে মূল্যায়ন করা হয় না যা বিজ্ঞান নির্ভর নয়। বিজ্ঞান নির্ভর না হলে বিষয়বস্তু জীবন ঘনিষ্ঠ হতে পারে না।

একটি চরিত্র নির্মাণের সময় চরিত্রটির আবেগ এবং পরিবেশটি কেমন, তার শারীরিক এবং আচরণগত প্রতিক্রিয়াটি কেমন, পরিস্থিতি সে কীভাবে মূল্যায়ন করছে, বাচনিক এবং মুখায়বের অভিব্যক্তির সঙ্গে অন্তর্গত ইমোশন সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, পজিটিভ ইমোশনের বর্ণনার সময় নেগেটিভ ইমোশন, নেগেটিভ পরিবেশ নির্মিত হয়ে গেল কিনা, প্রতিটি ইস্যুই বিজ্ঞানের আলোকেই মেপে দেখা হয়। এখন ভেবে দেখতে হবে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক, সমালোচক, সম্পাদকরা উপন্যাস গল্প বা নাটকের গাঁথুনি নির্মাণে বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে কতোটুকু জ্ঞান ধারণ করেন, কতোটুকু মূল্যায়ন করেন।

বস্তুত সাহিত্য সৃষ্টির গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বৈজ্ঞানিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আরো সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে স্থান করে নেওয়ার ব্যাপারে বিষয়টি গুরুত্বহীন নয়।

কোথায় সুখ কোথায় দুঃখ

বিমর্ষতা এবং বিষণ্নতারোগ এক নয়।

বিমর্ষতা (sadness) হচ্ছে মনোজগতের সমস্যার একক একটি উপসর্গ। বিষণ্নতারোগ (depressive disorder) হচ্ছে অনেকগুলো উপসর্গের সমাহার, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সিনড্রম হিসেবে।

জটিল জীবনের চলার পথে নানা অনুষঙ্গের শিকার হতে পারে মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ ঘটনা পরম্পরায় আক্রান্ত হতে পারে বিমর্ষতায়, বিষাদগ্রস্ত হতে পারে সাময়িকভাবে। দুঃখ দুঃখ অনুভূতি তাকে আক্রান্ত করতে পারে। কষ্টে কষ্টে ভরে উঠতে পারে বুক। এটি এক ধরনের নেগেটিভ ইমোশন। ঘটনা প্রবাহের উত্তোরণের মাধ্যমে সেই দুঃখবোধ সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়। প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তা ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো সামর্থ।

মনোকষ্ট কিংবা দুঃখবোধ আসতেই পারে জীবনে। এটি জীবন চক্রের মানসিক উপাদানের একটি গতানুগতিক ধারা। কিন্তু কেউ কেউ এই ধারা থেকে নিজের উত্তোরণ ঘটাতে পারে না, বরং ডুবে যেতে পারে আরো গভীরে– বিষণ্নতারোগে। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। মোটেই স্বাভাবিক নয়। মনের প্যাথলোজিক্যাল অবস্থায় এমনটি ঘটে থাকে। চিকিৎসার মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

সুখসুখ অনুভূতি (happiness) স্বাভাবিক জীবনেরই চাহিদা। পজিটিভ ইমোশনের একটি উদাহরণ হচ্ছে এই সুখবোধ।

সুখের জন্য মানুষ নিরন্তর ছুটে বেড়ায়। কখনো কি পাওয়া যায় এই সুখ?

কেউ পায় না, কেউ পায়। কেউ স্বল্পকালীন সুখের ছোঁয়া উপভোগ করে। আবার চলে যেতে পারে দুঃখের জগতে। আবারও খুঁজে পায় সুখের সন্ধান।

নিরন্তর মানুষের মাঝে প্রবাহমান সুখ-দুঃখের স্রোতধারার প্রতিফলন ঘটে কোথায়?

মনে?

হ্যাঁ। মনে। এই সত্য আমরা সবাই জানি।

কিন্তু মন কি? কোথায় এর অবস্থান? জানি কি?

মন দেখা যায় না, মনকে ছোঁয়া যায় না। মনের মাঝে বাস করে ভালোবাসা। রাগ, অভিমান, লুকিয়ে আছে মনের কোনো এক স্তরে। আবার মনের ভেতর থেকে স্ফূরণ ঘটে আত্মবিশ্বাসের। আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মনোসংযোগ বাড়ানো যায়। এভাবেই মেধা এবং আত্মবিশ্বাসের ভিত হয় দৃঢ়। দৃঢ় বিশ্বাসের শেকড় বেয়ে যে কেউ উঠে যেতে পারে সাফল্যের চূড়ায়।

যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা মন নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখনো গবেষণা চলছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মন ব্রেনেরই অংশ যা চিন্তা চেতনা, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। মন দেখতে না পেলেও মনের ক্রিয়া বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশের চিত্র হিসেবে আচরণ দেখতে পাই আমরা। কথা বলার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা নানা অনুষঙ্গ।

তাই মন বোঝার আগে ব্রেইনের এনাটমি সম্পর্কে দু-চারটি কথা জানা প্রয়োজন। শব্দগুলো কঠিন বলেই বোঝার জন্য পাঠকের মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

করোটির ভেতর শৈল্পিক ভঙ্গিতে বসে আছে ব্রেইন।

ব্রেইনের কয়েকটি অংশ হচ্ছে সেরিব্রাল হেমিস্পিয়ার, ব্রেইনস্টেম এবং সেরিবেলাম।

সেরিব্রাল হেমিস্পিয়ার বা বলয় সমান দু'ভাগে বিভক্ত ঃ ডান ও বাম সেরিব্রাল বলয়। আবার মিডব্রেইন, পনস এবং মেডালা নিয়ে গঠিত ব্রেইনস্টেম এর সঙ্গে যুক্ত আছে সেরিবেলাম।

প্রতিটি সেরিব্রাল বলয়ে রয়েছে ফ্রন্টাল লোব (lobe), পারাইটাল লোব, অক্সিপিটাল ও টেম্পোরাল লোব। আরো আছে ইনসুলার লোব এবং লিম্বিক লোব বা লিম্বিক সিস্টেম।

প্রতিটি লোবে রয়েছে আরো নানা অংশ বা এরিয়া। ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কাজ পরিচালনা করে। একটি সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের ধারা বজায় আছে সব এরিয়ার মাঝে। এ এক অভাবনীয় কর্ম যজ্ঞের সমাহার।

অধিকাংশ গবেষকরা স্বীকার করেছেন যে, ডিপ্রেশন এবং ম্যানিয়া রোগের প্যাথোলজি ব্রেইন নির্ভর। তবে স্বাভাবিক মুড জাগিয়ে তোলা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ব্রেইনের সুনির্দিষ্ট এলাকা সম্বন্ধে খুব কমই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু চলতি শতকের গোড়ার দিকে পাপাজ, মাকলিয়ান এবং অন্যান্য গবেষকরা লিম্বিক লুপ (limbic loop) সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন এবং ব্রেইনের এই অংশের সঙ্গে আবেগ,

আচরণ, নারী-পুরুষের বন্ধন গড়ে তোলার তাগিদ, শিশু লালন পালন, ক্ষুধা, যৌনতা ইত্যাদি ড্রাইভের নিয়ন্ত্রণ জড়িত রয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

লিম্বিক সিস্টেমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ঃ সিনগুলেট, সাব-কালোসাল এবং প্যারাহিপ্পোকাম্পাল জাইরাস, হিপ্পোকাম্পাল ফরমেশন, এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস, মামিলারি বডি এবং এনটেরিয়র থালামিক নিউক্লিয়াস।

সাম্প্রতিক সময়ে নিত্য নতুন টেকনোলোজির কারণে ফাংশনাল (functional) নিউরোএনাটমি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। এই টেকনোলোজিগুলো হচ্ছে ঃ পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি (PET), সিঙ্গেল প্রোটন ইমিশন কম্পিউটেড টমোগ্রাফি (SPECT) ও ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (MRI) ইত্যাদি। এই সব টেকনোলোজির মাধ্যমে আবেগীয় রোগ এবং স্বাভাবিক আবেগের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জটিলতর অনেক খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মার্ক, টেরেন, জর্জ, কিটার যুক্তরাষ্ট্রের প্রমুখ গবেষকগণ সুস্থ মহিলাদের ওপর PET ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্পকাল স্থায়ী সুখানুভূতি (happiness) ও দুঃখবোধ (sadness) নিয়ে এক গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, স্বল্পকাল স্থায়ী দুঃখবোধের সঙ্গে জড়িত আছে উভয় লিম্বিক এবং প্যারালিম্বিক অংশসমূহের উদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ড। এই অংশগুলো হচ্ছে সিনগুলেট, মিডিয়াল প্রিফ্রন্টাল এবং মিজিয়াল কর্টেক্স (mesial cortex)। এ ছাড়াও রয়েছে ব্রেইনস্টেম, থালামাস, হাইপোথালামাস এবং কডেট/পুটামেন।

অপরপক্ষে স্বল্পকাল স্থায়ী সুখানুভূতির সঙ্গেউদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ডের সংশ্রব নয়, বরং পাওয়া গেছে ডান প্রিফ্রন্টাল এবং উভয় সেরিব্রাল বলয়ের টেম্পোরাল– পারাইটাল এলাকায় রক্ত প্রবাহের স্বল্পতার প্রমাণ।

অপর এক গবেষণায় ইরিক রিমান, রিচার্ড লেইন, জিওফ্রি প্রমুখ গবেষকগণ দেখতে পেয়েছেন যে স্বাভাবিক দুঃখবোধের সঙ্গে জড়িত আছে ইনসুলার লোবের সম্মুখভাগের উদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ড। ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রেইনের এই অংশটি মূলত কষ্টকর কগনেটিভ (cognitive) প্রক্রিয়া এবং ভেতরগত সেনসরি উদ্দীপকের মাধ্যমে আবেগীয় অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

লিম্বিক সিস্টেমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে নিরিক্ষা করে চমকপ্রদ ফলাফল জানা গেছে। দেখা গেছে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত হলে এমিগডালা, (amygdala) আগ্রাসী মনোভাব কিংবা ভীতিকর অনুভূতি জাগায়। হিপ্পোকাম্পাল এরিয়া উদ্দীপ্ত হলে সক্রিয় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে সেপ্টাল এরিয়াতে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে আগ্রাসী মনোভাব কমানো যায়। সঙ্গে সঙ্গে জাগানো যায় আনন্দময় অনুভূতি।

সেরোটোনিন (serotonin) ব্রেইনের একটি প্রতিনিবর্ত্তকর (inhibitory) নিউরোট্রান্সমিটর (রাসায়নিক উপাদান)। এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে হয় বিষণ্নতারোগ, বেড়ে গেলে হয় ম্যানিয়া। এটি ঘুমের NREM বৈশিষ্ট্য বা গভীর ঘুমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

সেরোটোনিন নিঃসৃত হয় রাফি নিউক্লিয়াস সিস্টেম থেকে। এই নিউক্লিয়াসগুলো রয়েছে ব্রেইনের মেডালা এবং পনস-এর নিম্নাংশের মাঝ লাইন বরাবর। এখান থেকে সেরোটোনার্জিক ফাইবারগুলো উপরের দিকে উঠে আসে, নিচের দিকেও চলে যায়।

এই সেরোটোনিন কমে যাওয়ার সঙ্গে কেবল বিষাদ নয়, আগ্রাসী মনোভাবও জড়িত। সাইকোপ্যাথদের আগ্রাসী মনোভাবের কারণও এই সেরোটিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে অনেকে ধারণা করেন। তবে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা ছাড়াও হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা কিংবা বিরক্তিপূর্ণ আচরণের সঙ্গেও সেরোটোনিন জড়িত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

ভালোবাসার ব্যবচ্ছেদ ঃ ভালোবাসার রসায়ন প্রসঙ্গ ঃ ব্রেইন নিউরোট্রান্সমিটর হরমোন

মৌ ভালোবাসে ময়ুখকে

ক'দিন ধরে মৌর দেখা নেই। প্রতিদিন ক্যাম্পাসে ঘোরে ময়ুখ। মৌকে খোঁজে, মৌ নেই। মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। তীব্র অশান্তি জেগেই থাকে, প্রতিনিয়তই কুরে কুরে খায়। কাজে আনন্দ নেই, সব কিছু বিষাদ লাগে। পড়তেও মন বসে না।

এতই কঠিন মৌ!

সময় নেই দেখা করার? ব্যস্ততা? নাকি ইচ্ছের অভাব? ইচ্ছের অভাব মানে টানের অভাব, মানে ভালোবাসার ঘাটতি। দেখার ইচ্ছে না জাগলে কি আর ভালোবাসা বলে কোনো অস্তিত্ব থাকে? থাকে না। তবে কী ময়ুখকে ভালোবাসে না মৌ। নাকি খাদ আছে ভালোবাসায়? অভিমানে বুক ফুলে ওঠে ময়ুখের। কান্না পাচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে, কষ্টই কি কেবল তার প্রাপ্য ?

ভালোবাসা-আকুলতা-স্থায়িত্ব

ভালোবাসার মূল প্রাণই হচ্ছে এই আকুলতা, তীব্র আকুলতা। একের জন্যে অন্যের আকর্ষণ বোধটুকুই মুখ্য উপাদান।

এই আকুলতার কারণে ময়ুখ দিশেহারা, ব্যথাতুর। অভিমান এবং কষ্টের দ্রোহে পুড়ছে কেবল।

আকর্ষণ বহু রকম হতে পারে।

শুধুমাত্র দেখা-দেখির আকর্ষণ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখি বসে থাকার আকর্ষণ, কাছে পাওয়ার আকর্ষণ, দৈহিক আকর্ষণ।

সৌন্দর্যবোধ মনের আসক্তিকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে বেড়ায়। হতে পারে মুখের সৌন্দর্য, গ্ল্যামার। হতে পারে ফিগারের টানটান সজীবতা কিংবা ব্যক্তিত্বের প্রখর ঔজ্জ্বল্য।

সৌন্দর্যের যে-কোনো একটি অনুভূতির ঘাটতি হলে অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণ কমে যেতে পারে।

রূপের একটা চৌম্বকীয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে। তাই বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে সৌন্দর্যচর্চার নানা ব্যবসাপাতি, হাঁক ডাক।

কিন্তু কথা আছে।

রূপের সঙ্গে যে আকর্ষণ সম্পৃক্ত, সেখানে ভালোবাসার চেয়ে রূপের মোহই বেশি উপচে পড়ে, ভালোবাসার প্রখরতার চেয়ে দৈহিক স্পন্দন বেশি মাত্রায় প্রাধান্য পায়।

দেহ সর্বস্ব ভালোবাসা সে পর্যায়ে থাকে দুরন্ত। বেসামাল। ভালোবাসার তীক্ষ্ণ দাপটের সঙ্গে যদি ঝলসানো রূপের মিশ্রণ ঘটে, তবে কথা নেই। বুকে জাগবে ঢেউ, দেহে জাগবে প্লাবন। জলোচ্ছ্বাসের মতো মিশ্র অনুভূতির উত্তেজনা ভেঙ্গে চুরে ঘুরিয়ে দিতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ কঠিন সেখানে। সুযোগ পেলেই ভেসে যাবে একূল-ওকূল।

ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা অনেক সময় অসুন্দর মুখের কিংবা অসুন্দর ফিগারের মানুষটিকে করে তুলতে পারে অনিন্দ্য সুন্দর। সুন্দরতম।

সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই অসম প্রেমের বিবরণ আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী বা পুরুষের ব্যক্তিত্বের মহীমায় বয়সের ব্যবধান টুটে যায়। বয়স তাই সবক্ষেত্রে ভালোবাসাবাসির ব্যারিকেড হতে পারে না।

তবে অসম ক্ষেত্রে আকর্ষণ বোধ দ্রুত কমে আসে। স্থায়িত্ব স্বাভাবিক প্রেমের চেয়ে অনেক কম।

স্বাভাবিক প্রেমের বেলায়ও ভালোবাসার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। ভিতরে ভিতরে জনম জনম ভালোবাসার বিশ্বাস সক্রিয় থাকলেও মূলত চার বছরের মধ্যেই তীব্রতা কমে আসে। ভালোবাসার হরমোন ফিনাইলইথাইলেমিন-এর মাত্রা কমে যায়। এটি বিজ্ঞানেরই কথা।

দিনে দিনে হরমোনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া কমতে থাকে। একই মুখ, একই চোখ, একই শরীর স্নায়ুকে স্পন্দিত করার মতো প্রবল তৃষ্ণা জাগাতে পারে না।

কবির ভাষায়,

ভালোবাসা মানে ঠাণ্ডা কফির পেয়ালার সামনে
অবিরাম কথা বলা,
ভালোবাসা মানে শেষ হয়ে যাওয়া কথার পরও
মুখোমুখি বসে থাকা,

কবির এই উপলব্ধি ভালোবাসার আদি অবস্থায় একশত ভাগ সত্যি। যতই দিন গড়িয়ে যাবে, পেয়ালার কফি গরম থাকতেই শেষ হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পাবে না। কথা শেষ হয়ে যাওয়া দূরে থাক, কথা বলার বিষয়ই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এটি প্রকৃতিরই শাশ্বত টান। এই টানে বয়স বাড়ে, সময় গড়িয়ে যায়, সব আবেদন ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়।

তাই ভালোবাসা হারিয়ে যাবে এটি মনে রাখার দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, যাকে ভালোবাসি আজীবনই তাকে ভালোবেসে যাবো।

বিশ্বাসই বড়। বিশ্বাসই উপহার দিতে পারে সজীব ও আনন্দময় বর্তমান।

ভালোবাসা ও অভিমান

তীব্র ভালোবাসাবাসির সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে তীব্র অভিমান। মৌকে দেখতে না পেয়ে ময়ুখের ভিতর অভিমান জাগে। অভিমান থেকে আসে কষ্ট, কষ্ট থেকে আসে নিজেকে গুটিয়ে ফেলার ইচ্ছে, এভাবেই শুরু হয় ভুল বুঝাবুঝি। ভুল উপলব্ধি থেকে আসতে পারে ভাঙ্গন। ভাঙ্গন কেবল দুজনকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয় না, দুটো হৃদয় ভেঙ্গে দেয়, দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে দেয় মনের কলকব্জা।

জীবনকে তখন অর্থহীন মনে হবে।

বড় হওয়ার চিন্তা-চেতনা, অর্থ-প্রাচুর্য–ঘনিষ্ঠজনদের স্নেহমমতা সব তেতো মনে হবে।

অভিমানকে কখনো প্রবলতর হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। সীমা অতিক্রম করার আগেই একজনকে নতজানু হতে হবে।

ভালোবাসার মানুষের কাছে নতজানু হওয়ার আনন্দ, ছোট হওয়ার আনন্দ, নিজেকে সমর্পণ করার আনন্দ কেবল তারাই উপভোগ করতে পারে, যারা প্রকৃতই প্রেমিক, প্রকৃতই প্রেমিকা।

মৌ লাইব্রেরী ওয়ার্ক করছে

হেল্প নিচ্ছে ওর সাবজেক্টের সিনিয়র ভাই বিপ্লবের। ওরা পদার্থ বিদ্যার ছাত্র-ছাত্রী। মৌ ঠিকই আসে ময়ুখের কাছে। চলেও যায় দ্রুত। পাঁচ মিনিটের বেশি যেন ব্যয় করা যাচ্ছে না ময়ুখের জন্য।

ময়ুখের ভিতর খচ খচ করে।

এত অল্প সময়ে কী আর মন ভরে? মৌর প্রয়োজন বুঝতে চায় সে। মৌর সামনে পরীক্ষা। প্রয়োজন যতই থাকুক, বিপ্লবের সঙ্গে দিনের পর দিন সখ্য, হাসাহাসি মোটেই সইতে পারে না সে। মুষড়ে থাকে। থাকে নীরব।

মৌ কী বিপ্লবের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে?

ময়ুখকে কী অবজ্ঞা করছে মৌ?

ময়ুখ কিছুই বোঝে না; বেদনায় নীল হয়েত থাকে। বুঝতে পারছে না সইতেও পারছে না।

তবে কী ময়ুখ সংকীর্ণ? মৌর প্রতি কী বিশ্বাস ক্ষীণ?

ভালোবাসা-ঈর্ষা-সন্দেহ

প্রকৃত ভালোবাসা মনকে উদার করে। বিশ্বাসী করে। আস্থা বাড়ায় মনের। সবই ঠিক আছে। কিন্তু গোপনে কোনো এক ছিদ্র পথে মনের ভিতর ঢুকে যেতে পারে ঈর্ষা। তীব্র পাওয়ার আকুলতা থেকে, কেবলই 'আমার আমার' এই উপলব্ধি থেকে ইচ্ছে কখনো পূরণ হয় না। 'অপূর্ণ ইচ্ছের' ফাঁক গলিয়ে ঈর্ষা গোপনে বাসা বাঁধে বুকের ভিতর।

ময়ুখ বুঝতে পারছে না যে তার ভিতর ঈর্ষা ঢুকে যাচ্ছে। ঈর্ষা জমে জমে পাহাড় প্রমাণ হয়ে সন্দেহে রূপান্তরিত হতে পারে। 'ধ্বংসাত্মক আবেগের জন্ম দিতে পারে ঈর্ষা। এই আবেগ নষ্ট করে শক্তি, নষ্ট করে সময়।' তাই ঈর্ষা এবং সন্দেহ ভালোবাসার চরমতম শত্রু। ঈর্ষাবোধের অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব মৌকে ছিনিয়ে নিতে পারে ময়ুখের কাছ থেকে।

বিপ্লব মেধাবী, সুদর্শন। বিপ্লবের মেধা, রূপ এবং ব্যক্তিত্বের তীব্র টানে ছিঁড়ে যেতে পারে ময়ুখের ভালোবাসার ফিতে। ঘটছে এমন ঘটনা অহরহ। ময়ুখ তো এ সমাজেরই মানুষ। দেখছে সে সব কিছু। দেখে দেখে তার ভিতর কাতরতা জাগা, ঈর্ষা জাগা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এই ঈর্ষাবোধের জন্য ময়ুখকে দোষ দেওয়া যাবে না, দোষ দেওয়া যাবে না মৌকে, দোষ দেওয়া যাবে না বিপ্লবকে।

আসলে এসব কিছুই ঘটছে প্রকৃতির গভীর নিয়ন্ত্রণ শক্তির কারণে। প্রকৃতি টেনে নিয়ে যায় মানুষকে, মানুষের মনকেও। মনের ভিতরের গোপন ক্রিয়া ভালোবাসা হজম করে নেয় প্রকৃতি। তাই বিশ্বব্যাপী দেখা যায় ভালোবাসা পাত্র থেকে পাত্রে সঞ্চারিত হয়।

এ কারণেই মানুষ ঈর্ষা প্রবণ, সন্দেহ প্রবণ। দোষ দেবো কাকে? মানুষকে? নাকি প্রকৃতিকে? কার নেশার টানে প্রকম্পিত হয় আপনভুবন? প্রকৃতির টানে নয় কী? মূলত যতই উদার হোক না কেন, ঈর্ষা এবং সন্দেহের উর্ধ্বে উঠতে কমই পারে মানুষ।

এজন্যই প্রশ্ন তোলা যায়, এক জীবনে ক'জনকে ভালোবাসতে পারে মানুষ? পাত্র ভেদে, সম্পর্ক ভেদে ভালোবাসার স্বরূপ আলাদা। তাই ভালোবাসার মানুষেরও কমতি নেই।

তবে প্রেমিক-প্রেমিকা মনে করে তারা 'মেড ফর ইচ আদার' এই সত্যের পরও কথা থাকে, এক জনমে বহুজনের সঙ্গে হতে পারে প্রেমের বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন। তবে সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যে এই বন্ধন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে মানুষ।

ভালোবাসা-ব্যর্থতা-প্রতিহিংসা

তীব্র আকুলতার পাশাপাশি রয়েছে তীব্র প্রতিহিংসা। ভালোবাসার সফলতা যেমন মনে জাগায় শক্তি, ব্যর্থতাও তেমনি জাগায় ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি।

মৌ যদি ময়ুখকে ছেড়ে যায়, বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ময়ুখের ভিতর কেবল রক্তক্ষরণই ঘটবে না, প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র বাসনাও জাগ্রত হতে পারে।

এ কারণেই এসিড ছোঁড়ার মতো ঘৃণ্যতম ঘটনা আমরা প্রায় সংবাদের শিরোনাম হিসেবে দেখে থাকি।

যে সৌন্দর্য ময়ুখকে মুগ্ধ করতো, অনুপ্রেরণা জাগাতো ময়ুখের ভিতর, সেই সৌন্দর্য বীভৎস করে দেওয়ার বিকৃত ইচ্ছের জন্ম নিতে পারে ময়ুখের আচরণে। এমন কী খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে, হচ্ছে এমন অহরহ।

আবার উল্টো ব্যাপারও ঘটতে পারে।

ভালোবাসার ব্যর্থতায় ময়ুখ ভেঙে পড়তে পারে। কলম নিয়ে বসে যেতে পারে, বন্ধুর কাছে লিখতে পারে কষ্টের কথা। লিখতে লিখতে লেখালেখির দিকে ধাবিত হতে পারে, ভালোবাসার শক্তি কলমে ভর করতে পারে, লেখক হয়ে যেতে পারে ময়ুখ।

বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যর্থতা বা হতাশার আচরণগত এই প্রতিক্রিয়াকে বলে, উদ্‌গতি।

বলা হয়ে থাকে ভালোবাসা একধরনের শক্তি। শক্তির ক্ষয় নেই, লয় নেই। পরিবর্তন আছে মাত্র।

এই পরিবর্তিত শক্তিতে ময়ুখ অন্য ধরনের জৌলুশ পেতে পারে, যা পেয়ে ছিল সফলতায়।

পরিবেশ-প্রকৃতি ও ভালোবাসা

একজনকে ভালোবেসে ফেললাম, বিশ্ব জয় করে নিলাম। এটিই বড় প্রাপ্তি নয়। আসল স্তম্ভ হচ্ছে, ভালোবাসা জাগ্রত হওয়ার পর ওটি টিকিয়ে রাখারও প্রচেষ্টা থাকতে হবে ভিতরে ভিতরে। ভালোবাসা থেকেই ময়ুখের ভিতর একটি ছোট্ট চারা গাছ প্রোথিত

হয়েছে। গাছটিকে বড় করতে হবে, ফুল ফোটাতে হবে গাছে। চাই পরিচর্যা। নিয়মিত গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া, আলো বাতাস পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা। সঠিক পরিচর্যাই বিকশিত করতে পারে প্রয়োজনীয় ডালপালা। সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর একঘেয়েমি জেগে যেতে পারে মৌর ভিতর। জাগতে পারে ময়ুখেরও ভিতর।

তাই চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে বেড়াতে হবে। পরিবেশের পরিবর্তন করতে হবে। নতুন পরিবেশে ভালোবাসার মানুষের ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় নতুনত্ব।

ছুটে যেতে হবে সুন্দরের কাছে, সমুদ্রের কাছে, পাহাড়ের কাছে। অথবা নির্জন কোনো মনোরম স্থানে।

সমুদ্র বিশাল, মানুষের মনকেও করে বিশাল, উদার। ভালোবাসার জন্য বিশালত্বের বড়ই প্রয়োজন।

বি-লাভ এবং ডি-লাভ

মনো-গবেষক আব্রাহাম মেসলো নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ভালোবাসার অভিধানে দুইটি সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা যোগ করেছেন–বি লাভ এবং ডি লাভ।

তাঁর মতে নিখাদ ভালোবাসা হচ্ছে বি টাইপের ভালোবাসা– এটি পরিণত ভালোবাসা। জীবনের সফলতা, আত্মতুষ্টি, সুস্থিরতার সঙ্গে এই ধরনের আবেগীয় সম্পর্কের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। উভয় পাত্র-পাত্রী যদি চার পাশ থেকে সমৃদ্ধ মনমানসিকতা নিয়ে পরিণত হতে পারেন, হৃদিকে বন্ধনে জড়াতে পারেন, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বের অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, কেবল তখনই বিচ্ছুরিত হবে বি টাইপের ভালোবাসা। এটি নিঃস্বার্থ উজাড় করা সম্পর্ক গড়ে তোলে দুজনের মাঝে।

ডি টাইপের ভালোবাসার পুরো অর্থ ডেফিসিয়েন্সি ভালোবাসা। দুজনের ভালোবাসায় থাকে ঘাটতি, স্বার্থ নির্ভর এই ভালোবাসায় নানা টানাপোড়নের সংঘাত তৈরি হতে থাকে, দুজনের মনের মনস্তাত্ত্বিক মিলের কমতি এক্ষেত্রে বেশিমাত্রায় লক্ষণীয়। এখানে থাকে খুঁত, কৃত্রিমতা।

কিন্তু আব্রাহাম মেসলো গুরুত্বের সঙ্গে পরিমাপ করতে পেরেছেন যে, বি টাইপের ভালোবাসা স্বয়ংসম্পূর্ণ নিখুঁত এবং নানা আঙ্গিক থেকে সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্যময়। এ ধরনের ভালোবাসার প্রেমিক প্রেমিকারা মূলত স্বাবলম্বী, তাদের ঈর্ষা কম, উদ্বেগ কম, তারা স্ব-মহিমায় মহীয়ান। তারা বাস্তববাদী, নিজেদেরকে উজার করে আনন্দ পান, হৃদ্যতা নিয়ে গর্ববোধ করেন।

ভালোবাসা ॥ প্রসঙ্গ ঃ ব্রেইন নিউরোট্রান্সমিটর হরমোন

ভালোবাসা এক ধরনের পজিটিভ ইমোশন।

ইতিবাচক এই আবেগের গহীনে রয়েছে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা প্রেক্ষাপট গোপন তদবির। নিজের ভেতর শক্তি সঞ্চারিত হয়, উদ্যম জেগে ওঠে, লক্ষ্যের দিকে বেপরোয়া গতিতে ধাবিত হয় প্রেমিক-প্রেমিকা। ধাবমান পথ থেকে তখন তাকে সরিয়ে আনা কঠিন। বাঁধা পেলেই আরো ঘনিভূত হয় ভালোবাসার তেজ। আরো বেশি দুরন্ত গতি সঞ্চারিত হয়, সামনের পথ রুদ্ধ হলে গোপন পথে চলতে থাকে নীরব বিপ্লব। সরাসরি বাধাও অনেক সময় তুচ্ছ হয়ে যায়। একারণেই ভালোবাসার জন্য রাজা ছাড়ে রাজ্য, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শান্ত সৌম্য লাজুক কিশোরী, তরুণী। এমনকি বিবাহিত নারী পুরুষও পরকীয়া প্রেমের টানে ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাবা-মা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান সবার কথা চাপা পড়ে যায় দানবীয় ভালোবাসার বেগবান শক্তির পদতলে।

কোত্থেকে আসে এই শক্তি?

এখানে যেমনটি রয়েছে আবেগের ভূমিকা তেমনি রয়েছে হরমোনসহ অনেক রাসায়নিক উপাদানের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গোপন চাল। অন্তর্গত রাসায়নিক পরিবর্তন আমাদের চিত্তে ঝলসে ওঠে, পাল্টে দেয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রেম-রোমান্সের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার থাকে কামের নেশা। এই নেশা প্রথমে থাকে লুকোনো। সুযোগ ও সময় পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রেম ও কাম তাই বিলীন হয়ে থাকে একই মুদ্রার দু'পিঠে। তখন সব কিছু আর আবেগের গন্ডির মধ্যে থাকে না। রাসায়নিক উপাদানের সুতীব্রটানে খুলে যায় আদিম খোলস। এমন একটি উপাদান হচ্ছে **ইস্ট্রোজেন** হরমোন। এটিকে স্ত্রী হরমোন বলা হয়। আর একটি হচ্ছে **টেস্টোস্টেরণ** বা পুরুষ হরমোন। নারী পুরুষের শারীরিক গড়ন নির্ভর করে এই দুইটি হরমোনের আনুপাতিক হারের ওপর।

শারীরিক গড়ন, কাম-তৃষ্ণা ছাড়াও রোমান্টিক আবেগ অনুভূতির সঙ্গেও রয়েছে ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরণের গোপন খেলা। রাসায়নিক উপাদানের বিক্রিয়ার ফলে প্রেম ভালোবাসা এবং মানবিক তীব্র আবেগীয় অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। কিছু কিছু রাসায়নিক উপাদান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এই উপাদানগুলো হচ্ছেঃ এমফিটামিনস, ফিনাইলইথাইলামিন বা পী পদার্থ, নরইপিনেফ্রিন, এন্ডোরফিনস, অক্সিটোসিনন সেরোটোনি, ইত্যাদি।

এমফিটামিনসঃ চকতি চাহনি, হাসির মোহনীয় আবেদন কিংবা হঠাৎ স্পর্শে ব্রেইনে এমফিটামিনস এর নিঃসরণ ঘটে যায়- ফিনাইলইথাইলামিন বা পী পদার্থ ও নরইপিনেপ্রিন-এর মাত্রাও চকিতে ছলকে ওঠে, ভালোলাগা কিংবা ভালোবাসাবোধ জেগে ওঠে তখন। এখানে মনে রাখা দরকার, এমফিটামিনস ওষুধ হিসাবেও বাজারে পাওয়া যায়। এটি সাইকোস্টিমুলেন্ট এজেন্ট হিসাবে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বয়স্কদের ঘুম ঘুমরোগ নারকোলেপ্সি এবং শিশুদের মনোরোগ, হাইপারকাইনেটিক ডিসওর্ডারে ব্যবহার করেন। কিন্তু থেরাপিউটিক সিডিউল বর্হিভূত এই টেবলেট মাদকদ্রব্য হিসাবে অপব্যবহার হচ্ছে সমাজে। একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এই নিবন্ধে বাহির থেকে সরবরাহকৃত কৃত্রিম এমফিটানমিসের কথা বলা হচেছ না। ব্রেইনের ভেতর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিঃসৃত এমফিটামিনসের কথা বলা হচ্ছে।

পী পদার্থের কারণে জেগে ওঠে ভালোবাসার তীব্র আকুলতা। কিন্তু একই মুখ একই চোখ, একই স্পর্শে পী পদার্থের নিঃসরণের মাত্রা দীর্ঘদিন একই রকম থাকে না। সময়ের পরিক্রমায় এটির নিঃসরণের মাত্রা এবং প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা হ্রাস পায়। ভালোবাসার উত্তাল জোয়ারে তখন চলে আসে ভাটির টান। এই পুলকের নিম্নগতি শুরু হলেই বিচ্ছেদের অশনিসংকেত বাজতে থাকে। এটি মূলত পশ্চিমের ট্রেডিশন, বিয়ে বিচ্ছেদ কিংবা অশান্তি তখন অনিবার্য দানব হিসাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। শরীর-মনের পুলকিত তাগিদ কমে যায় রাসায়নিক উপাদানের 'টলারেন্সের কারণে। এই টলারেন্স তৈরি হতে স্নায়ুতন্ত্রের সময় লাগে উর্ধ্বে চার বছর।

কিন্তু এর পরও তো বিয়ে টিকে থাকে, ভালোবাসা দীর্ঘায়িত হয় অনেকেরই জীবনে। এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতেও গড়ে চারটি বিয়ের মধ্যে তিনটি টিকে যায়।

কীভাবে সম্ভব?

মূলত দু'জন মানব মানবী দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার কারণে একটি অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে যান। এই বাঁধনে শক্ত গিঁট এটে দেয় এন্ডরফিনস নামক রাসায়নিক উপাদান এবং অক্সিটোসিন নামক হরমোন।

এন্ডরফিনস দু'জনার মাঝে শান্ত সৌম্য নিরাপত্তার অনুভূতি জাগায়, উন্মাতাল ঢেউ জাগায় না। প্রধানত উত্তাল অনুভূতি তৈরি হয় কমবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে। পী পদার্থের কারণটিই এখানে মুখ্য।

কম বয়সের প্রেম দ্রুত মিলিয়ে গেলেও নিঃশেষ হয়ে যায় না। এদের প্রেম পাত্র থেকে পাত্রে সঞ্চারিত হয়। নতুন মুখ, নতুন চোখ, নতুন হাসি তুমুল উদ্দীপনায় আবার ব্রেইনকে উদ্দীপ্ত করে, নতুন করেই সমান মাত্রায় পী পদার্থের নিঃসরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। নুতন প্রেমের জোয়ার পূনোদ্যমে আবার চলে আসে এভাবেই। পক্ষান্তরে এন্ডর

ফিনসের কারণে ভালোবাসায় স্থিতি আসে বিধায় প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অনেক ভুলত্রুটি সয়ে নিতে পারে। হুট করে এদের ভালোবাসা চলে যায় না, রং বদলায় না।

দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যত্নশীল হওয়ার পেছনে রয়েছে অক্সিটোসিন হরমোনের বিরাট অবদান। যতো বেশি এই রাসায়নিক উপাদানটির নিঃসরণ ঘটবে ততোবেশি উভয়ে পরস্পরের কাছে যাবে। অক্সিটোসিন মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারগুলো সক্রিয় করে তোলে। গবেষণার এই ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই কালক্রমে ভায়াগ্রা জাতীয় ওষুধ আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ভায়াগ্রার মতো যৌনবর্ধক ওষুধ মানুষের মৌলিক অনুভূতি কিংবা রাসায়নিক উপাদানসমূহের বিকল্প নয়। এই ওষুধের মাধ্যমে দেহের ভেতর প্রেম ভালোবাসার উদ্দীপনা ঘটে না। ফলে জীবন সাথীর মৌলিক অনুভূতি যথাযথ মূল্যায়ন পায় না।

গবেষণায় দেখা গেছে, অব্যাহত অকৃত্রিম দেহ মিলনের ফলে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান দেহের ভেতর উৎপাদিত হয়। অক্সিটোসিন তখন এন্ডরফিনস-এর নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। এনডরফিনস মনকে শান্ত করে, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করে। বিজ্ঞানীরা এই রাসায়নিক উপাদানকে মাদক জাতীয় নির্ভরতা বলে চিহ্নিত করেছেন। মাদকদ্রব্য যতোবেশি নেয়া হয় ততো নেশা গাঢ় হয়, নির্ভরশীলতা ততোই বেড়ে যায়। দেহমিলনও অনেকটা সেরকম। এজন্যই অব্যাহত দেহমিলনকে দাম্পত্য বন্ধনের চাবি কাঠি হিসাবে উল্ল্যেখ করেছেন অনেক গবেষক। দৃশ্যমান বন্ধনের মূল পর্ব দেহমিলন হলেও, মূল বন্ধনকে মহিমান্বিত করে অক্সিটোসিন। এই রাসায়নিক উপাদনটিকে তাই অফুরন্ত ভালোবাসার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

ব্রেইনের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডর পশ্চাৎভাগ থেকে নিঃসরণ ঘটে অক্সিটোসিন হরমোনটির। এটি প্রধানত জরায়ুর পেশী সংকোচনের মাধ্যমেই সন্তান প্রসবের মূল কাজটি করে থাকে। এছাড়াও স্তনের বোটা চোষার সময় শিশুর মুখে দ্বধের প্রবাহ তুলে দেয় অক্সিটোসিন। সন্তান প্রসবের সময় মাকে ওষুধ হিসাবে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। ফলে প্রসব কাজ ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু ইদানীংকালে অক্সিটোসিনকে কেবলই নারী হরমোন হিসাবে দেখা হয় না। পুরুষের শুক্র নির্গমণে, সঙ্গমের পর নারী দেহে শুক্র প্রবাহে, উত্তেজনা স্পর্শে, এমন কি দেহমিলনের পর পুরুষের দেহে এই হরমোনটির আধিক্য দেখা দেবেই।

আমেরিকাতে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মানুষটির দেহে যথাসময়ে সঠিকমাত্রায় এই হরমোনটির নিঃসরণ ঘটে না। এছাড়াও দেখা গেছে,

যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, অথবা আত্মপীড়নকারী অথবা জীবন বিমুখ বিষণ্ন মানুষ, তাদের রক্তেও অক্সিটোসিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে।

ক্রোধ, উত্তেজনা কিংবা মানসিকচাপ যুক্ত অবস্থায় এড্রিনালিন হরমোনের নিঃসরণ ঘটে বেশি মাত্রায়। এটি অক্সিটোসিন নিঃসরণে বাঁধার সৃষ্টি করে। যতো বেশি ক্রোধ চাপা থাকবে ততো বেশি ভালোবাসার গিঁট অক্সিটোসিনের অভাবে শিথিল হতে থাকবে। দাম্পত্য সম্পর্কে ক্রোধ অনেক সময় ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

সুইডেনের গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, এই হরমোন কমে গেলে বন্ধুভাবাপন্ন অনুভূতিতে ধস নামে। সঠিকমাত্রায় অক্সিটোসিন বন্ধুত্ব ও মাতৃত্বকে সমৃদ্ধ করে, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য বাড়িয়ে দেয়। যে সকল মা স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব করেছেন এবং পরবর্তিকালে শিশুকে বুকের দুধ দিয়েছেন, তাদের রক্তে অক্সিটোসিনের পরিমিত মাত্রা বজায় থাকে। পক্ষান্তরে যাদের সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে, বুকের দুধ পান করানোর পরও তাদের একই মাত্রায় অক্সিটোসিন নিঃসরণ ঘটে না। এর থেকে প্রমাণিত হয়েছে মৌলিক ইস্যুতে স্নেহ সঞ্চারের জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে হরমোনটির নিঃসরণ ঘটে।

বৃটেনের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, তীব্র উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা কিংবা বিষণ্নতায় যে সকল গর্ভবতী নারী অধিক সময় কাটিয়েছেন তাদের প্রসবজনিত জটিলতা বেশি হয়। এতো সব গুণের কথা বিবেচনা করে বৃটেনে বিষণ্নতারোগে অক্সিটোসিনের স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই স্প্রে রোগীর মনকে চাঙ্গা করে তোলে, উৎফুল্লতায় ভরিয়ে রাখে জীবন যাপন। তবে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে দেহে অক্সিটোসিনের মাত্রা বাড়াতে আগ্রহী নন। তারা চাচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যদিয়ে অক্সিটোসিনের নিঃসরণ বেড়ে উঠুক, ভালোবাসা ও স্নেহমমতায় সমৃদ্ধ হোক মানুষের মন।

দেহ ও মনের রসায়নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমকে একধরনের উন্মাদনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রেমে আক্রান্ত নরনারী চিন্তা এবং আচরণে যেন স্বপ্ন রাজ্যে ভেসে বেড়ায়, একটি ঘোরের মাঝে ডুবে যায়, আচ্ছন্নতা গ্রাস করে তাদের সকল চাওয়া পাওয়া, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গুটিয়ে এসে যেন প্রেমিকার শরীরী অবয়ব ধারণ করে। প্রেমের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা obsessive compulsive disorder (OCD) এর মিল দেখতে পেয়েছেন। এটি একটি মানসিক রোগ। ওসিডি আক্রান্তদের মনে একই চিন্তা বার বার মনের মাঝে জেগে ওঠে, একই কাজ বার বার করতে বাধ্য হয়। যারা প্রেমে পড়ে তাদের ভেতরও একই চিন্তা, একই মুখ বার বার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। একই উদ্বেগ অনুভূতি আশংঙ্কা মনের ভেতর ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে।

উভয় ক্ষেত্রে কেবল বাইরের আচরণের মধ্যেই নয়, ব্রেইনের ভেতরগত রাসায়নিক উপাদানের মাঝেও একই ধারার মিল লক্ষনীয়।

ইতালীর পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডেনোটেলা মারজিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মলিকুলার বায়োলজিস্ট ডিন হ্যামারের গবেষণার ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে যে, ওসিডিতে নিউরোট্রান্সমিটর সেরোটোনিন-এর মাত্রা কমে যায়, তেমনি প্রেমে আক্রান্ত নারী পুরুষের সেরোটোনিও কম থাকে।

তাই বলে কি বলা যাবে যে, ভালোবাসা একটি মানসিক রোগ?

মেনে নেবে প্রেমিক-প্রেমিকা?

এখানে একটি সন্দেহ এখনো রয়ে গেছে। কারণ মারজিটি এবং হ্যামারের গবেষণায় বলা হয়েছে, তারা সরাসরি নিউরোট্রান্সমিটরে সেরোটোনিন-এর মাত্রা পরিমাপ করতে পারেননি। রক্তকণিকা প্লেটলেট-এর ভেতর যে সেরোটোনিন থাকে সেটিই পরিমাপ করেছেন। এটি পরোক্ষ পরীক্ষা পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ নয়। তবে জ্ঞোনিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, স্বাভাবিক মানুষের ব্রেইনের সেরোটোনিন এবং প্লেটলেট-এর সেরোটোনিনের মাত্রা একই থাকে। কিন্তু উভয় উপাদানটির কাজের ভিন্নতা রয়েছে। প্লেটলেটের সেরোটোনিন রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে হ্যাগোপ একিস্কাল নামক মার্কিন গবেষক মনে করেন, নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটোনিন-এর ওপরই প্রেমের ব্যাপারটি নির্ভর করে, প্রেমের জন্য তীব্র দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে এই রাসায়নিক উপাদান।

আবার অধ্যাপক হেমারের গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের ব্রেইনে দীর্ঘদিন ধরে সেরোটোনিন কম থাকে তারা অস্বাভাবিক যৌন কাতর থাকে, এদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বেশি থাকে, যৌনক্ষমতাও বেশি। একিস্কাল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে রোমান্টিক মনের মানুষ আসলে সাইক্লোথাইমিক রোগী। তারা যখন উৎফুল্ল থাকেন, ব্রেইনে সেরোটোনিনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন দ্রুতই তারা প্রেমে পড়েন। যখন বিষণ্ন থাকেন, সেরোটোনিনের মাত্রা কমে যায় তখন আত্মঘাতি মনোভাবও জাগতে পারে তাদের ভেতর।

বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং ভালোবাসা মানসিক রোগ কিনা নিশ্চিতভাবে বলার জন্য আরো সুনির্দিষ্ট গবেষণার ফলাফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ইরোটোম্যানিয়া ঃ ভালোবাসার অলিক বিশ্বাস

মধ্যরাতে টেলিফোনটি বেজে ওঠে। বাজতেই থাকে।

গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন শিরিন। গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকলেও টেলিফোনের শব্দে ডান হাতটি চলে আসে সেটের কাছে। রিসিভারটি তুলে নেয়, ঘুমের ঘোরেই কানে চেপে ধরে।

হ্যালো। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো শিরিন।

আপু! ঘুমোচ্ছ নাকি জেগে আছো? ওঠো। ওঠো। মিথিলার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। আনন্দ।

কি হয়েছে রে? এতো রাতে হৈ-চৈ করছিস কেন?

আগে সোজা হয়ে বসো। তোমার চোখে ঘুম। শরীরেরও ঘুমের আলসেমি। আর কণ্ঠেও ঘুমের অলসতা, বিরক্তি। সোজা হয়ে আলসেমি ঝেড়ে না বসলে মধুর সংবাদ শুনবে কিভাবে? ওঠো। বসো। বসেছো?

চারদিক থেকে কেবল দুঃসংবাদ আসে, টেনশনের খবর আসে। সবার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে বোর হয়ে গেছে শিরিন। মধুর সংবাদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নাড়া খেলো যেন ভেতরে। মনে হলো মিথিলার ভেতর একটি আনন্দময় ট্রেন ছুটে চলেছে। এই ট্রেনের গতি সামাল দেওয়ার শক্তি তার নেই। মানুষের দুঃখের যেমন সে অংশীদার, আনন্দেরও তেমনি ভাগ পেতে ক্ষতি কি।

বল। কি এমন মধুর সংবাদ বলে ফেল।

এই তো লক্ষ্মী আপু। ডিয়ার আপু। তোমার স্বরে বিরক্তি কমে গেছে, আগ্রহ জেগে উঠেছে। আমি জানি তুমিই শুনবে আমার কথা, তুমিই আনন্দিত হবে বেশি।

আহা। কি হয়েছে আগে বল তো। বেশি বকবক ভালো লাগছে না।

শোনো, রাহুল আমার সঙ্গে কথা বলেছে। আদর জানিয়েছে। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। বলো, এবার তুমিই বলো, এই আনন্দের জোয়ার সামাল দেই কিভাবে?

কোন রাহুলের কথা বলছিস? শিরিন বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলো।

কেন্ ওই যে, তোমাদের বিখ্যাত রাহুল চৌধুরী, টিভি স্টার। তোমার যেন কেমন আত্মীয় হয়।

শিরিন একটি ধাক্কা খেলো এবার। মিথিলার মাথায় কি গোলমাল শুরু হলো? না, তাতো মনে হচ্ছে না। কি করে সম্ভব? রাহুলের কি এ ধরনের কথা বলা শোভন হলো? চুপসে যায় সে নিজের অজান্তেই।

আপু কথা বলছো না কেন? হিংস্বায় কি পুড়ে যাচ্ছো তুমি? বিস্ময়ে কি বিমূঢ় হয়ে গেলে? তোমাদের মহাবিখ্যাত নায়ক রাহুলের এমন অপ্রত্যাশিত অভিনব প্রেম নিবেদনে কি বিরক্ত হলে? এটি অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত অনন্য সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো দৈববাণী নয়। এ হলো প্রেমের বাণী। রাহুল চৌধুরীর প্রেমোপখ্যান। এ উপাখ্যান কেবল আমারই জন্য। হা..... হা..... কেবল তোমাদের মিথিলারই প্রাপ্য।

শোন। এতো তাড়াহুড়ো করে কথা বলছিস কেন? একটু আস্তে বল।

আস্তে কথা বলার সময় নেই আপু। এ জন্যই তো গভীর রাতে তোমাকে রিং করলাম।

কখন রাহুলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? শিরিন জানতে চাইলো।

ওঃ। দেখা করার কথা বলছো, আরে না, দেখা হবে কেন। আমি কি এতোই সহজ লভ্য যে ওকে দেখা দেবো? কিছুদিন ধরে আমার জন্য সে প্রায় উন্মাদ হতে বসেছিল। আসলে আমাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন। একমাত্র আমিই এখন তার সব চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্র বিন্দু। বেচারার এতো কষ্ট দেখে ভাবলাম একটু সান্ত্বনা দেই। তোমাকে রিং করার আগেই তাকে আমি রিং করলাম। তখনই গদগদ হয়ে ভালোবাসার কথা জানালো।

ওঃ। আচ্ছা। শিরিনের আগ্রহ যেন দমে গেল। রিসিভার রাখতে পারলেই রক্ষা। কিন্তু আগে রাখা যাবে না। তাহলে ক্ষ্যাপে উঠবে মিথিলা।

আপু। তাহলে ঘুমোও এখন। হ্যাভ এ নাইস ড্রিম।

এক ধরনের বিমূঢ়তা নিয়ে টেলিফোন রেখে দিলো শিরিন।

এওকি সম্ভব? রাহুল এদেশের বিখ্যাত এক টিভি স্টার। মেরেড। দাম্পত্য জীবনে অসম্ভব সুখী। দু'টি মেয়ের জনক। অর্থবিত্তে, সুনামে তুলনাহীন। এমন একজন কিনা মিথিলাকে প্রেম নিবেদন করেছে? মিথিলার কথা এবং আচরণে তো গোলমাল চোখে পড়েনি তার। বরঞ্চ শব্দ চয়নে কেমন যেন ক্ষুরধার একটা ভাব। উচ্ছ্বাস এবং বুদ্ধিতে কোনো ঘাটতি নেই। তবে? না। মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ঘুমের জন্য শরীর এলিয়ে দেয় আবার।

আবার রিং হচ্ছে। ঘুম পালিয়ে গেছে শিরিনের। তবুও রিসিভার তুলতে একটু সময় নিচ্ছে। আবারো নিশ্চয় মিথিলার কাণ্ড। হয়তো আরো কিছু কথা বাকি আছে। তাই আবার

ফোন। দ্বিধান্বিত হয়ে রিসিভারটি তুলে নিলো। একটু সময় নিলো শিরিন। তারপর গাঢ় অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো,

হ্যালো। শিরিন বলছি। কে বলছেন প্লিজ?

আমি রাহুল চৌধুরী বলছি।

ও ঃ ! সুমন ভাই! কি খবর? এতো রাতে রিং করলেন যে? শিরিন যেন আবারো একটি ধাক্কা খেলো।

শোনো মহাবিপদে আছি, ভেবে দেখলাম তুমিই এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারো আমায়।

শিরিন যেন হঠাৎই দমে গেল। তবে কি রাহুল ভাই তাকে মিডিয়া হিসেবে কাজে লাগাবে। তবুও কথা এবং আচরণে শোভন থাকার চেষ্টা করলো সে। বলুন কি উপকার করতে পারি আমি? বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললো শিরিন।

তোমার ফ্রেন্ড রুমানার সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে এখন?

হ্যাঁ, আছে। প্রায় প্রতিদিনই ও আসে। আমিও যাই ওদের বাসায়।

ওর বোন মিথিলার সঙ্গে পরিচয় কেমন তোমার?

ভালোই। ছোট বোনের মতোই। ফ্রেন্ডও বলতে পারেন।

আচ্ছা ও কি স্বাভাবিক? আই মিন মানসিকভাবে সুস্থ?

হ্যাঁ, সুস্থই তো। মিথিলার টেলিফোনের কথা চেপে যায় শিরিন।

মেয়েটি আমার জীবন হেল করে ছাড়লো। প্লিজ বাঁচাও আমাকে! রাহুলের কণ্ঠে যেন কাতরতা। অনুনয়।

হেল করে ছাড়লো মানে?

মানে খুবই কঠিন। অচিন্তিনীয় অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার। সবাইকে মিথিলা বলে বেড়াচ্ছে আমি তার প্রেমে পড়েছি। তাকে ছাড়া আমার জীবন নাকি অর্থহীন, বেমানান। রাত নেই, দিন নেই লেগেই আছে আমার পিছে। গীফট পাঠাচ্ছে, টেলিফোন করছে মুহুর্মুহুর চিঠি পাঠাচ্ছে। তোমার ভাবীর কানেও গিয়েছে এসব কথা। আমার দাম্পত্য জীবনেও ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখন।

তালি কি একহাতে বাজে রাহুল ভাই? আপনি কি একটুও ইনভলভড নন? শিরিন একটু দৃঢ় অবস্থানে থাকার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ। সমর্থন করছি তোমাকে। যুক্তি দেখাতে পারো তুমি। কিন্তু বিশ্বাস করো এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো ধরনের জানাশোনার সুযোগ হয়নি, সে পূর্বপরিচিতও নয়- আগে চিনতামই না। অতিষ্ঠ হয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে তোমার পরিচিতা। আগেই ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো, সুযোগ হয়নি। এখন মাঝ রাতেই

তোমাকে রিং করলাম। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেও মেয়েটি আমাকে টেলিফোন করেছিল। আই এম ইন সিরিয়াস ট্রাবল নাও। প্লিজ হেলপ মী।

ওঃ। তাহলে আপনি তাকে ভালোবাসার কথা বলেননি? শিরিনের পাল্টা জিজ্ঞাসা।

প্রশ্নই আসে না, তাকে এড়িয়ে চলি আমি। টেলিফোন রিসিভ করি না। সে এসব আচরণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে। কয়েকজনকে বলে বেড়িয়েছে এ হলো আমার গভীর দুর্বোধ্য প্রেমের প্রকাশভঙ্গি। আমার স্থির বিশ্বাস সে কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছে। তুমি ওর পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ করো। কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নাও। এতো রাতে ফোন করার জন্য দুঃখিত। প্লিজ টেক ইট সিরিয়াসলি।

টেলিফোন রেখে দিয়েছে রাহুল চৌধুরী। দ্বন্দ্বে পড়ে যায় শিরিন। কার কথা সত্য? রাহুল ভাই নাকি মিথিলার? সত্যিই কি কোনো মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে মিথিলা?

ব্যাখ্যা

দেহ যেমন আছে– আছে দেহের সুস্থতা, অসুস্থতা।

দেহের ভেতর রয়েছে সুন্দর একটি মন– রয়েছে মনের সুখ, অসুখ।

দেহ অসুস্থ হলে আমরা উদ্বিগ্ন হই। চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল থাকি। মন অসুস্থ হলে আমরা উপহাস করি, অবহেলা করি– নির্মমতার শেকল পরিয়ে মনের দাবিকে আবদ্ধ করি। এ এক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা।

মিথিলার ঘটনাটি কেবল গল্পেরই প্লট নয়। এ জীবনেরই একটি খন্ড চিত্রও, সত্যদৃশ্য। কেস হিস্টোরির অংশ বিশেষ।

মিথিলা অসাধারণ রূপবতী এক নারী। ত্রিশ বছর বয়স। উচ্চশিক্ষিতা। নিঃসন্তান। বিয়ে হয়েছে চার বছর। স্বামীর সঙ্গে দেশের বাইরে ছিল। গত দু'বছর ধরে দেশে আছে। এনজিও তে চাকরি করে। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কর্মস্থলে বেশ চটপটে, কোনো ঘাটতি নেই কাজে। আচরণে কেউ তার খুঁত দেখেনি।

হঠাৎ করে মিথিলার ভেতর একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস শেকড় গেড়ে বসেছে– 'রাহুল তার প্রেমে পড়েছে।' সত্য এই যে রাহুল তার প্রেমে পড়েনি। কোনোভাবেই ইনভলভড নয় সে। এটি মনোজগতেরই এক অলিক বিশ্বাস, ডিল্যুশন (delusion) । এই ভুল বিশ্বাস যুক্তি দিয়ে দূর করা যায় না। এটি দৃঢ়ভাবে রোগীর নিজস্ব বিশ্বাসকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অন্য কেউ সেটি বিশ্বাস করে না, সমাজের অন্যকোনো উপাদান দিয়ে সেই বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নানা ধরনের মনোরোগে এই ডিল্যুশন দেখা যায়।

একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে যখন কোনো রোগি ঘুরপাক খেতে থাকে, বৃত্তবন্দী হয়ে থাকে সেই বিশ্বাসের শেকড় ধরে, অন্যকোনো মানসিক রোগ যখন একক বিশ্বাসটির সঙ্গে জড়িত থাকে না তখন তাকে বলে ডিল্যুশনাল ডিসওর্ডার (delusional disorder)।

ডিল্যুশনাল ডিসওর্ডারের একটি ধরন হচ্ছে ইরোটোম্যানিয়া (erotomania)। মিথিলা এই মানসিক রোগে আক্রান্ত। ডায়াগনোসিসের জন্য কমপক্ষে একমাস অপেক্ষা করতে হবে। যখন ভ্রান্ত বিশ্বাসটি একমাস বা ততোর্ধ্ব বজায় থাকবে তখন ইরোটোম্যানিয়া নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এখানে উদ্ভট (bizarre) শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ।

যতোই অসম হোক না কেন সুমনের মতো একজন স্টারের সঙ্গে মিথিলার প্রণয় ঘটতেই পারে যদি তেমন সুযোগ থাকে। সমাজে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটছে বা আছে। ব্যাপারটি অসম হলেও তাই উদ্ভট নয়। কিন্তু যদি একটি ছেলে বা মেয়ে দাবি করে তার সাপের সঙ্গে প্রেম হয়েছে– এটি হবে উদ্ভট। উদ্ভট বিশ্বাস বড়ো ধরনের মানসিক রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন সিজোফ্রেনিয়া (schizoprenia)। তাই ইরোটোম্যানিয়া ডায়াগনোসিসের জন্য ডিল্যুশনটি হতে হবে non-bizarre(উদ্ভট নয়)।

সাধারণত মহিলাদের ক্ষেত্রেই ইরোটোম্যানিয়া বেশি দেখা যায়। যারা একাকী থাকে, মধ্যবয়সি তারাই বেশি আক্রান্ত হয়। পুরুষদের মাঝেও এ সমস্যা দেখা গেছে তবে হার কম । ধীরে ধীরে এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে, হঠাৎ করেও শুরু হতে পারে। সাধারণত অর্থবিত্তে মর্যাদায় সুপরিচিত এমন কোনো জননন্দিত কারু প্রতিই এমন অলীক বিশ্বাস এসে থাকে। ঘটনা প্রবাহের কারণে সেই জননন্দিত ব্যক্তিটির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। যেমনটি ঘটেছে রাহুল চৌধুরীর ক্ষেত্রে। অনেক সময় পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে পুলিশের সাহায্যও নিয়ে থাকে বিদেশে।

কিন্তু রাহুল চৌধুরী তেমন রূঢ় নন। তিনি বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন। তার সহধর্মিনীকেও সচেতন হতে হবে। মনোচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শই উপযুক্ত ব্যবস্থা। রাহুল সঠিক সাজেশনই দিয়েছেন শিরিনকে। মনে রাখতে হবে, একটি মেয়ের এমন অমূলক বিশ্বাস, তার অনেক অপ্রাপ্তি এবং শূন্যতায় এক ধরনের সন্তুষ্টি জাগিয়ে রাখে।

চিকিৎসা বেশ দুরূহ। রোগিনীকে চিকিৎসার জন্য রাজি করানোই কঠিন কাজ। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যা সে ভাবছে তা সত্য। যুক্তি দিয়ে সেই সত্যকে খণ্ডন করা যায় না। তাই চিকিৎসার ইস্যুটি সে মেনে নিতে চাইবে না। মনোচিকিৎসকদের খুব কৌশলী হতে হয় এসব ক্ষেত্রে। কৌশলের সঙ্গেই প্রয়োজনীয় মেডিকেশন এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা চালাতে হয়। ফলো আপ করতে হয়। তবে পারিবারিক সাপোর্ট ও সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মনের সন্দেহ
প্যাথলজিক্যাল জেলাসি ঃ ওথেলো সিনড্রম

কেসস্টাডি ঃ

বাসার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রিকশাটি।

রিকশা থেকে নেমে আসছে ববি। লাল শাড়ি পড়েছে। কপালে লাল টিপ। হাতে একটি পলিথিনের ব্যাগ। দারুন লাগছে ওকে।

গেইটের ভেতর ঢোকার সময় ওর চোখ যায় বাড়ির ছাদের ওপর। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে রাহুল, ওর স্বামী। শৈন দৃষ্টিতে যেন পর্যবেক্ষণ করছে ববিকে।

বাসাটি যেন নরকে পরিণত হয়েছে। পদে পদে রাহুল তাকে সন্দেহ করা শুরু করেছে, দিনে দিনে বাড়ছে সন্দেহের তীব্রতা। বিয়ে হয়েছে মাত্র দু'বছর। এখনো সন্তান হয়নি ওদের। ভালোবাসার বন্ধন গড়ে ওঠেনি রাহুলের ভেতর। অদৃশ্য আঁধার যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে, ঘিরে ফেলছে ববির জীবন।

ববি এখনো হেরে যায়নি। চেষ্টা করে রাহুলের অমূলক সন্দেহ কাটাতে। পারছে না। নিজের জীবনও সে গুটিয়ে নেয়নি। স্বাভাবিক থাকারই আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাহিরে বাহিরে শক্ত থাকলেও ভেতরটি যেন ধসে যাচ্ছে।

প্রায় রেগে থাকে রাহুল। কথাবার্তায় বিরক্তি ঝরে পড়ে। মাঝেমাঝে আরোপিত অযাচিত কষ্ট যেন তাকে চেপে ধরে, আতংকগ্রস্ত থাকে, একেবারেই যেন দিশেহারা হয়ে যায়।

রুমে এসে খাটের ওপর পলিথিনের ব্যাগটি ছুঁড়ে দেয় ববি। ফ্যান অন করে। বেডরুমের রকিং চেয়ারে দেহটি ছেড়ে দেয়। দোল খেতে থাকে। রিলাক্স হওয়ার জন্য বড় করে প্রশ্বাস টেনে নেয়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথাটি এক পাশে এলিয়ে দেয়।

এমন সময় রুমে এসে ঢোকে রাহুল।

ববিকে দেখে। ঘাটের ওপর পলিথিন ব্যাগটি দেখে। এতো প্রশান্তি কেন ববির ভেতর? প্রিয় কারুর সঙ্গে কি তবে ডেটিং সেরে এসেছে? সেই কি কোনো গীফট দিয়েছে? কি আছে ওতে?

ঝড়ের মতোই যেন একটার পর একটা সন্দেহজনক প্রশ্ন জেগে উঠছে রাহুলের মাথায়। সন্দেহ নিয়েই সে আচ্ছন্ন থাকে প্রায়ই। এই নেতিবাচক আচ্ছন্নতার ঘোরেই মনে হতে থাকে, নিশ্চয় ববি ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে চারদিকে। যেকোন মুহূর্তে সেই জালে জড়িয়ে ফেলবে তাকে। খাওয়ার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, এমন ধারণাও আজকাল বদ্ধমূল হয়েছে। তাকে মেরে ফেলতে পারলেই যেন ববির শান্তি, তখনই যেন সে সুযোগ পাবে অজানা প্রেমিকের গলায় জড়িয়ে থাকতে।

ধীরে ধীরে খাটের দিকে এগিয়ে যায় রাহুল। পলিথিনের ব্যাগটি ঘেটে দেখে। নিত্য ব্যবহার্য ঘরোয়া কাজের অতি দরকারি সামগ্রি ছাড়া কিছুই পেলো না সে। তবুও মন তার শান্ত হয়নি। সন্দেহের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। এসব নিশ্চয় কৌশল। গোপন কাজ ঢাকার জন্যই নিশ্চয় ববি কৌশলী হয়েছে। নিশ্চয় সে কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এইমাত্র বিছানার কাজ সেরে এসেছে। প্যাথলজিক্যাল সন্দেহটি ক্রমাগত ঘনীভূত হতে থাকে এভাবে।

'এতো দেরি করে ফিরলে কেন?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চায় রাহুল।

'ঠিক সময়েই তো এলাম। দেরি হলো কোথায়?' বিরক্তি নিয়েই জবাব দেয় ববি।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কেন শপিং -এ গিয়েছিলাম। তোমাকে তো বলেই গেছি।'

'সঙ্গে কে ছিল?'

'কেউ না। একাই গিয়েছি।' জোরালোই শোনালো ববির স্বর।

'চোরের বড়ো গলা। নিশ্চয় কেউ ছিল তোমার সঙ্গে।' রাহুল বললো।

'মুখ সামলে কথা বলো।' প্রায় চিৎকার দিয়ে ওঠলো ববি।

তীক্ষ্ণচোখে ববিকে দেখে রাহুল। এক সময় রুম থেকে বেরিয়ে আসে। তার বিশ্বাস হতে থাকে নিশ্চয় কারুর সঙ্গে দৈহিক মিলন সেরে এসেছে, এজন্যই এতো তেজ। নিশ্চয় সে রোগের জীবাণু নিয়ে এসেছে। নিশ্চয় তার ভেতর রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে ছাড়বে এই মেয়ে। যে কোনোভাবে হোক ববি নিশ্চয় প্লান করেছে, নিশ্চয় মেয়েটি তার সেক্সুয়াল ক্ষমতা বিনাশ করে দেবে।

ব্যাখ্যা ঃ রোগের পর্যালোচনা

রাহুল প্যাথলজিক্যাল জেলাসিতে আক্রান্ত। এর আর এক নাম ওথেলো সিনড্রম। এটি এক ধরনের ডিল্যুশনাল ডিসওর্ডার। এমন রোগে আক্রান্ত হলে দাম্পত্য সম্পর্ক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। বিষময় হয়ে ওঠে পারিবারিক আবাহ।

পুরুষেরা মেয়েদের তুলনায় বেশি ভুগে থাকে। মহিলা ও পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার আনুপাতিক হার (১ঃ ৩.৭৬)।

রাহুলের সন্দেহটি ঘনিভূত বিশ্বাসে পরিণত হলেও এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই, কোনো গ্রাউন্ডও নেই।

যদি এমন আভাস পাওয়া যেতো যে ববি সত্যি সত্যি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে, তাহলে এ অবস্থাকে আর প্যাথলজিক্যাল জেলাসি বলা যাবে না। এক্ষেত্রে, মজার ব্যাপার হলো রোগী জানেই না যে, কে সেই কথিত প্রেমিক পুরুষ। দ্ব্যর্থহীনভাবে সেই পুরুষটিকে খুঁজে বের করার তাড়নাও তার ভেতর কাজ করে না। তবে রোগী সবসময় পার্টনারের পেছনে স্পাইগীরি করতে পারে, এমন কি বেতনভুক্ত কাউকে লাগিয়েও রাখতে পারে গতিবিধি জানার জন্য। রোগী মূলত অবৈধ সম্পর্কের প্রমাণ খুঁজে বেড়ায় অনবরত। সঙ্গীর/সঙ্গিনীর ডায়েরি ঘেটে দেখে গোপনে, কৌশলে চিঠিপত্র এলে পড়ে নেয়। বিছানা পত্র কিংবা অন্তঃবাসও অনেক সময় সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে দেখে, কোনো রকম যৌন সম্পর্কের আলামত বের করাই এ ধরনের আচরণের মূল উদ্দেশ্য। এ ধরনের রোগীরা অনবরত পার্টনারকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জীবন বিষিয়ে তোলে। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়, মারাত্মক পরিস্থিতি এভাবেই হানা দেয়, দাম্পত্য সম্পর্ক বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে অনেক সময় পার্টনারকে বাধ্য করা হয়, উত্তেজিত করে তোলা হয়। নিরন্তর প্রশ্নবানে বিদ্ধ হতে হতে পার্টনার অনেক সময় মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে, নিষ্কৃতি পেতে চায়। এমনটি ঘটলে রোগীর জেলাসি কখনো কমবে না, বরঞ্চ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আরো বেশি জটিলতর হতে থাকে। সন্দেহের দাবানল আরো বেশি দাপিয়ে ওঠে রোগীর ভেতর।

কেবলমাত্র এ ধরনের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের শেকড় প্রোথিত হলে, অন্য কোনো মানসিক রোগের কারণে অমূলক বিশ্বাসটি না ঘটে থাকলে, ডিল্যুশনাল ডিসওর্ডারই ডায়াগনোসিস করা হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্যাথলজিক্যাল জেলাসি কয়েকটি প্রাথমিক রোগের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকতে পারে। এ ধরনের রোগীদের ১৭-৪৪% এর সঙ্গে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া, ৩-১৬% এর সঙ্গে ডিপ্রেসিভ ডিসওর্ডার, ৩৮-৫৭% এর সঙ্গে নিউরোসিস এবং পার্সোনালিটি ডিসওর্ডার, ৫-৭% এর সঙ্গে এলকোহলিজম এবং ৬-২০% ক্ষেত্রে অর্গানিক ডিসওর্ডার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ভায়োলেন্সের ঝুঁকি ঃ প্যাথলজিক্যাল জেলাসির কারণে ভয়াবহ সহিংসতা ঘটে যেতে পারে। বৃটেনে ব্রডমুর হাসপাতালে ভর্তিরত ঘাতক রোগীদের (homicidal patients) ওপর পরিচালিত এক গবেষণা রিপোর্টে ডাঃ মোয়াট দেখিয়েছেন, এদের মধ্যে ১২% মহিলা এবং ১৫% পুরুষ প্যাথলজিক্যাল জেলাসিতে আক্রান্ত ছিল। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, জেলাস রোগী কর্তৃক শারীরিক জখমের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এমনও দেখা গেছে, ক্রমাগত তীব্র সন্দেহের জ্বালা সইতে না পেরে অনেক নিরাপরাধ পার্টনার আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে কিংবা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

রোগীর মূল্যায়ন ঃ আগাগোড়াই রোগীকে বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। প্রথমে দেখতে হবে পার্টনারকে। পার্টনারের ইনটারভিউর পরই রোগীকে মূল্যায়ন করতে হবে। সঙ্গিই জেলাস রোগীর অনুপুঙ্খ তথ্য জানাতে পারবে। আলাদাভাবে অনেক সময় প্রকৃত সত্য রোগীর ভেতর থেকে বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কৌশলের সঙ্গে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে কতোটুকু অমূলক বিশ্বাস রোগী ধারণ করে, কী পরিমাণ ক্রোধ বা রাগ রোগী বহন করে বেড়াচ্ছে। হিংসাত্মক বা প্রতিশোধপরায়ন মনোবৃত্তি রোগীর ভেতর ওৎ পেতে আছে কিনা খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে সতর্কতার সঙ্গে।

কী কী করণে রোগী উম্মত্ত উত্তেজনায় ফেটে পড়ে কিংবা সঙ্গীকে দায়ী করার মূল কারণ কোথায় প্রথিত, কেন সে পাল্টাপাল্টি প্রশ্নবানে সঙ্গীকে বিপর্যস্ত করে তোলে, সবকিছুই তলিয়ে দেখতে হবে।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গি কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, রোগী কীভাবে সেই প্রতিক্রিয়ার জবাব দেয়, বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তলিয়ে দেখতে হবে। ইতিমধ্যে কোনো সহিংসতা ঘটে থাকলে সেটির ভয়াবহতাও নিরুপণ করতে হবে। এ ধরনের তথ্যানুসন্ধানের পাশাপাশি বিবাহিত এবং সেক্সুয়াল জীবন-যাপনের ইতিহাসও জেনে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ প্যাথলজিক্যাল জেলাস রোগীদের চিকিৎসা করা বেশ কঠিন একটি ইস্যু। কারণ রোগী মনেই করে না যে, কোন্ রোগ ধারণ করে সে। ফলে চিকিৎসার যে-কোনো উদ্যোগই তার কাছে অনধিকারচর্চা ও অন্যায় আচরণ বলে মনে হতে থাকবে। এ কারণেই ওষুধ খেতে চাইবে না রোগী, চিকিৎসা সেবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গগুলোও অবহেলা করবে সে। চিকিৎসার ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

❑ যদি উপসর্গের আড়ালে সিজোফ্রেনিয়া বা মুড ডিসওর্ডার থাকে, সেটিই প্রথমে চিকিৎসা করতে হবে।

❑ যাদের আত্মবিশ্বাস কম কিংবা ব্যক্তিত্বের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে ডিল্যুশনাল ডিসওর্ডার বা প্যাথলজিক্যাল জেলাজিটি 'ওভার ভেল্যুড আইড়িয়ার' সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা যাচাই করে দেখতে হবে।

❑ যদি জেলাসিটি প্রকৃতই দৃঢ়ভাবে অমূলক বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠে তবে এন্টিসাইকোটিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে (মুনরো '৮৪)।

❑ 'ওভার ভেল্যুড আইডিয়া'ই যদি জেলাসির মূল স্তম্ভ হিসেবে শনাক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটোনিন বাড়ানোর ওষুধ যেমন ফ্লুওক্সিটিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে (ল্যান '৯০)।

❑ যদি প্যাথলজিক্যাল জেলাসির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে ডিপ্রেসিভ ডিসওর্ডার সম্পর্কিত না থাকে তবে রোগটি প্রায়ই জটিল থাকে, ক্রমান্বয়ে অবস্থার অবনতি হয়। এসব ক্ষেত্রে এন্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ দিয়ে রোগীকে সহযোগিতা করা যায়।

❑ **সাইকোথেরোপি ঃ** নিউরোটিক পার্সোনালিটি ডিসওর্ডারের ক্ষেত্রে রোগীকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। লক্ষ্য হলো, রোগী এবং সঙ্গি উভয়েরই টেনশন কমিয়ে আনা।

❑ **কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ঃ** এটির মাধ্যমে রোগীকে ভ্রান্ত বিশ্বাসটির অতলে কী ধারণা রয়েছে তা শনাক্ত করার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং সেই জেলাস চিন্তাগুলো চ্যালেঞ্জ করা হয়। ফলে রোগীর ভেতর যে নেতিবাচক ধারণা জট পাকাতে থাকে সেটির গিঁট শিথিল হয়ে আস, ইতিবাচক ধারণা জাগতে থাকে, অবস্থার উন্নতি হয় (বিসেহ '৮৯)।

❑ **আচরণগত চিকিৎসা সেবা ঃ** এ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সঙ্গিকে এমন ধরনের আচরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় যা রোগীর জেলাসির অগ্নুৎপাতে পানি ঢেলে দিতে পারে, শিতল করতে পারে রোগীকে (কোব ও মার্কস '৭৯)।

এ ধরনের আচরণের মধ্যে আছে ক্ষেত্র বিশেষে 'কাউন্টার এগ্রেশন' দেখানো, বিতর্কে জড়িয়ে না পড়া বা বিতর্ক পরিহার করা ইত্যাদি।

❑ **কখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে?**

যদি বহিঃর্বিভাগের চিকিৎসায় রোগীর উন্নতি না হয়, যদি ভায়োলেন্সের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, তবেই রোগীকে ভর্তি করানো উচিত।

❑ **সতর্কতা ঃ** পার্টনারকে ভায়োলেন্সের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে, সাবধান থাকার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে যেন ভুল না হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেপারশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার দেখা গেছে, নতুন সম্পর্কে প্রবেশ করলেও একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

রোগের ফলাফল ঃ ল্যাংগফিল্ড নামক একজন গবেষক ২৭ জন রোগীকে ১৭ বৎসর ফলোআফ করেছেন। ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে স্থায়ী জেলাসি রয়ে গেছে কিংবা পূনরাবৃত্তি ঘটেছে। ফলাফল খারাপ হলেও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। মানসিক চিকিৎসা সেবার মান সবদিক থেকেই সমৃদ্ধ হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তোরণের পথ সহজতর হচ্ছে সারা বিশ্বে।

মনের শক্তি
জয় ঃ ভালোবাসার জয়

বিছানায় এলোমেলো শুয়ে আছে নিশি।

চোখ খোলা। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চাউনি অসাড়, স্তব্ধ। অটল অনড় অভিব্যক্তি ফুটে আছে মুখের কোমল পেশীতে। কঠিন বাস্তবতা তাকে ঠেলে দিচ্ছে জটিলতর সমস্যার মুখোমুখি।

মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। শো শো আওয়াজ হচ্ছে। নিশির মনে হচ্ছে, এতো দিনে যা পেয়েছে, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা, ফ্যানের চলমান ঘূর্ণনের সঙ্গে মিশে গেছে, ঘুরছে সব।

ঘুরছে বর্তমান, ঘুরছে ভবিষ্যৎ। কঠিন শৃঙ্খলে জড়িয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার তীব্র শিহরণ। তীব্র জাগরণ।

খুট করে দরজায় শব্দ হয়। দরজা খুলে গেছে।

রুমে ঢুকেছে নিশির বাবা সাদত সাহেব, সঙ্গে আছে মা জেসমিন আরা। দু'জনকে যেন চিনতে পারছে না নিশি। অপরিচিত কারা যেন ঢুকেছে তার রুমে। দু'জনের চোখে ভয়াবহ ক্রোধ, চোখ থেকে যেন অগ্নিস্ফূরণ ঘটছে।

এখনো সময় আছে নিশি, সিদ্ধান্ত পাল্টাও। তীব্র ক্রোধ চাপিয়ে সহজভাবে বললেন সাদত সাহেব।

নিশির মুখে জবাব নেই।

একবার দৃষ্টি স্থাপন করে তার বাবার চোখে। শীতলভাবে তাকিয়ে থাকে কতোক্ষণ। চোখ সরিয়ে নেয়, পাশের দেয়ালের দিকে তাকায়, শাদা দেয়াল।

নিশির মনে হলো লোকটি তার বাবা নয়, একটা দস্যু যেন তাকে আটকে ফেলেছে চার দেয়ালের ভেতর। চারদিক থেকে দেয়ালগুলো যেন হিংস্র গতিতে ছুটে আসছে, পিষে মেরে ফেলবে কি তাকে!

মেরে ফেলুক। নিশি কথা বলবে না।

মমতাহীন বাবার কাছে তার চাওয়ার কিছু নেই।

শোনো নিশি, অরভিনের মতো ছেলে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ঢুকেছে, ব্রাইট ফিউচার। কিছুতেই এ ছেলেকে হাতছাড়া করতে চাই না। আমি তোমার মঙ্গল চাই। সাদত সাহেব নরম হয়ে মেয়েকে বোঝাতে চাইছেন।

নিশির ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফোটে। হাসিতে মিশে আছে তাচ্ছিল্য। কোনো জবাব দেয় না সে।

গত দু'দিন ধরে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মুহুর্মুহুঃ চলছে বাক্যবাণ, শরীরেও হাত পড়েছে বাবার, মার।

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে সে কেবল বাবা মার আদরের সঙ্গে পরিচিত ছিল, কোনো আবদার অপূর্ণ রাখেনি তারা, গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, রাগ করে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি।

অথচ সে বাবারই কি ভয়াবহ রূপ!

স্নেহময়ী মায়ের কি ভয়ানক মূর্তি!

নিজেদের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে!

তার নিজের ইচ্ছের কি কোনো দাম নেই! কোনো মূল্য নেই!

জেসমিন আরা পাশে এসে বসলেন। কণ্ঠ নরম করেই বললেন, ভেবে দেখো নিশি, তোমার বাবার প্রশ্নের জবাব দাও, আজই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

নিশি নিশ্চুপ। কেবল ওর দেহই পড়ে আছে খাটে, মন যেন নেই দেহের ভেতর।

মন চলে গেছে হৃদের কাছে। হৃদ ছাড়া সে বাঁচবে কিভাবে!

জেসমিন আরা রেগে উঠছেন। নিশির চুলের গোছা মুঠি করে ধরেন, তীব্র ঝাঁকুনি দেন, দিয়েই বলতে থাকেন, কথা বলো নিশি, উত্তর দাও।

নিশি শাদা দেয়ালের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে।

তার মুখে হাসি ফোটে। হাসি স্পষ্টতর হয়।

হৃদ যেন দেয়াল ফুটো করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি মায়াবি মুখ!

এ মুখটি ছাড়া তার সব কিছু অচল। জীবন-সংসার, মা-বাবা, ভাইবোন, স্নেহ-মমতা, সব কিছু মিথ্যা।

ঠোঁট কেঁপে ওঠে নিশির। ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করে, হৃদ! হৃদ! আমাকে নিয়ে যাও। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে হৃদ।

সাদত সাহেব চিৎকার দিয়ে ওঠেন, তোমাকে সিদ্ধান্ত দিতেই হবে নিশি। আজই। হয় তুমি অরভিনকে বিয়ে করার জন্য রাজি হবে, নইলে হৃদের জন্য এ বাড়ি ছাড়বে। এই-ই আমার শেষ কথা।

গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সাদত সাহেব, ফিরে এলেন আবার। জেসমিন আরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সন্ধ্যার মধ্যে যদি দেখি মেয়ে বিয়েতে রাজি হয়নি এ বাড়িতেই আছে, তাহলে আমি বাড়ি ছাড়া হবো, নিরুদ্দেশ হবো।

জেসমিন আরা স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন মেয়েকে বোঝাতে।

অরভিনের মতো ছেলেকে হাত ছাড়া করা চলে না। হৃদের তুলনায় অরভিন হাজার গুণে উত্তম। হৃদ এখনো ছাত্র, ভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

তাকে দুর্বল হলে চলবে না। কঠিন হতে হবে। কঠিন না হলে মেয়েকে বাগে আনা যাবে না। মেয়ের মঙ্গল চিন্তায় কিছুটা বেসামাল তিনি, ভুলে গেছেন আদরের মেয়েটির মনের মূল্য পদদলিত করছেন।

তুমি কি হৃদকেই বিয়ে করবে? থমথমে গলায় জিজ্ঞাসা করেন জেসমিন আরা।

হৃদ শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে নিশির বুকের কষ্ট উবে যায়। দেহের কষ্ট মিলিয়ে যায়। ঘুরে মায়ের দিকে তাকায়। শরীর মোচড় দিয়ে উঠে বসে। মাথা দুলিয়ে উচ্চারণ করে, হ্যাঁ মা। হ্যাঁ।

তোমার বাবার কথা শোনোনি? তার কথা ভাববে না?

মা, আমি বাবাকে ভালোবাসি, তোমাকেও। ছোটবোন লুনাকেও ভালোবাসি, হৃদকেও।

হৃদকেও! আমাদের সঙ্গে হৃদের তুলনা করছো!

তুলনা নয় মা। সবার ভালোবাসা এক সঙ্গে পেতে চাই আমি। হৃদকে ছাড়া সব কিছু আমার কাছে অর্থহীন।

নিশি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। যেন বেপরোয়া এক নিশিতে বদলে যাচ্ছে।

নিশির মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন জেসমিন আরা। মেয়ের আকুতি তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তিটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মেয়ের মুখের লাবণ্য এ ক'দিনে কেমন ক্ষয়ে গেছে, চোখের নিচে কালি জমেছে। একি দশা তার আদরের নিশির!

স্বামীর কথাও মনে পড়ছে।

স্বামীর সম্মান বরাবরই তিনি রক্ষা করে এসেছেন। হৃদয়বান এই পুরুষটির ভেতর একরোখা এক ভয়াবহ রাগ জমে আছে। তিনি অরভিনের বাবার বন্ধু। কথা বলে রেখেছেন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। তার পিছু হটার সুযোগ নেই। কিছুতেই স্বামীকে ছোট করা চলে না। তাছাড়া অরভিন তারও খুব পছন্দের ছেলে।

মনে মনে পরিকল্পনা করেন তিনি। বুদ্ধি আঁটেন কিভাবে হৃদের জন্য নিশির আসক্তি মুছে ফেলা যায়।

গলার স্বর একটু নরম করে বললেন, তাহলে হৃদকেই তুমি বিয়ে করবে?

হ্যাঁ। নিশি মায়ের কথা শুনে নড়ে ওঠে, উঠে দাঁড়ায়।

ঠিক আছে। আমি এক্ষুণিই হৃদকে টেলিফোন করবো। সে যদি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, নিয়ে যাক।

মা, ওর তো পরীক্ষা সামনে। পাশ করুক। পাশ করেই.....

না। থমথমে গলায় জেসমিন আরা নিশির কণ্ঠ থামিয়ে দেন।

এক্ষুণি তাকে বিয়ের জন্য রাজি হতে হবে।

হৃদের ফাইনাল পরীক্ষার সাত দিন বাকি। হল থেকে চলে এসেছে। ক'দিন ধরে বাসায় আছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। পড়ছে সে। ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। নিশির মিষ্টি মুখটি ভেতরে ভেতরে অনুপ্রাণিত করছে তাকে। এই প্রেরণার কোনো ব্যাখ্যা চলে না।

ভাইয়া, তোমার টেলিফোন। ছোট বোন দিবার ডাক শুনে ঘুরে তাকায় হৃদ। দ্রুত ছুটে যায় টেলিফোন সেটের কাছে।

নিশির টেলিফোন কি?

তাড়াহুড়ো করে টেলিফোন তোলে।

হ্যালো, হৃদ বলছি।

শোনো ছেলে, আমি নিশির মা।

একটা ঝাঁঝালো বোমা যেন এইমাত্র বিস্ফোরণ হলো কানের ভেতর। ধকল সামলে কেবল উচ্চারণ করলো হৃদ, জ্বি!

আমি যা বলছি কেবল মনোযোগ দিয়ে শুনবে। ভেবে উত্তর দেবে।

বলুন। ঢোক গিলে কোনোরকম বললো হৃদ। গলা যেন মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে চড়চড়া হয়ে গেছে।

তুমি কি নিশিকে বিয়ে করতে চাও?

জ্বী?

শুনতে পাচ্ছো না? ধমকে ওঠেন জেসমিন আরা।

হৃদের ভেতর ত্বরিত গতিতে যেন অন্য এক দুর্দমনীয় হৃদ জেগে ওঠলো। দুঃসাহসী এই হৃদ যে-কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে। হৃদের বুকের ভেতর জমে জমে পাহাড় প্রমাণ

হয়েছে নিশির ভালোবাসা। তীব্র ভালোবাসার সুউচ্চ এই আসন থেকে নিশির জন্য সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কারো সাধ্য নেই ঠেকিয়ে রাখার। পরীক্ষার কথা ভুলে যায় হৃদ। স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করে, হ্যাঁ খালাম্মা। নিশিকে আমিই বিয়ে করবো।

একটু হোঁচট খেলেন জেসমিন আরা। নিয়ন্ত্রণ করলেন নিজেকে। তার প্ল্যান ঠিক মতো এগুচ্ছে না। স্কাড ছোড়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

তাহলে এক্ষুণি চলে এসো। নিশিকে নিয়ে যাও। ঠাস করে রিসিভার রাখার শব্দ পেলো হৃদ।

নিশি নিশ্চয়ই বিপদে পড়ছে।

হৃদের সব চিন্তাচেতনা জট পাকিয়ে গেল। কিছুই ভাবার সময় নেই আর। দ্রুত বের হয় বাসা থেকে। রিকশা নেয়। সরাসরি এসে হাজির হয় নিশিদের বাসায়। কলিং বেল টেপে। নিথর নিস্তব্ধ তার সকল অভিব্যক্তি। তেজোদীপ্ত যুবকের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে।

দরজা খুলেছে সীমা, নিশির ছোট বোন। খুলেই আঁতকে ওঠে।

হৃদ অপেক্ষা করে না আর। ঢুকে যায় ড্রয়িং রুমে।

একটু পরে জেসমিন আরা এসে হাজির হন। চোখে-মুখে উন্মত্ত ক্রোধ জেগে আছে ওনার।

নিশিকে নিয়ে যেতে চাও তুমি?

জ্বি। হৃদের গলায় ভরাট তেজ জেগে ওঠে।

ভেতরের রুমে আছে, যাও। এক্ষুণি তাকে নিয়ে চলে যাও। কখনো এ বাড়িমুখো হবে না দু'জনে।

নিশির রুমে ঢুকেই হৃদ যেন জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে।

উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে নিশি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার দমকে পিঠ তার ওঠানামা করছে কেবল।

পাশে বসে হৃদ। হাত রাখে মাথায়।

চোখ ঘুরিয়ে নিশি দেখে হৃদকে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আতঙ্কে একটু পিছু হটে বসে।

চোখ পাকিয়ে বিস্ময় নিয়ে বলে, তুমি এখানে!

তোমাকে নিতে এসেছি। স্বরে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। ভালোবাসার নির্ভরতা।

জেসমিন আরা এ সময় রুমে ঢুকলেন।

কঠিনভাবে বললেন, যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও দু'জনে।

নিশি এবার শক্ত হয়, উঠে দাঁড়ায়। মায়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।

ভালো করে ভেবে দেখো মা। আমি এমনতরো কিছু চাই না। সবাইকে চাই, সবাইকে নিয়ে সুখী হতে চাই।

ভেবে দেখার কিছু নেই। হৃদ এসেছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চলে যাও। আমাদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। ভাবতে হলে হৃদকে ছাড়াই ভাবতে হবে।

হৃদ ত্বরিত এসে নিশির হাত ধরে।

নিশি যেন নির্ভরতার ছোঁয়া পেলো। বিশ্বস্ত হাতের টানে সকল যন্ত্রণা ভুলে যায়। হাঁটা শুরু করে হৃদকে নিয়ে। বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

একবার পেছন ফিরে তাকায় নিশি।

এতোদিনের চেনা বাড়িটি যেন দ্রুত ছুটে গেছে পেছনে, অনেক দূরে.....মুহূর্তের মাঝেই যেন বিরাট এক দূরত্ব জেগে উঠেছে বাড়িটির সঙ্গে। কখনো কি ঘুচবে বিস্তর ব্যবধান!

হৃদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের বাড়ি। তবুও যেন কেমন লাগছে। ছোট বোন দিবা নিশির পাশে বসা।

নিশি গুটিসুটি মেরে বসে আছে ভেতরের রুমের খাটের ওপর।

হৃদের মা রুবিনা বেগম এখনো বাসায় ফেরেনি। গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তিনি। ফেরার সময় হয়েছে। বাবার ফিরতে অনেক রাত হয়। প্রায় দশটা।

মায়ের জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে হৃদ।

একবার ভেতরে আসে। নিশির দিকে তাকায়। নিশি তাকায় হৃদের দিকে। দুজনের অনুভূতি জটিল রাস্তা অতিক্রম করছে। চার পাশে যেন ভয়াল অন্ধকার।

কলিং বেলের শব্দ হতেই ছুটে যায় হৃদ।

মা এসেছেন।

হৃদের মুখের দিকে তাকালেন তিনি, থমকে দাঁড়ান। ভ্রূ কুচকে ছেলেকে দেখেন।

কি হয়েছে হৃদ? এমন লাগছে কেন তোমাকে?

ভেতরে এসো মা। দেখো কাকে এনেছি।

ভেতরে ঢুকেই রুবিনা বেগম হোঁচট খেলেন।

কে এই মেয়ে?

দেখো মা, কাগজটি দেখো, একটি কাগজ বাড়িয়ে দেয় হৃদ।

কিসের কাগজ?

ও নিশি। ওকে বিয়ে করেছি আমি। এটি বিয়ের রেজিস্ট্রি ফর্ম। দেখো মা, পড়ে দেখো।

কি! ভয়ানক আশ্চর্য হন রুবিনা বেগম। বিশ্বাস করলেন না কথাটি। বিস্ফারিত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। কাগজটি নিয়ে পড়লেন, পড়েই দম করে বসে পড়েন খাটে। মাথা ভোঁ করে ঘুরে ওঠে, কপাল বেয়ে দরদর করে নেমে আসে ঘাম।

অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন।

পরীক্ষায় আর সাত দিন বাকি, এ সময় এ কাজটি করতে পারলো হৃদ!

দুর্বিনীতি এক ক্রোধ জেগে উঠতে চাইলো নিজের ভেতর, ক্রোধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হতাশা। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন রুবিনা বেগম। তাকে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। হাল ছাড়লেই বিপদ, সন্তানের বিপদ। ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কি করা যায়!

এই অপরিপক্ক ইমোশনাল কাজটির জন্য কি ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেবেন?

না, তা হয় না। তাহলে ছেলে গোল্লায় যাবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। অর্থ কষ্টে পড়বে। তারপর একদিন মেয়েটির মোহ কেটে যাবে। ততো দিন সব হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে হৃদ।

ভালোবাসার তীব্র টানে পরাজিত হলেন তিনি।

ছেলের মঙ্গলের জন্য তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে।

আসলেই কি কোনো অপরাধ করেছে হৃদ?

নাকি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেপরোয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তার ছেলে কোনো অন্যায় করতে পারে না।

স্নেহের স্রোতধারায় তিনি টলে ওঠেন। নিশির মুখের দিকে তাকালেন।

কি মায়াবতী!

কি রূপবতী!

এমন মেয়েই তো দরকার ছেলের বউ হিসেবে।

নিশির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

নিশি ওঠে, পা ছুঁয়ে সালাম করে।

রুবিনা বেগম হাত বাড়িয়ে বুকের সঙ্গে টেনে নিলেন নিশিকে।

মমতাময়ী হাতের ছোঁয়ায় হু হু করে কান্না জেগে ওঠে নিশির ভেতর থেকে।

এই কান্নায় তার গভীরতম সাম্রাজ্যের সঞ্চিত ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ, বিচ্ছুরণ।

নিশি রুবিনা বেগমের বুকের সঙ্গে লেগে থাকে। তার কানে যেন ভালোবাসার শব্দ মুহুর্মুহুঃ তোলপাড় করছে।

এ কেবল রুবিনা বেগমের ভালোবাসা নয়, রক্তধারায় ছুটে আসা হৃদের ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণও মিশে আছে এতে।

এ ভালোবাসার কোনো পরাজয় নেই। ক্ষয় নেই।

হৃদ খুশিতে উদ্বাহু নেচে ওঠে।

ছুটে যায় তার পড়ার রুমে। পড়তে বসেছে। তাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।

নিশির প্রলয়ঙ্করী ভালোবাসার ঝড় যেন ঝেড়ে পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে ব্রেইনের কোটি কোটি স্নায়ু কোষ। যা পড়ছে ত্বরিত ঢুকে যাচ্ছে মগজের ভেতর।

জয় তার হবেই।

এ জয় ভালোবাসার জয়। নিশির তীব্র ভালোবাসার মশাল যেন জ্বলে উঠেছে। পুরো রুম আলোকিত, উজ্জ্বল।

এ আলোয় দেখছে হৃদ, নিশির বিজয় দেখছে।

ব্যাখ্যা

একটি কেস স্টাডির অংশবিশেষ গল্পাকারে পরিবেশন করা হয়েছে।

নিশির বাবা সাদত সাহেব এবং মা জেসমিন আরার নেগেটিভ ইমোশনের কারণে নিশির মতো লাবণ্যময়ী, রূপবতী একটি মেয়ের জীবন কীভাবে বিপদসংকুল পথে এগিয়ে গেছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মুল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে।

নিশির মা অবশ্যই নিশির মঙ্গল চিন্তায় এমন একটি নেতিবাচক প্লাটফর্মে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে তাদের একরোখা আবেগীয় সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পেয়েছে। বাস্তবতার তাগিদ অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পরিচ্ছন্ন চিন্তার পথ তাদের রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই সঠিক সময়ে সঠিক চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন তারা।

কিন্তু নিশি এবং হৃদের ভেতর কাজ করেছে দুর্দমনীয় ইতিবাচক ইমোশন, ভালোবাসা। এই আবেগীয় ইস্যুটি যুক্ত হয়েছে তাদের মোটিভেশনের সঙ্গে। ফলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে তারা এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। আবেগ এবং মোটিভেশনের মিশ্রধারার কারণে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হয়নি, জয়ের মালা তাদের গলায় চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে হৃদের মায়ের ভূমিকাটি অত্যন্ত গঠনমূলক। নেতিবাচক আবেগের ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে যাননি তিনি। বরং ইতিবাচক পথে এগিয়ে গেছেন।

বাস্তবতার নিরিখেই চিন্তা করতে পেরেছেন। ওই মুহূর্তের সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিয়েছেন তিনি।

পুরো গল্পে নেতিবাচক ও ইতিবাচক ইমোশন, মোটিভেশন এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তনের মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গগুলোই এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

মনের চাওয়া

ভালোবাসা ঃ লোভনীয় ভালোবাসা

❑ লোভনীয় একটি শব্দ 'ভালোবাসা'।

এর স্বাদ পেলেও কাঁদে, না পেলেও কাঁদে মানুষ।

কখনো অতি সুখের পরশ দেয় ভালোবাসা। কখনো বা দোমড়ানো মোচড়ানো মোড়কে লুকিয়ে রাখে কষ্টের অব্যক্ত ছোবল।

ভালোবাসা তাই কষ্ট ও সুখের মিশ্রণে রহস্যতত্ত্বে ভরা এক জটিল অথচ আকাঙ্খিত উপাদান।

❑ আভিধানিক অর্থে ভালোবাসা বলতে বোঝায় প্রণয়যুক্ত বা প্রেমযুক্ত হওয়া, প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া, পছন্দ করা, আসক্ত বা আকৃষ্ট হওয়া, শ্রদ্ধা ভক্তি এবং স্নেহ করা।

প্রণয় শব্দটির অর্থ অনুরাগ সৌহার্দ্য কিংবা বন্ধুত্ব। বয়সের ভিন্ন ভিন্ন ধাপে এই অনুভূতিগুলো পরিবেশ অনুযায়ী নানাভাবে মানুষকে আক্রান্ত করে।

❑ কৈশোরে অনুরাগের একটা স্তর আছে।

কিশোরের প্রতি কিশোরের কিংবা কিশোরীর প্রতি কিশোরীর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আকর্ষণ জীবনের স্বাভাবিক ধারায় লক্ষণীয়।

একজন আর একজনকে তীব্রভাবে অনুভব করে। কথায় কথায় মান-অভিমান করে, ঝগড়াঝাটি করে, কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়, আবার সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের জন্য ব্যাকুল থাকে। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পাত্র থেকে পাত্রে সঞ্চারিত হয়।

এ বয়স থেকেই সমকামিতার প্রভাবে কারো কারো ভেতর একটি অস্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা দেয়।

বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে দেখেছেন যে, মায়ের শরীর থেকে যে X ক্রোমোজম সন্তানের দেহে জন্মগতভাবে প্রবেশ করে তার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'গে জিন' নামক এক অস্বাভাবিক জিন পাওয়া গেছে। এই 'গে জিনই' সমকামিতা কিংবা ওই ধরনের আসক্তির জন্য দায়ী।

কিশোর-কিশোরী ভালো লাগার কারণেই একে অন্যকে প্রাণ ভরে উপলব্ধি করে। কিন্তু কাছে যেতে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।

কাছে যেতে পারলেও একে অপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। প্রচণ্ড একটা ভালো লাগার রেশ বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে। অপ্রকাশিত থেকে যায় হয়তো বা আজীবনই।

আবার কেউ কেউ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায় সেই আসক্তির তীক্ষ্ণ অনুভূতি। অন্য কারুর সঙ্গে ভালো লাগালাগিতে জড়িয়ে পড়ে।

❑ ভালোবাসার আছে নানারূপ।

সন্তানের জন্য ভালোবাসা স্নেহ মমতা কিংবা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, ভাই বোনের জন্য অদৃশ্য আকর্ষণ 'জেনেটিক কোড' দ্বারা প্রভাবিত হয়। বার্ধক্যে বেঁচে থাকার তীব্র আকুলতা কিংবা নাতি-নাতনীদের প্রতি নির্ভরতা সব কিছুই একই আবেদন।

❑ কার জন্য কি ধরনের অনুভূতি বা ভালোবাসা পরিচালিত হবে সুশৃঙ্খলভাবে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

❑ যৌবনেও প্রণয়যুক্ত হওয়ার ভেতর রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ। স্নায়ুতন্ত্র তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত ঃ

❑ অনুভাবক অংশ (sensory portion), যেমন চোখ, কান, ত্বক, নাক ও জিহ্বা। চোখ দিয়ে নর দেখে নারীর সৌন্দর্য, ধারালো শরীর, কমনীয়তা। নারী দেখে নরের সুঠাম দেহ, ব্যক্তিত্ব। কান দিয়ে উভয়েই শোনে মিষ্টি মধুর শব্দ অথবা উত্তেজক আহ্বান। ত্বকের স্পর্শে একটা শির শির অনুভূতি জাগে উভয়ের মাঝে। শরীরের গন্ধ একে অপরকে করে সম্মোহিত।

দেখা, শোনা, গন্ধ ও স্পর্শের উপলব্ধি বা তথ্যসমূহ সরাসরি এসে জমা হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে।

❑ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system) এটি মূল অংশ। ব্রেইন এবং স্পাইনাল কর্ড নিয়ে গঠিত। এখানে জমাকৃত তথ্য এবং অনুভূতিসমূহ বিশ্লেষিত হয়। সুযোগ ও পরিবেশ অনুযায়ী করণীয় সিদ্ধান্ত স্থির হয়।

❑ গতিবিধায়ক অংশ (motor portion) এই অংশের মাধ্যমে উদ্ভূত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুতগতিতে শরীরের বিশেষ স্থানে পৌঁছে যায়।

পজিটিভ সিগনাল পেলে আসক্তি বাড়ে। কাছাকাছি থাকার, মুখোমুখি বসে থাকার ইচ্ছা জন্মে।

হাত খবর পেলে হাতের কাজ শুরু করবে, ঠোঁট খবর পেলে ঠোঁটের কাজ শুরু করবে। এ ধরনের সিগনাল নারী পুরুষকে একের ভেতর অন্যকে গেঁথে দেয়। চুম্বকীয় এই আবেদন অনেক সময় শারীরিক সম্পর্কের দিকে টেনে নেয়। তবে সব শারীরিক সম্পর্কের সঙ্গে ভালোবাসা সম্পর্কিত নয়।

এ ছাড়াও রয়েছে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম, অবচেতন অনুভূতি চিন্তাচেতনার ওপর কাজ করে। ইন্টারনাল অর্গান যেমন হার্টের কাজ এবং গ্রন্থিসমূহের হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাভাবিক মাত্রার যৌন হরমোন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রভাবিত হয়, স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের ওপর ভূমিকা রাখে।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ক'জন বিখ্যাত লেখক নিয়ে কিছু সত্য দৃশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারাবাসার কথা বলছি, শুনুন।

হুমায়ূন আহমেদ ঃ

একবার এই যশস্বী শব্দ কারিগরের সঙ্গে গেলাম কক্সবাজার। আমার বন্ধু আমিনের বাসায় তাঁর নিমন্ত্রণ। খবর গোপন রাখা হয়েছে। তবুও খবর রটে গেল। একটি উচ্ছল তরুণী খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এলো। হাতে একটি ডায়রি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে, উন্নত বক্ষ ওঠানামা করছে, হাঁপাচ্ছে সে। বিস্মিত হয়ে বড় বড় চোখ নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি তাকিয়ে আছি মেয়েটির দিকে।

মনে হচ্ছিল সে চারপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, প্রিয় লেখকের মুখের আলো স্থির হয়ে আছে তার চোখের ওপর।

মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে জড়িয়ে ধরলো তার প্রিয় মানুষটাকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেবে এক্ষুণি!

কম্পমান হাতে ডায়রিটি বাড়িয়ে দিলো অটোগ্রাফের জন্য। পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললো, আমি যদি কক্সবাজারের ডিসি হতাম তাহলে আপনার আসার সংবাদে পুরো শহরটিকে লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দিতাম।

আমার শরীর শির শির করে ওঠলো।

হুমায়ূন আহমেদও যেন তীব্র নাড়া খেলেন, চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তাকিয়েই থাকলেন কতোক্ষণ। মেয়েটিও সরাসরি তাকিয়ে আছে।

লেখক কি মেয়েটির জন্য অসম্ভব সুন্দরতম এক ভালোবাসা নিজের ভেতর অনুভব করলেন! মেয়েটি হুমায়ূন আহমেদের কাছে ঘেঁষে বসলো, বসে থাকলো কতোক্ষণ, যেন একটু পরশ নিলো প্রিয় মানুষের।

উঠে দাঁড়ালো সে। বিনয়ের সঙ্গে বললো, স্যার আপনার পা ছুঁয়ে একটু সালাম করবো।

আমার এতোক্ষণের চলমান চিন্তাধারা যেন ধারালো অস্ত্রের কোপ এসে পড়লো একটি।

লেখক উঠে দাঁড়ালেন, মেয়েটি পা ছুঁয়ে সালাম করলো।

তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এক অনাস্বাদিত শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা লাভ করে ওই মুহূর্তে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুখী তরুণী।

ইমদাদুল হক মিলন ঃ

কয়েক বছর পূর্বে চট্টগ্রামের সেন্ট্রাল প্লাজাতে 'চিরায়ত' বুক স্টলে লেখকের বইয়ের একক প্রদর্শনী হলো।

প্রিয় লেখককে দেখার জন্য, বই কেনার জন্য কৌতূহলী পাঠকের ভিড় বাড়ছে। হঠাৎ করেই দেখলাম দু'জন অনিন্দ্য সুন্দরী বুক স্টলে ঢুকলো। দু'জনের চেহারার অপূর্ব মিল। প্রথমে দু' বোনই মনে হলো তাদের। আসলে তারা হলো মা-মেয়ে। মা-ই বেশি সুন্দরী, চমৎকার ফিগার। হাতে ক্যামেরা। মেয়েটি স্মার্টলি মিলনের দিকে এগিয়ে গেল।

একটু বসি আপনার পাশে? মিলনের অনুমতি চাইলো সে।

হ্যাঁ, বসুন। মিলন কাঁচুমাচু করে জবাব দিলো।

আপনার সঙ্গে ছবি তুলবো। বলেই মেয়েটি মিলনের একদম শরীর ঘেঁষে বসলো। মিলন যেন একটু সংকুচিত হলেন।

মেয়েটির ভেতর কোনো জড়তা নেই। একবার মিলনের গলার ওপর দিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছে, একবার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির মা একের পর এক ক্যামেরার শাটার টিপে যাচ্ছে। এরপর মা-ও মিলনের পাশে বসে ছবি তুললো, মেয়ে ক্যামেরা চালালো।

একজন খ্যাতিমান লেখক মানুষের কি ঈর্ষণীয় ভালোবাসার বা আসক্তির স্বীকার হতে পারেন এই মা ও মেয়ের সুন্দরতম মনের সাবলীল ধারা না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

তসলিমা নাসরিন ঃ

শক্তিমান লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে একবার সমুদ্র পেরিয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। ফিরে আসার সময় হঠাৎ করেই বাতাসের গতি বেড়ে গেল। ঢেউ হলো এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। বোটের উভয় পাশ থেকে পানি ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

নাসরিন হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলছে, আল্লাগো! মরে যাবো নাকি! মাগো! একি! একি!

সঙ্গে ছিল একটি ছোট্ট শিশু, রিশাদ ময়ুখ। তার মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে আছে। ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার দিয়ে বলছে, আম্মু সমুদ্রকে থামতে বলো! সমুদ্রকে থামতে বলো!

বিপদে পড়লে মানুষ তার প্রিয়তম মানুষটির কথা স্মরণ করে, ছোট্ট শিশুর মতো আচরণ করে কিংবা সবচেয়ে ক্ষমতাধর নির্ভরশীল কারুর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। কোনো বিকৃতি ছাড়াই তার অবচেতন মনের চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটে।

নাসরিনের অবচেতন চিন্তাধারা থেকেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুভূতি ওই সময়ে বেরিয়ে এসেছে।

নাসরিনের যুক্তিবাদী কলম ঘোষণা করেছে, বুদ্ধি হওয়ার পর কখনো আল্লাহ নামটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেননি, তিনি নাস্তিক। বিজ্ঞানমনস্কা নাসরিন কি 'জেনেটিক কোড' অস্বীকার করছেন না!

সমুদ্রে বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছে নাস্তিক্যবাদ তার শক্তিমান কলমের ডগা থেকে নিঃসৃত শব্দমালার শৈল্পিক কারুকাজ মাত্র, অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত অনুভূতির পুরোপুরি বহিঃপ্রকাশ নয়। অতলে নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা বোধ জমাট বেঁধে আছে, সময় ও সুযোগ তার বিচ্ছুরণ ঘটাবেই।

ক্রোধের রসায়ন ঃ ক্রোধের স্কেল
ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল

কেসস্টাডি ঃ

মনের মতো সেজেছে ফারিহা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে এখন। মাঝে মাঝে বেলকনিতে আসছে। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বাড়ছে।

রিশাদ বলেছিল সাতটার মধ্যেই ফিরবে, একত্রে বের হবে। ফারিহার ছোটবোন ববির প্রথম ম্যারেজ ডে আজ।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। রিশাদের খবর নেই। একটি বারের জন্য ফোনও করেনি। বিয়ের দু'বছরের মাথায় কি সব রোমান্স শেষ হয়ে গেল?

ইতিমধ্যে দু'বার ফোন করেছে ববি।

আপু! আসছিস না কেন? সবাই তোদের জন্য বসে আছে।

মাথার মধ্যে কেবল ঘুর ঘুর করছে বাক্যটি। একই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে সে।

রাত ন'টায় ফিরেছে রিশাদ। ভুলেই গিয়েছিল সে। এসেই দেখে ফারিহা নেই, অপেক্ষা করে করে একাই চলে গেছে ববির বাসায়।

ফারিহা, ববি সমবয়সী। বান্ধবীর মতো সম্পর্ক। তাই সব ক্ষেত্রেই উভয়ের প্রতি উভয়েরই আশা অনেক বেশি। দায়িত্বও কম নয়।

এমন একটি সিস্টার ইন'লর প্রথম ম্যারেজ ডে'তে যেভাবে যে ড্রেসে যাওয়ার কথা সেটির ধারেই গেল না রিশাদ। বাহির থেকে ফিরে সেই ড্রেসেই চলে এসেছে। ফারিহার কথা ভাবতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিল যে ড্রেস চেঞ্জ করে নিতে হবে।

জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ববির স্বামী জিদনি। ঘিয়ে রঙের স্যুট পড়েছে, দূর্দান্ত লাগছে ওকে।

দূর থেকে ফারিহা দেখলো রিশাদকে। এমন একটি আসরে ড্রেসের অবস্থা দেখে ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। রাগের আগুনে যেন কেউ কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে। চোখ মুখ থেকে ছুটে আসছে অগ্নিলাভা।

রাত গভীর হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে একটি কথাও বলেনি ফারিহা।

রাতে ওপাশ ফিরে শুয়েছে। অনড় পাথর যেন পড়ে আছে বিছানায়। একবার ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে রিশাদ। আরো বেশি যেন শক্ত হয়ে গেছে, যেন রিশাদ বলে কেউ নেই, এই অস্তিত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ফারিহার।

ব্যাখ্যা ঃ

আমরা শান্তি চাই। সুখ চাই। ভালোবাসা চাই।

যথা নিয়মে কি সকল চাওয়া পূরণ হয়?

পাওয়ার অপূর্ণতার ফাঁক দিয়ে আমাদের ভেতর ঢুকে যায় রাগ, ক্রোধ।

'রাগ' জীবনেরই একটি বড় অনুষঙ্গ। এটি একটি নেগিটিভ ইমোশন। কেউ অল্পতে রেগে যায়, কেউ সহজে রাগই করে না। কেউ রেগে গিয়েও বাইরে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না, পুষে রাখে নিজের গভীরে।

মূলত বলা যায়, মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা অবদমিত রাগ আমাদের ভালো থাকার পেছনের শত্রু, মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করে। মনের শান্তি হরণ করে। এই মুহূর্তে তেমনটিই ঘটেছে ফারিহার ক্ষেত্রে।

ক্রোধের সময় কি ঘটে দেহে?

❑ ব্রেইন সিগনাল পাঠায়। ঝড়ো গতিতে নিঃস্বরণ ঘটে সক্রিয় হরমোন নর-এড্রিনালিন।

❑ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, গভীর হয়। রক্তচাপ বেড়ে যায়। চোখের মণির স্ফীতি ঘটে।

❑ দেহের অন্যান্য অংশ থেকে রক্তপ্রবাহ দ্রুত ছুটে আসে হৃদপিণ্ডে, ব্রেইন ও পেশীর দিকে।

❑ হজম ক্রিয়া থেমে যায়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়।

❑ পুরুষের মাঝে ছলকে বেড়ে ওঠে টেস্টোস্টেরণ হরমোনের মাত্রা।

❑ হাতের মুঠি বন্ধ হয়ে আসে, দাঁতে দাঁত খিচে আসে, পরিপাকতন্ত্র খামছে ধরে।

❑ মূলত ক্রোধের সময় দেহমনে জেগে ওঠে ডেঙ্গার সিগনাল, লাল বাতি।

'ম্যানেজিং এংগার' গ্রন্থের লেখক গিললিনডেন ফিল্ডের মতে, রাগ হচ্ছে দেহের স্বাভাবিক আবেগীয় ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া। যখন কেউ থ্রেট-এর মুখোমুখি হয় তার রাগ হতেই পারে।

শিশু প্রথম যে আবেগীয় অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেটি হচ্ছে 'রাগ'।

শিশুর হয়তো খিদে পেয়েছে, দুধ খেতে ইচ্ছে করছে। মুখ ফুটে খিদার কথা সে জানাতে পারছে না। প্রয়োজনের সময় অপ্রাপ্তিই তখন তার ভেতর রাগের সঞ্চার করে, হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে-কেটেই সে আবেগীয় প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, যখন নর-এড্রিনালিনের মাত্রা ছলকে বেড়ে ওঠে, আমাদের মাঝে তীব্র উদ্ধতভাব জেগে উঠতে পারে তখন। দেহের 'ফ্যাটসেল' থেকে ফ্যাটি এসিড বেরিয়ে আসে, ত্বরিত গতিতে শরীর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় লড়াই করার ক্ষমতা বেড়ে যায়, কিংবা পরিস্থিতির মধ্যে থেকে পালিয়ে আসার শক্তিও বাড়তে পারে।

বাড়তি চাপ মোকাবেলা কিংবা বাড়তি লড়াই-এর ক্ষমতা বাড়ে অতিরিক্ত ফ্রি ফ্যাটি এসিডের কারণে। যারা ঘোড়দৌড় কিংবা মোটর রেসে বা রেসলিং-এ অংশ গ্রহণ করে তাদের হয়তো অতিরিক্ত ফ্রি ফ্যাটি এসিডের প্রয়োজন থাকতে পারে, গবেষণায় এই সত্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণও পাওয়া গেছে। এদের রক্তে এই এসিডের পরিমাণ বেশিই পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে প্রমাণ পাওয়া গেছে, যারা ঘন ঘন উত্তেজিত হয় তাদের রক্তেও ফ্যাটি এসিডের মাত্রা থাকে বেশি। দীর্ঘদিন ব্যাপী এদের রক্তে ফ্যাটি এসিডের উচ্চমাত্রা রক্তনালীর জন্য ক্ষতিকর– ধমনী সংকোচিত হয়ে যেতে পারে, রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। ফলে হার্টের নিজস্ব অক্সিজেন খরচের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে হার্ট এটাক ঘটে যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যারা ঘন ঘন ক্রোধে উন্মত্ততা প্রদর্শন করে তারা করোনারী হার্ট ডিজিজের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, ক্রোধই প্রধান শত্রু নয়। কি ভঙ্গিতে ক্রোধের প্রকাশ ঘটছে সেটিই নির্ধারণ করে হার্ট এটাকের বিষয়টি। যারা ক্রোধ জমিয়ে রাখে, অবদমিত করে রাখে, তারই অসুস্থতা দ্রুত ডেকে নিয়ে আসে, তাদের হৃদস্পন্দনে ছন্দোময় তালের বিঘ্ন ঘটতে পারে, ছন্দোময় তাল হারিয়ে যেতে পারে, arrythmia হতে পারে। এটি ভয়াবহ একটি অবস্থা। এ সময় হার্ট পাম্প করে ব্রেইনসহ অন্যান্য জরুরী প্রত্যঙ্গে রক্ত পাঠাতে পারে না।

উচ্চরক্ত চাপ, ধূমপান, ডায়াবেটিস এমন কি ক্রোধ থেকেও হৃদপিণ্ডের এই অবস্থাটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, বেশি আশংঙ্কাযুক্ত। ক্রোধের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা ইম্মিউন সিস্টেম বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। খুব দ্রুতই তখন রোগে-শোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এছাড়াও দমিয়ে রাখা ক্রোধের কারণে অ্যাংজাইটি হতে পারে, নিজেকে পরিস্থিতি থেকে গুঁটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়তে পারে, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যে কেউ। উচ্চ

রক্তচাপ, এ্যাজমা, ভয় রোগ ফোবিয়া, হিস্টেরিয়া, ওজনের সমস্যা, অনিদ্রা ও যৌন সমস্যা লেগেই থাকতে পারে অবদমিত রাগের কারণে।

ক্রোধের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল কি?

প্রধান শর্ত হচ্ছে ক্রোধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করতে হবে। এই জ্ঞানই ক্রোধের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব পাল্টাতে সাহায্য করবে, সর্কত হতে শক্তি যোগাবে। সর্বোপরি আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

যাদের একবার হার্ট এটাক হয়েছে তাদের করণীয় কি?

গবেষণায় দেখা গেছে, অবাধে ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার এটাকের ঝুঁকি কমাতে পারেন তারা। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রোধের সময় নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করা গেলে ক্ষতি মোকাবেলা করা সহজতর হয়ঃ

- ❑ শোয়া অবস্থায় রাগ উঠলে বালিশে উপর্যপুরি ঘুষি দিতে থাকুন।
- ❑ হাতের কাছে ব্যাগ বা নরম যা কিছু আছে,পাঞ্চ করতে পারেন।
- ❑ চেঁচিয়ে রাগ বের করে দিতে পারেন নিজের ভেতর থেকে।

'নিয়ন্ত্রিত ইতিবাচক ক্রোধ' দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়ার পথ সহজ করে দেয়, সার্বিক মনস্তাত্তিক ও আবেগীয় সমৃদ্ধির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার অর্থ ইতিবাচক পথে এগিয়ে যাওয়া, অযৌক্তিক দাবি প্রতিহত করা। কী চাই, কী চাই না, কী চাওয়া উচিত নয়, বিষয়টি সম্পর্কে নিজের নিকট নিজেকে স্বচ্ছ রাখতে হবে।

পক্ষান্তরে এগ্রেশনের রয়েছে ভিন্ন চিত্র।

রাগের সঙ্গে 'মোটিভেটেড' আচরণের মিলিত ধারায় আমাদের মাঝে এগ্রেসিভ বিহেভিয়ার জেগে ওঠে। এ সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লোপ পায়, অন্যকে জোরপূর্বক ভূপতিত করা হয়, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার শক্তি হারিয়ে যায়। উদ্ভূত সমস্যা থেকে সমাধানে পৌছানো যায় না।

ডোপামিন নামক নিউরো ট্রান্সডিটরের কারণেও এগ্রেশন রিলিজ হতে পারে। সেরোটোনিনের মাত্রা কমে গেলেও এগ্রেশন হতে পারে। টেস্টোষ্টেরনের কারণেও এমনটি ঘটতে পারে।

ব্যক্তিগত হতাশা, সামাজিক শিক্ষণ, কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথার খোঁচায়ও এগ্রেশন রিলিজ হতে পারে।

রাগ প্রকাশের অধিকার আছে প্রতিটি মানুষের।

যিনি অন্যের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করেছেন, তার সামনে খোলামেলাভাবেই রাগের প্রকাশ ঘটতে পারে। এই প্রকাশের অর্থ আলাদা। এর ফলে ক্ষোভ উবে যায়, ব্যবধান কমে আসে। সুসম্পর্ক বজায় রাখার সকল বাধা দূর হয়।

এক্ষেত্রে 'ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স' (ইকিউ) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবেগীয় সমস্যা সমাধানে আইকিউ-এর চেয়ে ইকিউ বড় টুলস। এটি ডেনিয়েল গোলম্যান-এর কথা। তিনি আবেগীয় সমস্যা ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন।

তাঁর মতে ইকিউ হলো কিছু দক্ষতার সমাহার যেটির সাহায্যে মানুষ অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, নিজেদের মাঝে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান টানতে পারে, দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে পারে।

মূলত ইকিউ-এর মাধ্যমে নিজের আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়।

আবেগের প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব নিজে বহন করতে পারলে, নিজের ক্ষমতা নিজেই ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্তে নিয়ে আসে, ব্যক্তিগত অনুভূতিই তখন নানা অঙ্গিক থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে।

এ কারণেই বলা হয়েছে, ইকিউ টুলসটি ব্যবহারের প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজের অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হওয়া, অন্যের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক আচরণের উৎস বের করা, নিজের আগ্রহী মনোভাব শনাক্ত করা।

ওই মুহূর্তে করণীয় কি?

অপেক্ষা করতে হবে, কমপক্ষে তিন থেকে ছয় সেকেন্ড।

অপেক্ষা করার অর্থ রাগ অবদমন নয়।

এই অপেক্ষার অর্থ ক্রোধের সময় যে ইলেকট্রো কেমিক্যাল পদার্থের নিঃসরণ ঘটে, সেটির বিক্রিয়া নিস্ক্রিয় হতে সময় দেয়া, মাত্রা কমাতে সুযোগ তৈরি করা। ফলে রাগ থেকে সে সহিংসতা বা এগ্রেসিভ আচরণের সম্ভাবনা ছিল সেটি কমে যায়।

প্রকৃতি পক্ষে এসময় 'অপেক্ষা করা' দুরূহ একটি কাজ।

কিন্তু মানসিক চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে কৌশলটি রপ্ত করা যায়।

যখন শান্ত হতে থাকবেন নিজের প্রতিক্রিয়া নিজেই বোঝা যায়। এসময় বুঝতে সহজ হবে কী ধরনের নেতিবাচক বিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

এই নেতিবাচক ইস্যুটি বুঝতে পারলেই, পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষমতা বেড়ে যাবে, প্রকৃত মনোভাব বা আচরণ কী হওয়া উচিত ছিল এই উপলব্ধি এবং শিক্ষা দুটোই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করবে, ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে নিজের আবেগ নিজেকে রক্ষা করবে।

নিজেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে, মানসিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে বাড়াতে হবে গণ সচেতনতা।

ক্রোধ প্রশমিত করার নতুন দিগন্ত

সাম্প্রতিক মনোগবেষণা থেকে জানা যায়, ক্রোধ পোষ মানানোর যে সব সনাতন পদ্ধতি চলে আসছিল তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

দৈহিক ভঙিমা যেমন বালিশে বা নরম কিছুতে পাঞ্চ করে রাগ ঝাড়ায় যে কৌশলের প্রচলন আছে, সাময়িকভাবে পজিটিভ ফলাফল থাকলেও এসব পদ্ধতি মূলত পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতাই আমাদের বৈশিষ্ট্যে গেঁথে দেয়। রাগ প্রশমনের এ ধরনের কৌশলের উল্টো পিঠে এভাবেই আগ্রাসী আচরণের বীজ রোপিত হয়ে যেতে পারে আমাদের মাঝে। একটি বিষয় খোলাসা হওয়া দরকার, নতুন কৌশল বর্ণনায় রাগ অবদমিত করে রাখার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। বরং রাগ পোষ মানানোর পরীক্ষিত নতুন গবেষণা নিয়েই আলোচনা করা হবে পর্যায়ক্রমে।

বর্তমান বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসাবে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ইত্যাদি চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে কগনিটিভ বেহেভিয়ার থেরাপির সুনির্দিষ্ট প্রটোকল ব্যবহার করা হয়। ক্রোধের ক্ষেত্রেও একই কৌশলে রাগ শাসন করার কৌশল রপ্ত করা যায়।

এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, কেবল দীর্ঘ মেয়াদি রাগই ক্ষতিকর নয়। রাগ থেকে মানসিক চাপও সৃষ্টি হয়। এই চাপ হার্টের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নিম্নবর্ণিত উপায়ে ক্রোধের কোপানল থেকে বাঁচার জন্য আপনি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারেন ঃ

কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি প্রটোকলের মূল ইস্যু

রাগ প্রশমনের জন্য নিম্নলিখিত ইসুগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

❑ ক্রোধান্ধ ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া মনিটর করা। ক্রোধ উসকে ওঠার কারণগুলো শনাক্ত করা।

❑ ব্যক্তির সামগ্রিক সমস্যাটি কীভাবে মোকাবেলা করবে সেই বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া হয়। রাগ নয়, রাগের প্রতিক্রিয়াটিই গুরুত্বের সঙ্গে ট্রিট করা হয়।

❑ উদ্যত মেজাজের সময় ব্যক্তি যেভাবে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন, একই ঘটনাটি ওই ব্যক্তিকে পূনরায় মূল্যায়ণের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

সাধারণত রাগের সময় পরিস্থিতি সঠিকভাবে মেপে দেখা যায় না, ভুলভাবে কিংবা বিকৃতভাবে মানুষ পুরো পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক জরিপ করে নেয়, ফলে হঠাৎই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগ্রেশন জেগে ওঠে নিজের ভেতর।

সঠিকভাবে এই নেতিবাচক ইস্যুগুলো ধরার জন্য কগনিটিভ থেরাপিতে উৎসাহিত করা হয়। ইস্যুগুলোর অন্তর্নিহিত কারণগুলো অনেক সময় চ্যালেঞ্জ করা হয়। ফলে ভুল ব্যাখ্যা বা নেতিবাচক ধারণাগুলোর খোলস নিজের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। এভাবেই ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ইতিবাচক মূল্যায়নের ক্ষমতা নিজের মাঝে বেড়ে যায়। রাগ বাগে আনা তখন মোটেই কঠিন বিষয় বলে মনে হবে না। নিজেকে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয়ী মনে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শক্তি এভাবেই রপ্ত করা যায়।

রিলাক্সেশন ঃ ক্রোধের কারণে দেহের ভেতর সক্রিয় আলোড়িত অবস্থা সৃষ্টি হয়। রিলাক্সেশন টেকনিক চর্চার মাধ্যমে সেই আলোড়ন ভিন্ন খাতে সরিয়ে দেয়া যায়। নিজের দেহকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায়।

ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা ঃ ক্রোধের আড়ালে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন কিংবা ম্যানিয়ার মতো মানসিক রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে। এসব রোগগুলো রাগের তীব্রতা নানাভাবে জটিল করে তুলতে পারে। সমস্যার জট থেকে হঠাৎই যেন অগ্নুৎপাত ঘটে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাই পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে মুড দৃঢ় এবং সুস্থিত করার জন্য এসএসআরআই গ্রুপের বা প্রয়োজনীয় অন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

নিজের চেষ্টায় রাগ পোষ মানানোর নতুন কৌশল

১. পরিস্থিতি সরাসরি মোকাবেলা করতে হবে

অধৈর্য বা বিরক্তি সৃষ্টি করে এমন ঘটনাগুলো প্রথমে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করুন। নোট করে রাখুন। পরবর্তীকালে শান্ত থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে এক্সপ্রেস করুন। তাড়াহুড়ো বা সজোরে পরিস্থিতির ভেতর নিজেকে ছুঁড়ে দেয়া নয়, অপরকে দোষারোপ করাও নয়, এমন কি বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করা থেকেও নিজের জিহবাকে শাসন করতে হবে এ সময়।

মনে রাখুন, ক্রোধের সময় ছুঁড়ে দেয়া শব্দগুলো আপনার দেহ ও মনে স্ট্রেস রিএকশন ঘটায়। এই রিএকশন মানেই দেহের ক্ষতি, মনের ক্ষতি, ব্রেইনের ক্ষতি, হার্টের ক্ষতি।

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করুন ওম ম ম! রিলাক্স। রিলাক্স।

এভাবে চর্চা করতে শিখুন। হাস্যরসের কিছু নেই এতে। পুরো প্রক্রিয়াটিই বিজ্ঞান নির্ভর। চর্চার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ানো যায়। নিজেকে বিব্রত করে, নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এমনি পরিস্থিতিতে যদি কৌশলটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিজের দক্ষতা শাণিত হবে। ক্রোধ উসকে ওঠার ঘটনাগুলো তখন আপনাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না, দেহে সক্রিয় আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হবে।

২. প্রতিক্রিয়া জানানোর পূর্বেই ভেবে নিতে হবে

গবেষণায় দেখা গেছে, নিজস্ব মনোভাবই প্রথমে নিজের ভেতর রাগ উথালপাতাল করে তোলে। কেউ কেউ আছেন, প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরুতেই নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবতে শুরু করে, হীনতা বা অপমানবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অন্যায়ভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সেই আলোকেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলে।

এটি ভাবার প্রয়োজন নেই যে, কেউ আপনাকে ছোট করতে চায়, অপমান করতে চায়। যে অপমানবোধ আপনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, আপনার ভেতর রাগের সঞ্চার করেছে, সেটির সম্ভাব্য ভিন্ন ব্যাখ্যাটি খুঁজে দেখুন। আর একটু ভাবুন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অন্যের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, মানুষ নিজের অবস্থানে থেকে নিজের ভুল ধরতে পারে না, নিজের ভুল স্বীকারও করতে চাই না আমরা। প্রায় সব সময়ই যে-কোনো ঘটনার জন্য নিজেকে স্বচ্ছ ভাবি , অন্যকেই দায়ী মনে করি।

এর ভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হবে। প্রত্যেকেরই নিজের কাজের জন্য নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রকৃত খুঁতটি কোথায় ধরতে হবে আবেগীয় ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে। সঠিক খুঁতটি ধরতে পারলেই নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ধরনটিও সুস্থ আঙ্গিকে ঘটবে। এভাবেই ইতিবাচক পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। এভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কৌশলটি নিজের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়।

৩. দশ পর্যন্ত গণনা শুরু করুন

উন্মত্ততার সময় এই প্রক্রিয়াটি চর্চা করার কৌশল রপ্ত করে নিন। ধীরে ধীরে চর্চা করতে হবে। গভীর টানে প্রশ্বাস নিন। ছাড়ুন নিঃশ্বাস। অথবা রাগ উৎরে ওঠার ঘটনা থেকে মুহূর্তের জন্য দূরে সরিয়ে নিন নিজেকে। এর অর্থ এই নয় যে, পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে গেলেন। শান্ত হলেই আবার ফিরে আসুন। ঘটনাটি পূণরায় মূল্যায়ন করুন।

প্রয়োজনে এক দু'দিন অপেক্ষা করুন। তারপরই আপনার প্রতিক্রিয়া জানান। কেন ক্ষুব্ধভাব জেগেছে, ব্যাখ্যা করুন। সামগ্রিক পরিবেশের জটিল গিঁট এভাবে শিথিল করা যায়।

৪. রাগ জাগানিয়া ঘটনার ভেতর হাস্যরসের উপাদান আছে কিনা খুঁজে দেখুন

রসবোধই মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা থেকে আপনাকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। ঘটনার ভেতরই ঘুরপাক খেয়ে দেখুন কৌতূকের কিছু উপাদান পাওয়া যায় কিনা।

দ্রুত কোথাও যেতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পৌছতে হবে কোনো বিশেষ ফাংশনে।

গাড়িতে চেপে শুনলেন ড্রাইভার চাবি হারিয়ে ফেলেছে। সে হয়ত হালকা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছে।

আপনার মেজাজ নিশ্চয় চড়ে যাবে, তাই না?

ক্ষেপে না গিয়ে এমনি করে ভাবলে কেমন হয়?

চাবি হারানোর সেই তো উপযুক্ত ব্যক্তি। নিজের চড়ে যাওয়া রাগ কী এভাবে হালকা করা যায় না? যায়। চর্চা করে দেখুন না একবার।

রাগ তরল করার জন্য রসবোধ যে-কোনো পরিস্থিতি থেকেই খুঁজে বের করা যায়। ব্যক্তি বিশেষে রসবোধ অনুভব করার বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর হয়। সবার জন্য সব কিছু সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও ইতিবাচক ইস্যুগুলো নেড়েচেড়ে দেখার প্রবণতা বাড়াতে পারলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

৫. নিজ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের নতুন কৌশল রপ্ত করতে হবে

আমাদের চারপাশে অনেকে আছেন, দক্ষতার সঙ্গে যে-কোনো হতাশাজনক পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন তারা। এমন কাউকে খুঁজে দেখুন, পেয়ে যাবেন নিশ্চয়। তাঁর যোগ্যতাকে মডেল হিসাবে নিন। সেভাবে চেষ্টা করুন। এভাবে ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের আলোকে নিজের প্রতিক্রিয়া জানানোর কৌশলটি রপ্ত করে নিতে পারেন। নিজের সমৃদ্ধি অবশ্যই গড়ে উঠবে।

উদাহরণ হিসাবে সরকারী অফিসের একজন দক্ষ প্রশাসকের গল্প বলি, শুনুন। সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হলে, সমস্যা জট পাকালে ধীরে সুস্থে দ্বন্দ্ব মোকাবেলায়, সমস্যার দুইটি সমাধানের পথ সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি। সহকর্মীদের ওপর কিছু চাপিয়ে না দিয়ে, ক্ষুব্ধতা প্রকাশ না করে এভাবেই মীমাংসায় পৌছে যাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাটি সেই কীর্তিমান প্রশাসকের। আপনিও এমনি অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

৬. চিন্তার গণ্ডি প্রসারিত করতে হবে

কোনো কোনো চিন্তা নিজের মাঝে ক্ষোভ জাগাতে পারে। বিক্ষুব্ধ করতে পারে। প্রথমে চিন্তাগুলোর জটিল গিঁট থেকে বিকল্প চিন্তার পথ বের করে নিতে হবে। এর পর পাল্টা এগ্রেশন জাগে এমন পরিস্থিতিগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা চালাতে হবে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, হয়ত বস অফিসের অতিরিক্ত দায়িত্ব আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিলো।

এমন অবস্থায় আপনি ভাববেন, বস নিশ্চয় আপনাকে টার্গেট করেছে, আপনার ভোগান্তি বাড়ানোর জন্যই অতিরিক্ত লোড বাড়িয়ে দিয়েছে।

এভাবে ভাবলে নিজের ভেতর ক্ষোভ জাগাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি এমনি একটি পরিস্থিতি থেকে বিকল্প চিন্তা বের করে নিয়ে ভাবা যায় যে, বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট, আপনার দক্ষতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতায় মুগ্ধ, আপনাকে নির্ভরশীল মনে করে। ইত্যাদি ভাবনা থেকে কি আপনার দক্ষতা আরো বেড়ে যাবে না? রাগ কি সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না?

৭. ক্রোধ বিষয়ক কোনো বই বা জার্নাল হাতের কাছে রাখুন

যখন নিজের মাঝে ক্রোধের উন্মত্তা জাগবে, ১০ ডিগ্রী রাগের স্কেলে, তা মেপে নিন।

যদি স্কোর ৪ বা ততোধিক হয়, পরিস্থিতি বিষয়ক চিন্তা এবং দৃশ্যমান ইমেজগুলো নোট করে রাখুন। ক্রোধের মেয়াদকাল, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি কী কী, বিস্তারিত লিখে রাখুন।

কী পদ্ধতিতে, কী পরিস্থিতিতে, কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, পুরো বিষয়টি তখন আপনার কাছে খোলাসা হয়ে যাবে। সঠিক করণীয় দায়িত্ববোধই তখন পজিটিভ দিকগুলোকে আপনার সামনে তুলে ধরবে।

৮. নিজের প্রতি ফিরে তাকাতে হবে

ক্রোধের কারণে নিজ জীবনে কতোটুকু মূল্য দিতে হয়েছে একবার নেড়েচেড়ে দেখুন।

রাগের কারণে কী কোনো মধুর সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

ভেঙ্গে গেছে?

কর্মক্ষেত্রে কী কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে?

ফলশ্রুতিতে কী কোনো ধরনের দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে? যেমন মাথাব্যথা? বিষণ্নতা? ইত্যাদি।

হঠাৎ সৃষ্ট উন্মত্ততা কী সামাজিকভাবে আপনাকে বিব্রত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল?

বাস্তব প্রমাণ হাতে আসলে, মূল্যায়ন সঠিক হবে। নিজেকে সামাল দেওয়ার কৌশল ভেতর থেকেই আপনাকে তখন রক্ষা করবে।

৯. রিলাক্সেশন-কৌশলগুলো চর্চা করতে হবে

যে-সব ঘটনা আপনার ভেতর ক্ষুব্ধতা জাগিয়েছিল, অলস সময় ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ঘটনাগুলো ভেবে নিন।

এবার 'প্রগ্রেসিভ মাসকুলার রিলাক্সেশনের' কৌশলগুলো চর্চা করুন।

কৌশলগুলো মনোচিকিৎসক বা থেরাপিস্ট থেকে আপনাকে শিখে নিতে হবে। এটি মানসিক স্বাস্থ্য সেবার একটি অংশ।

মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রতিটি বড়ো ধরনের পেশীর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে রিলাক্স করবেন। এ সময় মনোসংযোগ ধরে রাখতে হবে। গভীরভাবে শ্বাস নিতে হবে, ছাড়তে হবে।

প্রধান লক্ষ্য হলো, স্বীয় অনুভূতির ব্যাপারে নিজস্ব সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা। ক্রোধের সময় নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে রিলাক্স করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, পেশীর রিলাক্সেশন চর্চার মাধ্যমে।

১০. নিয়মিত ব্যয়াম করতে হবে

নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের হতাশা মোকাবেলা করার কৌশল রপ্ত করা যায়। মনে রাখতে হবে, হতাশা থেকেও এগ্রেশন রিলিজ হয়। সেই সহিংসতার চিত্র হয় ভয়াবহ।

১১. ছোটখাট ভুল ক্ষমা করার শক্তি থাকতে হবে নিজের ভেতর

ক্রোধের ব্যাপারে দায়িত্বটুকু নিজের কাঁধে নিতে হবে, অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব ট্রেকে ফিরে আসতে হবে। অন্যের যেন-তেন ভুলগুলো উদারভাবে বিবেচনা করার শক্তি অর্জন করতে হবে।

যদি এর পরও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, কাউন্সিলিং-এর সাহায্য নিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রোধের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ম্যানিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগ। ওষুধের মাধ্যমে এমন তরো পরিস্থিতি চিকিৎসা করা সম্ভব। পূর্বেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

Personal Library
Book No.....
Collected by Prasenjit Chowdhury

যদি কেউ ঘটনা পরম্পরায় উন্মত্ত হয়, পুরোপুরিই নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে নিজের প্রচেষ্টায় রাগ পোষ মানানোর কৌশলগুলো কাজে লাগবে না।

দাম্পত্য সম্পর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী?

উত্তেজিত পার্টনারকে বলুন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না শান্ত হবে, আমাকে সম্মান দেখাতে যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে, ততোক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। কথা বলতে চাই না।

যতোক্ষণ পর্যন্ত পার্টনারের উদ্যত মেজাজ কমে না আসে, সেই ফাঁকে সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা ভেবে নিন।

কেন রাগ হলো ? কী করা উচিত ? কীভাবে কমপ্রমাইজ বা সমঝোতো করতে চান ? পুরো ঘটনা মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখুন।

সঙ্গি বা সঙ্গিনীর দোষ ধরার চেষ্টা করবেন না। যতোই দোষ হয়ে থাকুক ব্যাপারটি নিয়ে ঘাটা-ঘাটি না করে খোলামেলা নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরুন। আলাপ করুন।

'আমি ফীল করছি', 'আমি চিন্তা করছি', 'আমি চাই' ইত্যাদি ঢংগে আলাপ শুরু করুন। দোষ লেবেল করার প্রবণতা পরিহার করতে হবেই। নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেও বকাঝকা চলবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে অপরকে হাস্যস্পদ করার পথে কখনই এগিয়ে যাবেন না।

কী চাচ্ছেন? কী চাচ্ছেন না?

পার্টনারের কাছে খোলামেলা বিষয়টি নিয়ে আলাপ করে রাখুন।

মনে মনে কিছু একটা চাচ্ছেন, মুখ ফুটে সঙ্গিকে কখনই বলেননি। আশা নিয়ে বসে আছেন, নিজে থেকেই সঙ্গি আপনার চাওয়ার বিষয়টি বুঝা যাবে, সেই হিসাবে পদক্ষেপ নেবে।

অগ্রিম এমন তরো আশা করে বসে থাকবেন না।

বরঞ্চ অপরের বক্তব্য শুনুন। নিজের সব কথা তাকে খুলে বলুন। এই প্রচেষ্টা হয়ত অভিমানের তাপদাহে চাপা পড়ে থাকে। চাপা পড়লেই ভুল হবে। সংঘাত বাড়বে।

আপনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, ক্রোধ তরল হবে না। উত্তরোত্তর রাগের তীব্রতা ও মেয়াদকাল বাড়তেই থাকবে।

এই ধরনের বাড়তি প্রবণতা দাম্পত্য সম্পর্কে ধস নামিয়ে দেয়। বিপদ অবশ্যম্ভাবি পথে ছোবল বসায়।

নিজের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, রাগ সামাল দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কে মধুর আবহ বজায় রাখার জন্য কাউন্সিলিং-এর আশ্রয় নিতে পারেন আপনি।

আপনার রাগ কি দেহমনের জন্য ক্ষতিকর ?

মেপে দেখতে চান রাগের তীব্রতা, মেয়াদকাল কিংবা রাগের ফ্রিকোয়েন্সি?

হ্যাঁ, রাগ মাপা যায়।

নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। ক্রোধ পরিমাপ করে নিন। প্রয়োজনে ঘনিষ্ঠজন কিংবা ক্লোজড বন্ধু-বান্ধবীর সহায়তা নিন, সঠিক উত্তরের জন্য সৎ হোন, নিঃসংকোচ হোন।

১. গত সপ্তাহে কতোবার রাগান্বিত হয়েছিলেন?

- ❒ একবারও না।
- ❒ পুরো সপ্তাহে এক বা দুইবার।
- ❒ পুরো সপ্তাহে ৩-৫ বার।
- ❒ প্রতিদিন প্রায় দুইবার।
- ❒ প্রতিদিন প্রায় তিনবার।
- ❒ প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ বার।
- ❒ প্রতিদিন প্রায় ৬-১০ বার।
- ❒ প্রতিদিন ১০ বারেও বেশি।

স্কোর দেওয়ার কৌশল ঃ সঠিক উত্তরের বামপাশের বক্সে টিক (√) চিহ্ন দিন। যদি রাগের পুনঃপুনঃ সংঘটন (ফ্রিকোয়েন্সি) সপ্তাহে ৩-৫ বা ততোর্ধ্ব বার সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে নিজেকে স্কোর দিন ২। অন্যথায় স্কোর করুন ১।

২. কতোক্ষণ ধরে আপনার ক্রোধ বজায় থাকে?

- ❒ ৫ মিনিটের কম।
- ❒ ৫-১০ মিনিট ।
- ❒ ৩০ মিনিটের কম।
- ❒ ৬০ মিনিটের কম।
- ❒ ১-২ ঘণ্টা।
- ❒ অর্ধ দিবস।
- ❒ পুরো দিন।
- ❒ এক দিনেরও বেশি।

স্কোর দেওয়ার কৌশল ঃ সঠিক উত্তরের বাম পাশের বক্সে টিক (√) চিহ্ন দিন। যদি রাগের মেয়াদকাল একদিনেরও বেশি হয়। তবে নিজেকে স্কোর দিন ২। অন্যথায় স্কোর করুন ১।

৩. তীব্রতার দিক থেকে গড়পরতা আপনার ক্রোধের মাত্রা কতো?

১ ঃ ২ ঃ ৩ ঃ ৪ ঃ ৫ ঃ ৬ ঃ ৭ ঃ ৮ ঃ ৯ ঃ ১০

মৃদু তীব্র

স্কোর দেওয়ার কৌশল ঃ মাত্রা যদি ৮ বা ততোর্ধ্ব উঠে যায়, তবে নিজেকে স্কোর দিন ২। অন্যথায় স্কোর করুন ১।

স্কোর মূল্যায়ন করে নিন

নিম্ন পদ্ধতিতে তিনটি ধাপের স্কোর যোগ করুন।

এখানে ক্রোধের পুনঃপুঃ সংঘটন (ফ্রিকোয়েন্সি), তীব্রতা এবং মেয়াদকাল পরিমাপ করা হয়েছে ঃ

$$\frac{\text{প্রশ্ন ১}}{\text{ফ্রিকোয়েন্সি}} \times \frac{\text{প্রশ্ন ২}}{\text{মেয়াদকাল}} \times \frac{\text{প্রশ্ন ৩}}{\text{তীব্রতা}} = \frac{\text{মোট}}{}$$

স্কোরের ব্যাখ্যা ঃ

যদি স্কোর হয় ১ ঃ আপনার ক্রোধ শাসন করার ক্ষমতা অসাধারণ। নিজের প্রতি, পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবীর প্রতি এই স্কোর মোটেই ক্ষতিকর নয়।

যদি স্কোর হয় ২ ঃ ক্রোধের তিনটি অনুষঙ্গের (ফ্রিকোয়েন্সি, মেয়াদকাল ও তীব্রতা) যে-কোনো একটিতে আপনার সমস্যা রয়েছে। মাত্র একটি ডায়মেনশনে সমস্যা থাকার অর্থ এই নয় যে আপনি বিপদমুক্ত। যেমন ধরুন, ক্ষেত্রবিশেষে হঠাৎই অতি উন্মত্ততা, ক্ষুব্ধতা দেখিয়ে ফেলেন আপনি। এটি কি সমস্যা নয়?

চোখের পলকে এ ধরনের ঝলসে ওঠা অবশ্যই নিজ দেহের ওপর প্রভাব ফেলে, অবশ্যই অন্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ভিত কাঁপিয়ে দেবে।

খুশির খবর এই যে, এ ধরনের ক্রোধের কোপানল থেকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। উপরে বর্ণিত নিজের চেষ্টায় রাগ পোষ মানানোর নতুন কৌশলগুলো চর্চা করে যেতে থাকুন। বিপদ হানা দিতে পারবে না নিজের জীবনে।

জেনে রাখুন, শিশুকাল থেকেই সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে এ ধরনের মেজাজ আমাদের মাঝে গড়ে ওঠে। এগুলো শোধরানো সম্ভব। প্রয়োজন নিয়মিত কৌশল চর্চা ও অধ্যবসায়।

যদি স্কোর হয় ৪ ঃ এর অর্থ এই যে, ক্রোধের যেকোনো দুইটি অনুসঙ্গে আপনার সমস্যা রয়েছে।

স্কেল এই অবস্থানে থাকলে কখনই আপনি ভালো বাবা বা মা হতে পারবেন না, দাম্পত্য সম্পর্ক নড়বড়ে হয়ে যাবে, সর্বোপরি আয়ুষ্কালও কমে যাবে আপনার।

যাদের রাগ মধ্যমানের তারাই ক্রোধের নিম্নলিখিত তিনটি ধারার যে-কোনো একটিতে অবস্থান করছেন ঃ

- ❑ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি/উচ্চমাত্রা→জীবন্ত আগ্নয়গিরি তুল্য।
- ❑ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি/দীর্ঘ মেয়াদকাল→ধীরে দহনকারী।
- ❑ উচ্চ মাত্রা/দীর্ঘ মেয়াদকাল→ঘুমন্ত সিংহের সঙ্গে তুল্য।

এ ধরনের ক্রোধ একাকী মোকাবেলা করা কঠিন। 'নিজের চেষ্টায় রাগ পোষ মানানোর নতুন কৌশলগুলো' চর্চা করে দেখতে পারেন। ব্যর্থ হলে অবশ্যই কাউন্সিলিং -এর সাহায্য নিতে হবে আপনাকে।

যদি স্কোর হয় ৮ ঃ এর অর্থ এই যে, ক্রোধের তিনটি অনুষঙ্গেই আপনার বড়ো ধরনের সমস্যা রয়েছে। স্কোরের এই উচ্চমান অবশ্যই টক্সিক (Toxic) রাগেরই বহিঃপ্রকাশ। জেনে নিন। আপনার পেছনে ভয়াবহ শত্রু ওঁৎ পেতে বসে আছে, বিষাক্ত ছোবলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, বিলম্ব না করে অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।

কান্নার রসায়ন ঃ কান্নার ফলাফল

কেস স্টাডি ঃ

পড়ন্ত বিকেলে টিএসসি-এর সড়ক দ্বীপে তুমুল আড্ডায় মেতে আছে মনি।

গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে লম্বালম্বি শুয়ে আছে সরু রোদের রেখা। মৃদু বাতাস বইছে। শীত শীত বাতাসের কোমল ছোঁয়ায় সবার মাঝে যেন বয়ে যাচ্ছে শান্তি। প্রশান্তি। চারপাশের আনন্দময় পরিবেশটিই আলোচনার মূখ্য বিষয় এখন।

রোকেয়া হলের গেইটের দিক থেকে এ সময় ছুটে আসে ফারজানা। হাতে একটি চিঠি।

মনি দেখ, রুমানা'পু চিঠি পাঠিয়েছে জাপান থেকে।

রুমানার ছোটবোন মনি। মনবসু স্কলারশীপ নিয়ে রুমানা উচ্চশিক্ষার জন্য জাপান গেছে। মনি সোল্লাশে লাফিয়ে ওঠে। খামটি হাতে নেয়।

ভেতরে একটি ছবি, বিদেশী একটি ছেলে বুকে জড়িয়ে রেখেছে রুমানাকে। ওরা দুজন বিয়ে করেছে। এই সংবাদই এসেছে চিঠিতে।

উচ্ছল মনির বুকে যেন গেঁথে গেছে একটি বিষাক্ত ছুরি। নির্বাক মনি ছবি হাতে পাথরের মতো বসে থাকে। তাৎক্ষণিক ছোবলে বুকের শান্তি যেন জমাট কষ্টে বদলে গেছে।

অভিব্যক্তিহীন মনি ফিরে এসেছে হলে। কারুর সঙ্গে কথা বলেনি। রাতে কিছু খায়নি, পানি পর্যন্ত পান করেনি। রাত গভীর হয়েছে। শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুম নেই চোখে। তাকিয়ে আছে অন্ধকার ছাদের দিকে।

ফারজানা এবং মনি দুজনেই ক্লোজড ফ্রেন্ড, রুমমেট। রুমানাপুর কাণ্ড দেখে সেও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে মনির বিছানায় গিয়ে বসে। আলতো হাত রাখে মাথায়।

ফারজানার হাতের ছোঁয়া পেয়ে যে কি হয়! যেন ভেঙে গেছে বুকের বাঁধ। হু হু করে কান্না শুরু করে মনি। চিৎকার করে বলতে থাকে, আপু, এ কি করলি তুই! এ কি করলি!

ব্যাখ্যা ঃ

❑ মনি প্রথমে কেন কাঁদতে পারেনি? কেন সে কাঁদলো ? কী রহস্য লুকিয়ে আছে কান্নার ভেতর? কান্নার উৎস কি ? দেহ ও মনে কিই বা ঘটে কান্নার সময়? কোন রাসায়নিক উপাদান জড়িয়ে আছে অশ্রু ধারার অপ্রতিরোধ্য প্রবাহের সঙ্গে ?

❑ লাকরিমাল গ্ল্যান্ড থেকে অশ্রু তৈরি হয়। কান্নার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০-১০০ গুণ বেশি অশ্রুপাত হয়। এই গ্ল্যান্ডটি চক্ষু কোঠরের ভেতর অস্থিত। এটির আকৃতি খোসা ছড়ানো বাদামের মতো। পাতলা ফালি করে কাটা টিস্যুর সমন্বয়ে এটি গঠিত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পেশী দ্বারা গ্ল্যান্ডটি মোড়ানো।

আবেগীয় কষ্টের সময়, কিংবা কোনো দৃশ্য অবলোকন করার ক্ষণে তুলতুলে নরম কনিকাও যদি চোখে ঢোকে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পেশী উদ্দীপ্ত হয়। ফলে পেশীতে সংকোচনের সৃষ্টি হয়, গ্ল্যান্ড থেকে তখন পানি বেরিয়ে আসে, চোখ উপচে ঝরতে থাকে অশ্রু।

❑ কান্নার সময় দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। হৃদকম্পন দ্রুত হয়। শ্বাসযন্ত্রের পেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে, থপথপ করে তখন বুকের পেশী ওঠানামা করে।

❑ রাগ থেকেও কান্না আসতে পারে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, চোখে পানি না আসা পর্যন্ত ওই সময় সমালোচনা সহ্য করা যায় না। স্বস্তি আসে না নিজের ভেতর।

❑ আবেগ প্রবণ ছবি কিংবা নাটক দেখার সময় প্রায়ই বড় বড় শ্বাস নিতে হয়। নিঃশ্বাস ছাড়তে হয়। অশ্রু ঝরলেই সান্ত্বনা পাওয়া যায়। সত্তাটি গভীর করে এসময় ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, ছুঁয়ে যায় আবেগের নানা অনুষঙ্গ। কান্না আসতে থাকে ভেতর থেকে, পানি ঝরতে থাকে চোখ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তির মৃদু ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে মনে, শরীর জুড়ে ।

❑ অতি আনন্দেও কান্না চলে আসে চোখ উপচে।

বৈজ্ঞানিকভাবে বলা হচ্ছে, কান্না হচ্ছে স্বাস্থ্যকর নির্গমন পথ। এই পথেই বেরিয়ে যায় দেহ-মনের ওপর চেপে বসা নেতিবাচক প্রভাব।

মনির দিকে ফিরে তাকাতে পারি আমরা। অচিন্তনীয় কষ্ট চেপে বসেছিল ওর নরম মনের ওপর। পাথর হয়ে গিয়েছিল কষ্টে। কান্নার মাধ্যমে সেই কষ্টের কিছুটা হলেও নির্গমণ ঘটেছে। এটি দেহ-মন সুরক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজন। এখানে ফারজানার হাতের স্পর্শ ও সহমর্মিতা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করেছে, উপশম হয়েছে তীব্র যন্ত্রণার উচ্চ মাত্রা। ফারজানা এখানে কেবল সহানুভূতিই দেখায়নি। চারপাশ সম্বন্ধে এসময় মনির উপলব্ধি এবং কষ্টকে সে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছে। এটিকে বলে empathetic approach.

❑ **অশ্রুর ধরন ঃ** দুই ধরনের অশ্রুধারা রয়েছে।

১. দেহগত অশ্রু (physical tear) ঃ দেহগত অশ্রু আসে একধরনের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়ার (reflex action) ফলে। এই অশ্রু চোখের কোমল অংশগুলোকে বাইরের অনুকণা থেকে রক্ষা করে, জীবাণু বিরোধী মিডিয়া হিসাবে কাজ করে।

২. আবেগীয় অশ্রু (emotional tear) ঃ এই অশ্রুধারা বায়োলজিক্যাল চাহিদা পূরণ করে।

কুড়ি শতাব্দী পূর্বে রোমান কবি ওভিড বলেছিলেন, কান্না হচ্ছে অবরুদ্ধ আবেগ থেকে মুক্তির একটি উপায়। যন্ত্রণা, মনোকষ্ট, উদ্বেগ লাঘব হয় কান্নার মাধ্যমে।

এ শতকের আশির দশকে গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, মানসিক চাপ থাকলে রক্তে প্রোলাকটিন (prolactin) এবং এসিটিএইচ (ACTH) হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। কান্নার মাধ্যমে এ ধরনের হরমোনের উচ্চমাত্রা ঝেঁটিয়ে কমানো যায়। এজন্য বলা হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদতে পারলে নিজের ভেতর স্বস্তি আনা সহজ হয়, এমনকি মাথাব্যথাও প্রতিরোধ করা যায়।

প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই অশান্তির সঙ্গে থাকে কান্নার সংশ্রব। এক পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে উপচে ওঠা আনন্দ বা উল্লাসের সঙ্গে কান্না জড়িত। বাকিটা ঘটে থাকে ক্রোধ এবং হতাশার কারণে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কান্নার পরও নিজের মাঝে অশান্তি থেকেই যায়। এমনটি ঘটে থাকে অত্যধিক আলোড়িত কিংবা উদ্দীপ্ত থাকার কারণে। জীবনের চলার পথে ভয়াবহ যন্ত্রণাময় প্রেক্ষাপট সেঁটে থাকলে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন।

এসব ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

❑ মেয়েরা কেন বেশি কাঁদে?

কারণ রক্তে প্রোলাকটিনের মাত্রা পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই বেশি থাকে। এই হরমোনটি ব্রেস্ট-এর বৃদ্ধি উদ্দীপ্ত করে। এই উচ্চমাত্রার প্রোলাকটিনই কী অশ্রুপাত উসকে দেয়, নাকি মহিলাদের অশ্রুতে প্রোলাকটিনের মাত্রা বেশি এটি এখনো নিশ্চিত জানা যায়নি।

কিন্তু প্রমাণিত সত্য এই যে, যতোই মহিলারা মেনোপজের কাছাকাছি চলে আসেন, ততোই প্রোলাকটিনের মাত্রা কমতে থাকে।

মেনোপজের সময় হরমোনটির মাত্রা চল্লিশ শতাংশ কমে যায়। এজন্য শেষ জীবনের মহিলাদের অশ্রুপাতের মাত্রা কমে যায়। তারা ডিপ্রেশন এবং প্যানিক অ্যাটাকে বেশি আক্রান্ত হন।

❑ কান্নার অন্যান্য প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মানুষই বিশেষ করে পুরুষেরা জনসমক্ষে কান্না এলে বেশির ভাগ সময়েই দাঁত খিঁচে ধরেন অথবা চকিতে মাথাটির ওপরের দিকে তুলে ধরেন। কারণ শিশু বয়স থেকে আমাদের মাঝে প্রোগ্রাম করা আছে 'কেঁদো না, কাঁদতে নেই' ইত্যাদি।

❑ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার বিষয়টিকে সুস্বাস্থ্যকরই মনে করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। অনেকে কাঁদতে কাঁদতে যন্ত্রণাময় ঘটনার কথা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় ইমোশনাল রিলিজ ঘটে দ্রুত।

সাইকোথেরাপির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে ' রিলিজ অব ইমোশন'। কেঁদে কেটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা করা গেলে কষ্ট থেকে উপশম পাওয়া সহজতর হয়। যন্ত্রণাময় ঘটনার পর কেঁদে কেটে ঘুমাতে পারলেও স্বস্তি পাওয়ার পথ খুলে যায়।

প্রাচীনকালে পেশাজীবী শোকগ্রস্তরা শোক সন্তপ্ত বিমূঢ় ও হতচেতন পরিবারের সদস্যদের বিহ্বলতা ভাঙাতেন কান্নার মাধ্যমে।

❑ দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যিনি কান্নায় ভেঙে পড়তে পারেন, মূলত তিনি নিজস্ব তাৎক্ষণিক অনুভূতির গভীরে চলে যেতে পারেন।

সুস্বাস্থ্যের জন্য এটিই এমনি অবস্থায় সবার প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত।

❑ একা কাঁদাকাটি করে বালিশ ভেজানোর চেয়ে, কারো সামনে কাঁদলে লাভ বেশি হয়। তবে ব্যাপারটি ঘটতে হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

এই সময় কষ্ট বা যন্ত্রণার অংশীদার পাওয়া যায়। ফলে কষ্ট লাঘব হয় সহজে। এমন কি উচ্চরক্তচাপও কমে আসতে পারে সহমর্মিতার কারণে।

❑ শিশু নানা কারণে কাঁদতে পারে। খিদে পেলেই কাঁদে শিশু। খিদার সঙ্গে কান্নার সংশ্রব বেশি। শারীরিক অসুস্থতার জন্যও কান্না আসতে পারে। কিছু একটা চাচ্ছে, পাচ্ছে না। অপ্রাপ্তি থেকে আসছে জেদ, আসছে কান্না। শিশুর কান্নার উৎস বা কারণ বুঝতে হবে। সেই আলোকেই ব্যবস্থা নেয়া ওই মুহূর্তের জরুরী কাজ।

❑ মেজর ডিপ্রেশন থেকেও কান্নার ঢেউ ছুটে আসতে পারে। এই অবস্থায় নিউরোট্রান্সমিটর সেরোটোনিনের মাত্রা কমে যায়। এটি একটি মানসিক রোগ। মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমেই রোগীকে সবধরনের উপসর্গ থেকে মুক্তি দেয়া যায়। এছাড়াও সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের মাঝেও অসঙ্গতিপূর্ণ কান্না দেখা যায়। এক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসাই মুখ্য বিষয়।

রোগভোগ দীর্ঘায়িত না করে এই অবস্থার মানসিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করাই বুদ্ধিদীপ্ত কাজ।

❑ তবে মনে রাখতে হবে, সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য কান্নার প্রয়োজন রয়েছে।

যে সকল মহিলা আপনজনের মৃত্যু কিংবা ডিভোর্সের পর কাঁদতে পারে না, গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিষণ্ন মনের গতি-প্রকৃতি ঃ কালো মেয়ে মিষ্টি মেয়ে

মুন্নীর মন ভালো নেই।

বাইরে বেরোনো দরকার, কিছু গিফট কিনতে হবে। রাবুর ম্যারেজ-ডে আজ। বের হতেই ইচ্ছে করেছে না, ক্লান্তিতে যেন জড়িয়ে আছে দেহ, মন।

হাজবেন্ডসহ এসেছিল রাবু, নিমন্ত্রণ করে গেছে বাড়িতে এসে। যেতেই হবে। কারণ রাবু ওর বান্ধবী, ক্লোজ বান্ধবীর চেয়েও বেশি কিছু। ভার্সিটি জীবনের দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে, একই হলে এক রুমেই থেকেছে। দূরন্ত সময় পার করেছে। এক মুহূর্তের জন্য রাবুকে না দেখে থাকতে পারতো না।

অথচ আজ! সময় যেন কতো বড় শত্রু, সব আনন্দ ভালোবাসা যেন চুষে নিয়ে গেছে। প্রকৃতির সবুজের উন্মাতাল হাওয়ায় কতো ঘুরে বেড়িয়েছে তারা। সেই গাছ গাছালিকে মনে হয় মৃত শাল। শীতল বাতাসের আদুরে পরশকে মনে হয় তিক্ত থাবা।

মুন্নী! এই মুন্নী! ভেতর রুম থেকে মায়ের ডাক ভেসে আসছে।

জবাব দিচ্ছে না সে। চুপ মেরে আছে, যেন মুন্নী বলে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব এই ঘরে নেই। সাড়া না পেয়ে মা উঠে এসে বলেন,

চুপ করে আছিস কেন? ডাকছি আমি, শুনছিস না?

মাথা তুলে তাকায় না মুন্নী। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক মণিমাণ্যিক্য-রতনরাজি। নিবিড় করে তারই সৌন্দর্য যেন পান করছে প্রাণ ভরে।

মা স্থির চোখে কতোক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মেয়ের দিকে। দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করলেন না। ফিরে গেলেন ক্ষোভের সঙ্গে।

মুন্নী পাত্তাই যেন দিলো না মাকে।

নিজ ঘরে মোড়ায় বসেছিল সে এতোক্ষণ, মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালো। বাম দিকে ঘুরতেই আয়নায় চোখ পড়লো। নিজের মুখের ওপর চোখ পড়তেই হু হু করে কেঁদে উঠলো সে।

পরিবারের বড় মেয়ে মুন্নী। তিনটি ছোট বোন রয়েছে তার। কোনো ভাই নেই। সংসারে স্বচ্ছলতা আছে। বাবা উচ্চপদে চাকরি করে। ইস্কাটনে সরকারি বাসায় থাকে ওরা। মুন্নীর চেহারাটি খুবই মায়াবি। তবে গায়ের রং কালো। বেশ কালো। কালো হলেও বুদ্ধিদীপ্ত মুন্নীকে একনজর দেখেই ভালো লেগে যায় সবার।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মুন্নীর ছিল অনেক বন্ধু। ছেলে-মেয়ে বন্ধুর সংখ্যার কমতি ছিল না।

তবে কেউ ওর সঙ্গে প্রেম করতে চাইতো না, প্রেমের ভাব করতো, দু'একদিন পরই শরীরের দিকে হাত বাড়াতো ছেলেরা।

সব ছেলেদের দাবিকে সে কৌশলে এড়িয়েছে। তবে একজনকে এড়াতে পারেনি। সেই একজনের কথাও ভাবতে চায় না। তবে ভাবনায় এসে যায়।

ভার্সিটি জীবনে কিছুই বুঝতে পারেনি সে, এখন বুঝছে সব। ধীরে ধীরে সব বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘনিষ্ঠদের মাঝে তার বিয়েই বাকি।

উহ! বিয়ের কথা মনে হতেই মাথাটা টনটন করে ওঠে। বাবা মা অস্থির হয়ে গেছেন, আত্মীয়-স্বজনের পিন ফুটোনো কথা নিজের মাঝে বিরক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। কতো ছেলে দেখে যাচ্ছে। সেজেগুজে ফরমালি, ইনফর্মালি কতোবার মহড়া দিলো সে। কেউতো বিয়ে করতে চায় না। তবে আকারে ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছে–মেয়ে বেশ মিষ্টি।

মিষ্টি ধুয়ে কি পানি খাবে?

বিয়ে করতেই হবে এমন ধারণা তার ভেতর নেই। বিয়ে ছাড়াই পুরোজীবন কাটিয়ে দেবে এরকম একটি প্রত্যয়ী মন ছিল তার। সেই মনের শক্ত দেয়ালে যেন ধস নেমেছে। কিছুই ভালো লাগছে না।

কতোবার চাকরির ইন্টারভিউ দিলো। না, হলো না। হবে বলে মনেও হচ্ছে না। বিসিএস দেওয়া দরকার, পড়তে ইচ্ছে করছে না।

এ সময় বাবা শাহবাজ চৌধুরী এসে রুমে ঢোকেন।

আলতো হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়।

মা, আজ শেষবার, আর তোকে সাজতে বলবো না। আজ আমার বাল্য বন্ধু আসবে, ওর ছেলের জন্য তোকে পছন্দ করেছে। আংটি পরিয়ে দিয়ে যাবে।

মুন্নী ঘুরে তাকায়। বাবার চোখে চোখ রাখে। বাবার কষ্ট সে টের পায়। নিজের কষ্টের পাহাড় টপকিয়ে যেন বাবার যন্ত্রণাকে ছুঁয়ে দিলো তার চোখ।

কখন আসবেন উনি?

আজ বিকেলে। এখনো বেশ সময় হাতে আছে। বাইরে যেয়ো না। রেডি থেকো। কেমন!

আচ্ছা। ছোট্ট করে জবাব দেয় মুন্নী।

সন্ধ্যার লাল আভা পশ্চিমাকাশে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ছাদে দাঁড়িয়ে আছে মুন্নী, আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর করে শ্বাস নিলো সে। এতো বিশাল আকাশ। অথচ মনে হয় কতো ছোট। চারপাশ যেন ছোট হয়ে আসছে।

হঠাৎ নিচে ট্যাক্সির আওয়াজ পেলো ও।

হ্যাঁ, বাবার বন্ধু আসছে। সঙ্গে একজন কে যেন। নিচে নেমে আসে মুন্নী। আগেই সেজেছিল। নিজ রুমে এসে বসে থাকে।

বাসায় হৈ হৈ রব। রাত দশটা বেজে গেছে। কারো খাওয়ার কথা যেন মনে নেই। অথচ ন'টার মধ্যে ওরা খেয়ে নেয়।

ছেলের বাবা মেয়ে পছন্দ করেছে। আংটি পরিয়ে দিয়ে গেছে। মহা আনন্দ-সংবাদ। ছেলে কি করে, কি তার যোগ্যতা সেটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। যেন ছেলে হলেই হলো। ছেলের পছন্দ অপছন্দে ব্যাপারটিও যেন কেউ ভাবছে না।

রাত প্রায় এগারো। হঠাৎ বাবার কণ্ঠ ভেসে এলো, মুন্নী, এই মুন্নী।

শুয়েছিল মুন্নী, ঘুম আসেনি। বাবার ডাক শুনে উঠে বসে। তিনি দ্রুতই এসে ঢুকলেন রুমে, বেশ আনন্দিত চোখ, নিশ্চয় কোনো সুসংবাদ।

তোর টেলিফোন, লিটন ফোন করেছে। আমার বন্ধুর ছেলে লিটন, যার সঙ্গে তোর বিয়ে পাকা হলো, সেই লিটন। আয়! টেলিফোন ধর।

মুন্নী ওঠে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। টেলিফোন বাবার রুমে। বাবা রুমে নেই, সবাই বেরিয়ে গেছে, এখন সে একা।

রিসিভার হাতে তুলে নেয় মুন্নী। বেশ কতোক্ষণ চুপ থাকে। তারপর মৃদু স্বরেই বলে, হ্যালো, মুন্নী বলছি।

থ্যাংকস মুন্নী, টেলিফোন রিসিভ করলেন এজন্য ধন্যবাদ আপনাকে।

মুন্নী চুপ করে আছে।

শুনছেন। লিটনের উত্তেজিত জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, শুনছি। বলুন।

আমার খুব বিপদ, ব্যাপারটি আপনাকে জানানো উচিত। প্লিজ আপনি মন খারাপ করবেন না, শক্ত হয়ে শুনুন আমার কথা।

বলুন, শুনছি। মুন্নী ধীর স্থির। স্বরে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

আমি, আমার এক সিনিয়র মহিলা কলিগের সঙ্গে প্রেম ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমরা, মেয়েটি কালো। তবুও আমার খুব পছন্দের। কিন্তু যেহেতু সে বয়সে বড়, যেহেতু তারা গরীব সেজন্য বাবা কিছুতেই বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না। উল্টো আমাকে বুজিয়েছে আপনাকে বিয়ে করার জন্য। প্লিজ, আপনি এই বন্ধন মেনে নেবেন না। যে আংটিটি বাবা পরিয়েছে সেটিতে আমার মত নেই।

মুন্নী রিসিভার রেখে দিলো। কোনো অভিব্যক্তি নেই। ধীর পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো। বিছানায় এলিয়ে দেয় নিজেকে।

অনেকক্ষণ শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না। নিজের ভেতর অপরাধবোধ জাগছে, অতীতের ঘটনা মনে পড়ছে, ওই ছেলেটির আচরণ মনে পড়ছে। শরীরে যেন কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কালো হাত। এ পাপের কারণেই কি সব ব্যর্থতা আসছে জীবনে? অতীতকে তার নোংরা মনে হতে থাকে। অতীতের কদর্য গন্ধ যেন বর্তমানেও এসে নাকে ঢুকছে। সব কিছুতেই সে ব্যর্থ, আলোকিত ঘর-বাড়ি যেন অর্থহীন। ভবিষ্যতেরও কোনো মূল্য নেই। অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দিশেহীন ভবিষ্যতে গিয়ে কি লাভ! মরে যাওয়াই যেন উত্তম। বেঁচে থাকার কিইবা মূল্য আছে?

ভাবতে থাকে সে, ভাবতে ভাবতে এক সময়, অনেক পর ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর রাতের অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ছটফট করতে থাকে সে। চোখ মেলে অন্ধকারে বসে থাকে কতোক্ষণ। আবার শুয়ে পড়ে, না ঘুম আসছে না।

সবাই উঠে পড়েছে, চনমনে আনন্দিত মন নিয়ে যেন কলকল করছে। সকাল আটটায় ডাইনিং টেবিলে বসেছে সবাই। নাস্তা করতে হবে। না, মুন্নী এলো না। খেতে ইচ্ছে করছে না। একদম ক্ষিধে নেই। ক্লান্তিতে জড়িয়ে যাচ্ছে হাত, পা। উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। ভেতর থেকে কোনো তাগিদও পাচ্ছে না। অশান্তিতে ছেয়ে গেছে মন। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে এক সময় মরে যাওয়ার তীব্রতা জাগে তার। কোথা থেকে আসছে এই ইচ্ছের স্রোত, জানে না সে। অপ্রতিরোধ্য এই বেপরোয়া শক্তির কাছে এখন নতজানু। পরিকল্পনা ঢোকে মাথায়, বাসা থেকে বের হবে। ফার্মেসিতে যাবে। ঘুমের বড়ি জোগাড় করবে– সব একসঙ্গে খেয়ে চলে যাবে মৃত্যুর কালো জগতে। এ জগতকেও তার কালোই মনে হয়। মনে হয় আলো নেই, আলো নেই ..... কোথাও আলো নেই ....

ব্যাখ্যা ঃ

মুন্নী মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হয়েছে। কেস স্টাডি থেকে এই তথ্য আসছে যে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে মুন্নী। মৃত্যু বা আত্মহননের পরিকল্পনা করছে সে। এটি একটি মানসিক রোগ। চিকিৎসায় সারিয়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের পরিস্থিতি গড়াতে থাকলে মুন্নী আত্মহত্যা করার পথে এগিয়ে যাবে।

আমাদের রয়েছে সচেতনতার অভাব, তাই সঠিক সময়ে পরিবারের কেউ এই অস্বাভাবিক আচরণ বা চিন্তার খবর পাই না।

সমাজে যে আত্মহননের খবর আমরা পত্রিকায় পাই, ষাট শতাংশ ডিপ্রেসিভ ডিজওর্ডারে আক্রান্ত হয়ে সুইসাইডের পথ বেছে নেয়।

সবার সচেতনতা বাড়াতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানসিক চিকিৎসা সেবা নেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে মনোচিকিৎসক বা সাইকিয়াটিস্টরা কেবল উন্মাদগ্রস্ত রোগীরই চিকিৎসা করেন না। আরো অনেক দেগহত সমস্যারও চিকিৎসা করেন, যার উৎপত্তিস্থল মন। তাই মনোচিকিৎসকের নিকট হাজির হতে লজ্জার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। শুধু প্রয়োজন সামাজিক এই ভ্রান্ত দেয়ালটির ভিত উপড়ে দেয়া, মন ও মনের সমস্যার ব্যাপারে সজাগ হওয়ার বিকল্প কিছু নেই।

হাসির রসায়ন ঃ হাসির ম্যাজিক

হাসি মুখের জয় সর্বত্র।

কখনো আমরা মুচকি হাসি, কখনো হাসি উচ্চস্বরে। হো হো করে হাসির মাধ্যমে দেহের ভেতর ঘটে যায় বিপ্লব। বাইরেও পরিবর্তন ঘটে। রাসায়নিক উপাদান এবং পেশীর যৌথ ক্রিয়া মনের স্তরে স্তরে উৎফুল্লতা জাগিয়ে তোলে। ঈষৎ হাসি কিংবা অট্টহাসি মূলত প্রফুল্ল মনের চিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমাদের অভিব্যক্তিতে তখন বয়ে যায় অফুরন্ত আনন্দধারা। চোখ-মুখ ঝলসে ওঠে ভেতরগত উচ্ছ্বাস আর খুশির জোয়ারে।

মুচকি হাসি ঃ ঈষৎ হাসি

ঈষৎ হাসিতে মুখের পেশীতে ভাঁজ পড়ে। ফলে পেশীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া রক্তনালীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যায় ম্যাসাজ। এ সময় রক্ত নালী উদ্দীপ্ত হয়, দ্রুত গতি লাভ করে প্রবাহমান রক্তধারা। খুব সহজেই রক্ত পৌছে যায় ব্রেইনে। মস্তিষ্কে তখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌছে যায়।

প্রফুল্ল মনে স্ট্রেস কমে যায়। কারণ এসময়ে নরএড্রিনালিন ও কর্টিজল হরমোনের নিঃসরণ ঘটে সঠিক মাত্রায়। এ দুটি হরমোন স্ট্রেস নামিয়ে আনে। একই সঙ্গে এন্ডরফিনস নামক সুখী হরমোন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দেহমনে জেগে ওঠে ঐশ্বরিক এক প্রশান্তি।

বিভিন্ন কারণে আমরা হাসি, প্রফুল্ল থাকি। মূলত এটি একটি বন্ধনের ব্যাপার। সামাজিক শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুকাল থেকেই বৈশিষ্ট্যটি নানা আঙ্গিক থেকে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে।

শিশুরা এতোই দুর্বল থাকে যে দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী মাকে আঁকড়ে থাকতে পারে না। মা নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। কাঁদলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ঠিকই। মাও নানা ছলে ভুলিয়ে শিশুকে শান্ত করেন, আবার হয়ত ডুবে যান নিজের কাজে। ডেসমন্ড মরিসের গবেষণা থেকে দেখা যায়, শিশুর মুখে ঈষৎ হাসি বা খলখল হাসি ফুটে থাকলে মা শিশুর সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে পারে না। মায়ের মনে শিশুর এই হাসি ঐশ্বরিক এক মায়ার ধারা

উদ্দীপ্ত করে তোলে। ফলে নিজের অজান্তেই মা বেশি সময় দেন শিশুকে। বেশি বেশি সময় কোলে তুলে তাকে আদরে সোহাগে ভাসিয়ে দেন। এই বন্ধন যেন প্রকৃতিরই এক গোপন ধারা। হাসির মাধ্যমেই শিশু মায়ের মনে গড়ে তোলে ভিন্ন আসন। সেই আসন থেকে শিশুকে নামিয়ে রাখতে কষ্ট হয় মায়ের।

যতোই বড়ো হতে থাকি, নানা কারণে ঈষৎ হাসির বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে আসন গেঁড়ে বসে। সহানুভূতি দেখানোর সময় আমরা স্বল্প হাসি, সাদর সম্ভাষণ করার সময় হাসি, প্রশংসা বা ক্ষমা চাওয়ার সময়ও ঈষৎ হাসি। এমনটি ঘটে আমাদের মাঝে অপরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠার কারণে।

অনেক সময় প্রতিক্রিয়া জানানোর ধরনটিই বুঝতে পারি না আমরা। না বুঝেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৃদু হেসে উঠি। যখন কেউ আমাদের কাজের দক্ষতা বা গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনও ম্লান হাসি। এমনও দেখা গেছে, প্রিয় কারো মৃত্যু সংবাদেও আমরা না বোধক মনোভাব নিয়ে হালকা হেসে উঠি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে নিজেকে ধাতস্থ করার সময় খুঁজে নেয়া। যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্রেইন থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর সিগনাল না আসে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এমনটি ঘটতেই পারে।

তোষণকারীদেরও মৃদু হাসতে হয়। মৃদু হাসি হচ্ছে এক ধরনের তোষণের ভঙ্গিমা। আবার ঈষৎ হাসির মাধ্যমে অন্যকে বোঝানো যায় আমরা বন্ধু, শত্রু নই। ডিপ্রেশনের বিপক্ষেও এ ধরনের হাসির গুরুত্ব অনেক। এ হাসি ডিপ্রেশন মোকাবেলায় গোপন অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

ব্যায়াম, যৌনতা কিংবা উচ্চ হাসির পর যে ধরনের প্রফুল্লতা মনে আসে ঠিক তেমন অনুভূতিও আনা যায় ঈষৎ হাসির মাধ্যমে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, নিজের মাঝে যদি সব সময় মৃদু হাসি হাসি ভাব ধরে রাখা যায়, সুখও সহজে করায়ত্ত করা সম্ভব হয়। সব সময় যাদের মাঝে হাসি বজায় থাকে তাদের দেখতেও লাগে দারুণ অ্যাট্রাকটিভ।

উচ্চ হাসি ঃ প্রাণ খোলা হাসি

উচ্চ হাসিতে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়, রক্ত সঞ্চালন প্রবাহ গতিময়তা লাভ করে। স্কেলিটাল পেশী এ সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে, স্নায়ুরেখার উদ্দীপনা ঘটে। একই সঙ্গে দেহে ঢোকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। ফুসফুসের আনাচে-কানাচে যে অবশিষ্ট দূষিত বাতাস থাকে, হাসির দাপটে তা বেরিয়ে যায়।

ঈষৎ হাসি শরীরের প্রতিরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলেও, উচ্চ হাসি হচ্ছে জটিল একটি প্রক্রিয়া।

বিজ্ঞানীরা উচ্চ হাসির সাতটি কারণ শনাক্ত করেছেন। নিচে কারণগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

১. মজাদার গল্প, ২. সুড়সুড়ি ৩. জয়ের আনন্দ ৪. অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রাপ্তিতে বিস্ময় ৫. ভেতরগত প্রফুল্লময়তা ৬. লজ্জা কিংবা চিন্তা ঢাকা ৭. অসংগত অসামঞ্জস্য প্রেক্ষাপট।

এছাড়াও রয়েছে বিদ্রূপাত্মক চাপা হাসি, টেনশন চাপা দেওয়ার কৌশলপূর্ণ হাসি, নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য মনে মনে হাসা, অস্বস্তিকর অবস্থা চাপা দেওয়ার জন্য মুখ চেপে হাসা।

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য হাসির সকল অনুষঙ্গ মানুষের জন্য প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু কয়েকটি মানসিক রোগীদের মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু হাসি লক্ষনীয়। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মাঝে মুডের সঙ্গে বেমানান হাসি দেখা যায়, রোগের ডায়াগনোসিসের জন্য এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হাসিটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। ম্যানিক রোগীদের মনে প্রফুল্লতা বিরাজ করে। মনের মাঝে বেপরোয়া খুশি খুশি ভাব জেগে উঠতে পারে, মাঝেমাঝে অট্টহাসিতেও ফেটে পড়তে পারে তারা। নিউরোট্রান্সমিটর সেরোটোনিন-এর মাত্রা বেড়ে যায় ম্যানিক রোগীদের। ফলে উল্লাস জেগে থাকে তাদের মাঝে, অনর্গল কথা বলতে থাকে এইসব রোগীরা। বিজ্ঞানীরা পূর্বে মনে করতেন সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার কৌশল হচ্ছে হাসির আড়ালে প্রকৃত সত্য চেপে রাখা।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সুনির্দিষ্ট বাধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকে হাসতে হয়। হাসি আসছে বেপরোয়াভাবে, নিয়ন্ত্রণ করি সেই হাসি। অন্যকে বাধাগ্রস্ত বা ঝামেলায় ফেলতে চাই না আমরা। কদাচিৎই যেন নিজের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসতে পারি। চাহিদা মোতাবেক অনেক সময় হাসতে হয় বলে সমস্যায়ও পড়তে হয় অনেককে। কিন্তু ইতিবাচক মূল্যায়ন বিবেচনা করে দেহ ও মনের সুস্থতার জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই হাসার জন্য ক্লাব গড়ে উঠেছে। হো হো করে উচ্চ স্বরে প্রাণ খোলা হাসার পরিবেশ তৈরি করা হয় ওই সব ক্লাবে।

প্রাতঃভ্রমণের মতো অতি ভোরে সদস্যরা হাজির হয় ক্লাবে, পরিবেশই স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উদ্বুদ্ধ করে তাদের। এভাবেই তারা শুরু করে দিনের যাত্রা।

দুঃখের বিষয় এই যে, যতোই বড় হতে থাকি ততোই নিয়ন্ত্রিত গন্ডির মাঝে আটকে যেতে থাকি আমরা। ছয় বছর বয়সে একটি শিশু দিনে প্রায় ৩০০ বার হাসে। বয়স কালে এই সংখ্যা নেমে আসে সাতচল্লিশে। বিষণ্নতার সময় ছয়বার হাসতে পারাও যেন দুরূহ ব্যাপার।

হাসির সময় দেহের উপরের অংশ তথা কাঁধ, বাহু, ডায়াপ্রাম, পেট এমনকি পায়ের দিকে রক্ত সংবহন ক্ষমতা বেড়ে যায়। গবেষকরা মনে করেন ১০০-২০০ বার হাসা দশ মিনিটের জগিং-এর চেয়েও উত্তম। আনন্দপূর্ণ হাসির ইতিবাচক ফল দশ মিনিটের সীমাবদ্ধতাকেও ছাড়িয়ে যায়। উচ্চ হাসিতে পেটের পেশী উদ্দীপ্ত হয়। ফলে পেশী রিলাক্স হয়, উচ্চরক্তচাপ কমে আসে, রক্ত সঞ্চালন উন্নততর হয়। পরিপাকতন্ত্রের কাজের ক্ষমতাও বাড়ে, হজম ক্রিয়া থাকে স্বাভাবিক।

ইতিবাচক ফলাফল প্রায় সাড়া দিনই বজায় থাকে। ভেতরে ভেতরে যে উষ্ণ আরক্ত অনুভূতি জাগে, সেটি ঘটে থাকে এন্ডরফিন হরমোন নিঃসরণের কারণে।

এন্ডরফিনকে বলা হয় দেহের পেইন কিলার বা ব্যথা নাশক হরমোন। প্রশান্তিময় একটি পরশ দেহের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে এন্ডরফিনসের কারণে।

উচ্চ হাসির মাধ্যমে রোগশোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। এটি স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের উচ্চমাত্রা কমিয়ে আনে। মনে রাখা দরকার কর্টিসল হরমোনের স্বাভাবিকমাত্রা দেহের জন্য অতি প্রয়োজন, কিন্তু উচ্চমাত্রা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দেয়াল ভেঙে দেয়। হাসির মাধ্যমে রক্তের শ্বেত কণিকা-লিম্পোসাইট এবং এন্ডিবডির কাজের ক্ষিপ্রতা বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে ইদানিং গবেষণালব্ধ এসব জ্ঞানকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্যবস্থাপত্রে রোগীর বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়, উচ্চ হাসিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মেডিসিন।

মনে করুন, জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কারণে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে আছেন আপনি। নো প্রবলেম।

আরাম করে চেয়ারে বসুন। 'রকিং চেয়ার' হলে ভালো হয়। সামনে পেছনে দুলতে থাকুন। হো হো করে ইচ্ছেকৃতভাবে হাসতে শুরু করুন। আপনার পেটের পেশী উদ্দীপনার মাধ্যমে ভেতরটাকে এসময় নাড়িয়ে দেবে। মাথা এবং বাহু পেছনের দিকে ছড়িয়ে দিন। ঘণ্টাধ্বনির নিনাদের মতো এবার হাসতে থাকুন।

হাসির দাপটে এন্ডরফিন হরমোনের নিঃসরণ ঘটবে, মানসিক চাপের কারণে নিঃসৃত উচ্চমাত্রার কর্টিসল কমে আসবে, মোহময় আবেশে মন জুড়িয়ে যাবে। দেহে নেমে আসবে প্রশান্তি। একদিনের চর্চা নয়। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে দেহ-মন কে সজীব রাখার এর চেয়ে সহজ উপায় আর কিইবা হতে পারে। মনে রাখবেন, এ ধরনের পরিচর্যার সময় চারপাশের অনেকেই কটাক্ষ করতে পারে, ব্যাঙ্গাত্মক হাসতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। সকল কৌতুক পরিহার করে আপনার কাজ চালিয়ে যান। ইতিবাচক ফলাফল আসতে বাধ্য।

বৃষ্টির ধারায় ভেজা মন, ভেজা দেহ কেন ভিজতে ইচ্ছে করে

ভোর রাতেই জেগে উঠেছে আশিক।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মেঘ ডাকছে। গতদিনের ঝলসানো তাপ কমে গেছে। জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে এখন। মৃদু হাওয়ায় চুল উড়ছে।

আকাশে ঘন মেঘ, মেঘের গর্জন। এক ধরনের ভেজা তরল অন্ধকারের ছায়ায় যেন ঘুমিয়ে আছে দৃশ্যমান ঢাকা শহর। শীতল আকাশের বুক চিরে কালো মেঘের পাহাড় যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে।

আশিকের বুকের ভেতর জমেছিল এক কষ্ট, জমাট কষ্ট। কষ্টের চাকতি কি গলে যাচ্ছে? এমন প্রশান্তি আসছে কোথেকে?

ঝিরঝির কোমল বাতাস উদোম শরীরে আদর বুলিয়ে দিচ্ছে। স্পর্শ টের পাচ্ছে সে। চুলে স্পর্শ, মুখে স্পর্শ, গলায় স্পর্শ, বুকে স্পর্শ, সারা শরীরে এক মায়াবি তরুণী যেন আদর ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মনটি হালকা হতে থাকে। মেঘের গর্জন কি তবে থামিয়ে দিচ্ছে বুকের গর্জন, হাহাকার?

হঠাৎ শুরু হয়েছে বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে শরীরে। জানালার গ্রিলের সঙ্গে বুক সেঁটে রেখেছে। ছিটানো জলকণায় ভিজে উঠছে দেহ, নরম হচ্ছে মন।

উহ! শান্তি। শান্তি।

এমন সুখের স্বাদ কি পায় কখনো কেউ এ জীবনে?

চোখ বুঝে আছে আশিক। দুই হাতে আঁকড়ে রেখেছে গ্রিল। একমুঠো শান্তির জন্য এভাবেই যেন থমকে থাকা যায় অনন্তকাল।

ঝমঝম বৃষ্টির ধারা কমে এসেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে এখন। ভোরের তরল আলোয় ভরে উঠেছে চারদিক।

পশ্চিমে আজিজ সুপার মার্কেট, এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগনাল পর্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণে জাদুঘর, টিএসসির সড়ক দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় জন মানব শূন্য। পূর্বে বারডেম হাসপাতাল, শিশুপার্ক। বিএসএমএমইউ (পিজি হাসপাতাল)-এর সাত তলা ভবন থেকে

ঢাকা শহরের বড় বড় সব বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে। ঘুমাচ্ছন্ন ঢাকা নগরী জেগে উঠেছে। বৃষ্টিস্নাত শুদ্ধ সকালের রাজপথ যেন ডাকছে আশিককে।

রাস্তায় নেমে এসেছে সে। বৃষ্টির ধারা বেড়ে গেছে আবার। ঝম ঝম বৃষ্টির ফোটা আছড়ে পড়ছে। আশিকের পা উদোম। পরনে কালো গেঞ্জি, কালো ট্রাউজার। ভিজছে সে এখন। দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে টিএসসির দিকে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য। হঠাৎ হঠাৎ দুই একটি রিকশা ছুটে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

টিএসসির সড়ক দ্বীপের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালো।

রোকেয়া হলের গেইট দিয়ে তিনটি তরুণী বেরুচ্ছে। এতো সকালেই কি হলের গেইট খোলা থাকে? কিভাবে বের হলো ওরা?

ইই চই করছে, ভিজছে ওরা। ভিজতে ভিজতে সড়ক দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে। তরুণী তিনটি দু'হাত প্রসারিত করছে। চক্কর খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝাপটা দিয়ে মুখের দিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। ওদের কলকল ধ্বনিতে যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে পুরো প্রাঙ্গণ । ভেজা ড্রেস শরীরের সঙ্গে ঝাপটে আছে। এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর। ওরা কেবল বৃষ্টির ঝাপটা নিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজতেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে ওরা।

ঝরঝরে বৃষ্টির ফোঁটা কি ওদের এমন মাতিয়ে রেখেছে? অনুভাবক স্নায়ুতন্ত্রের (sensory nervous system) বিন্যাসই কি তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌছে দিচ্ছে কোনো এক আনন্দময়ী গোপন বার্তা? সেই বার্তাই কি অবচেতন দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঐশ্বরিক কোনো মৌলিক সুধা?

বৃষ্টি কমে গেছে। ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে আশিক। মেয়ে তিনটিও ফিরে যাচ্ছে হলের দিকে। ওদের উন্মাতাল ভঙিটিও থেমে গেছে।

মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো কিলকিল করে ওঠে। সে নিজে কেন বৃষ্টিতে ভিজতে বেরিয়েছে? তরুণীগুলো কেন এসেছে? তবে কি আদিম শেকড়ে লুকিয়ে আছে একটি গোপন গিঁট? বৃষ্টির ছোঁয়া পাওয়ার জন্যই কি একই তালে টান পড়তে পারে সেই গিঁটে? এ কারণেই কি তরুণ-তরুণীদের বৃষ্টিতে ভেজার প্রবণতা বেশি?

হ্যাঁ, হতে পারে এমনটি। একটি ব্যাখ্যা এভাবে দাঁড় করানো যায়- বৃষ্টির ধারা শরীরের নানান স্তরে হানা দেয়। মূলত ত্বকের মাধ্যমে সব সেনসেশন পৌছে যায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে। অনেকের মাঝে শীর্ষতম একটি পজিটিভ অনুভূতির জোয়ার জাগতে পারে। দেখা যায়, উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীদের বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা বেশি।

কারণ তাদের ত্বকের সংবেদনশীলতা থাকে অনেক বেশি। বিবাহিতদের মাঝে এই আবেদন ক্রমেই কমে যায়। অবচেতন মন থেকেই হয়তো কেউ বৃষ্টিতে ভিজে নিজের ভেতর জমে থাকা মৌলিক ইনস্টিংক্ট-এর ড্রাইভ থেকে সন্তুষ্টি খুঁজে নেয় এভাবেই।

এই সুন্দরতম ইচ্ছের পেছনে শিক্ষণেরও (learning) ভূমিকা রয়েছে। তরুণীদের একজনের দেখাদেখি অন্যের মনের ভেতরও আগ্রহের স্রোত জাগতে পারে। পরিবেশের ভূমিকাও কম না। সব পরিবেশে সবার ভেতর আগ্রহ সব সময় নাও আসতে পারে।

নাটক, গল্প উপন্যাসের অনেক নায়ক-নায়িকা বৃষ্টিতে ভিজে জলকেলি করে থাকে। সম্মোহনী ধারা সৃষ্টি করতে পারে এমন ঔপন্যাসিকের বইয়ের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তরুণ-তরুণীরা অনেক সময় একাত্ম হয়ে যায়। ফলে নিজেদেরকে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে আনন্দ কুড়িয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

মনের দ্বন্দ্ব, মনের হতাশা ঃ প্রশান্তিময় মন পাওয়া কি সম্ভব?

সূর্য এখনো ওঠেনি। ভোরের নরম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। নারী-পুরুষ দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। হাঁটছে কেবল, হেঁটেই চলেছে। কেউ কেউ ঘামছে। কারো মুখ যেন বন্ধ নেই, প্রায় সবার মুখেই কথার খই ফুটছে। হাত এবং পায়ের গতির সঙ্গে সমান তালে চলছে ঠোঁটের গতি।

অবিশ্রান্ত শব্দমালায় অসঙ্গতি নেই, সবার কথার যুক্তি অকাট্য। চমকপ্রদ। মনের স্বাচ্ছন্দ্য গতিই কি যুক্তি টেনে আনে ভেতর থেকে। এতো যুক্তি এলো কোত্থেকে।

শাহরুখ অবাক হয়। নিজের ভেতর থেকে যুক্তিবাদ ব্যক্তিত্বের এক নবজাগরণ যেন জোয়ারের উপচে ওঠা ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে। হাঁটতে হাঁটতে ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে সে। যুক্তিবাদী মনের ভেতর চক্রাকারে ঘুরছে কেবল একটি জটিলতা। হাঁটা থামিয়ে জটিলতার তেজ অনুভব করার চেষ্টা করলো। নাহ্। সত্যিই জটিল। দুটো চাকরির অফার পেয়েছে, প্রায় একই সঙ্গে। আজই যোগ দিতে হবে কাজে। কোনটিতে যাবে? দুটোই তো আকর্ষণীয়। আনন্দ তো বটেই, আনন্দের সঙ্গে মিশে গেছে চিন্তা। চিন্তার শেষ নেই। সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।

রুমানার কাছে যাওয়া দরকার। রুমানার মতামতের দাম অমূল্য। রুমানা খুব খুশি হবে। এতোদিন দুর্বিসহ জ্বালা ভোগ করেছে। একটি বেকার ছেলের জন্য দুর্বার সাহস নিয়ে প্রতিক্ষা করেছে রুমানা। নানা জায়গা থেকে আগত বিয়ের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর মতামত না নিয়ে কি পারা যায়।

দ্বন্দ্বের উৎস

পছন্দ থেকে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি।

শাহরুখ এতোদিন বেকার ছিল। বেকারত্বের দহন থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। তবে মুক্তির সূচনাতেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ চাকরি। সিদ্ধান্তহীনতার এটা মূখ্য কারণ। নিজের ভেতর সৃষ্ট দোদুল্যমান অবস্থা থেকে মুক্তি চায় সে। তাই যেতে হচ্ছে রুমানার কাছে। রুমানা তার প্রেমিকা। রুমানা ছাড়া কে পারে সঠিক সিদ্ধান্তটি ধরিয়ে দিতে।

প্রতিটি মানুষের ভেতর এ ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে মানুষ প্রিয়জনের পরামর্শ চায়। দ্বন্দ্বের লাঘব হওয়া দরকার (resolution of conflict)। লাঘব করার প্রবৃত্তি মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। একই তাড়নায় এখন শাহরুখ আক্রান্ত ।

যদি প্রতিনিয়তই মানুষের ভেতর ছোটখাটো দ্বন্দ্ব জাগ্রত হয়, লাঘব হওয়ার পথ না পায়, তবে আচরণগত বৈকল্য আসা খুবই স্বাভাবিক।

দ্বন্দ্বের প্রকারভেদ

চার ধরনের দ্বন্দ্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে ঃ

দুটি নির্দিষ্ট আরাধ্য লক্ষ্যমাত্রা থাকবে। তবে কেবল একটি লক্ষ্যমাত্রা জয় করা যাবে। দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা প্রতিনিয়তই। যেমন হয়েছে শাহরুখ। এটিকে বলে আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব (approach-approach conflict)।

দুটি অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা সামনে। একটিকেই মূল লক্ষ্য হিসাবে নিতে হবে। কোনটিতে পৌঁছতে হবে? কোনোটির প্রতি আগ্রহ নেই। এই ধরনের সৃষ্ট দ্বন্দ্বকে বলে বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব (avoidance-avoidance conflict)।

প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় আমাদেরকে ঘৃণ্যতম কোনো কাজ বেছে নিতে হয়। মন চাইছে না কাজটি করতে, উপায় নেই। করতে হবে এমন একটি কাজ। এ ধরনের দ্বন্দ্বের কারণে নিজেকে গুঁটিয়ে নেওয়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়। মানসিকভাবে কাজটির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় না, একাগ্রতা থাকে না, অলসতা গ্রাস করে, কাজে ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। এ অবস্থাকে বলে মানসিকভাবে নিজেকে গুঁটিয়ে নেওয়া (psychological withdrawal)।

শারীরিকভাবেও নিজেকে অনেক সময় ফিরিয়ে নেই আমরা। ঘর থেকে বের হলাম লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশ্যে। গেলাম না সেখানে। অন্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। এ অবস্থাকে বলে physical withdrawal।

একই জনকে ভালোবাসি, ঘৃণাও করি। যেতে চাই দক্ষিণে, ভয় করছে যেতে। কারণও স্পষ্ট। একজনের এক বৈশিষ্ট্য ভালোলাগতে পারে, ভালোলাগা থেকে আসতে পারে ভালোবাসা। অন্য বৈশিষ্ট্য খারাপ লাগতে পারে, খারাপ লাগা থেকে আসতে পারে ঘৃণা, পলায়নপর মনোবৃত্তি।

ফুটে থাকা পদ্মফুল লোভনীয়, পেতে ইচ্ছে করছে হাতে। কিন্তু কাদা মাড়ানোর আগ্রহ নেই, ঘৃণা করছে পা রাখতে কাদায়। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই দ্বন্দ্ব আসছে। এ ধরনের দ্বন্দ্বকে বলে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব (approach-avoidance conflict)।

জিল্লুর বেড়ানোর খুব শখ। গ্রীষ্মের ছুটি সামনে। বন্ধুরা ঠিক করেছে দল বেঁধে কক্সবাজার-টেকনাফ-সেন্টমার্টিন ঘুরে আসবে।

বেড়ানোর ইচ্ছে তীব্রতর হচ্ছে। সুযোগটি হাত ছাড়া করা যায় না। জিল্লু মেধাবী ছাত্র। ক্লাসে প্রথম দ্বিতীয় হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। শাহিন যাবে কিনা জানে না সে। ওর কমপিটিশন শাহিনের সঙ্গে। ছুটির পরপরই পরীক্ষা। পরীক্ষা সামনে রেখে কি যাওয়া উচিত।

মাথার ভিতর কি পরীক্ষা নামক পোকাটি কিলবিল করবে না? আনন্দের ভ্রমণ কি বিষাদময় মনে হবে না? না থাক। ঘরেই বসে থাকবে জিল্লু, পড়বে। প্রথম হতেই হবে তাকে। ভ্রমণের আনন্দ বাতিল করা যায়, পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার চেষ্টা তো বাতিল করা উচিত নয়। কিন্তু ঘরে বসে কি এসময় পড়া হবে ?

কল্পনায় কি সেন্টমার্টিন দ্বীপটি চোখের সামনে ভেসে থাকবে না। বন্ধুদের আনন্দ কি তার পড়ার ইচ্ছেকে চাপিয়ে রাখবে না? আহা। কি করবে সে এখন। ভ্রমণের ভেতর আছে আনন্দ, আছে দুশ্চিন্তার ব্যাপারও। ঘরে বসে থাকার মধ্যেও আছে পজিটিভ সাইড, নেগেটিভ দিকও রয়েছে। বড়ই ঝামেলার ব্যাপার। সত্যিই তাই। জিল্লু ঝামেলায় পড়েছে। কারণ তার ভেতর দ্বৈত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বের (double approach-avoidance conflict) সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বন্দ্ব ও অসচেতনতা

দৈনন্দিন জীবনে এভাবেই আমরা শাহরুখের মতো পরিস্থিতির শিকার হই, জিল্লুর মতো দোদুল্যমান সংকটের মুখোমুখি হই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, নানা ধরনের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেও সব কিছুর ব্যাপারেই ততোটা সচেতন নই আমরা।

অধিকাংশ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যায় আমাদের অজান্তেই, অসচেতনভাবে। স্বাভাবিক আচরণের কারণে অনেক দ্বন্দ্ব থেকে সহজে মুক্তি পেয়ে যাই আমরা।

আবার এও বলা যায়, ব্যক্তিত্বময় আচরণের মাধ্যমেও সহজে এবং দ্রুত অনেক দ্বন্দ্বের লাঘব করা যায়, লাঘব হওয়ার জন্য আচরণগত চমৎকার প্রকৃতিই কাম্য।

দ্বন্দ্ব ও পরিণাম

পরিস্থিতি যদি এমন হয়, দ্বন্দ্ব লাঘব হচ্ছে না, ক্রমশ জটিল হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জটিলতর হবে মনের গতি-প্রকৃতি। এমন অবস্থায় দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম (autonomic nervous system) সচল হয়ে ওঠে। টেনশনজাত জটিলতার নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেড়ে যাবে। ছোটোখাট আচরণগত বৈকল্য বা সমস্যা এভাবে শুরু হয়। এ সময় অনিদ্রা হতে পারে, বুক ধরফড় করতে পারে। নার্ভাস সিস্টেমের অনুভাবক অংশ (sensory portion) গুরুত্বহীন উত্তেজনায়ও বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, শিরার স্পন্দন বেড়ে যাবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করতে পারে, এমনকি আবেগঘন অনুভূতির কারণে বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে, যে কেউই। এভাবেই দ্বন্দ্ব থেকে হতাশায় নিমজ্জিত হতে পারে মানুষ।

হতাশা

ড্রয়িং রুমে বসে খেলছে সামনুন। ছোট্ট শিশু সে, হঠাৎ খেলা থামিয়ে দেয়। আঙুল চোষা শুরু করে। স্বস্তি পাচ্ছে না, কান্না শুরু করে। সামনুনের মা ছুটে আসেন। অস্থির হয়ে পড়েন তিনি। কাঁদছে কেন ছেলেটি ?

কতোক্ষণ আদর করেন, কান্না থামছে না, কারণও বুঝতে পারছেন না। 'কেন' প্রশ্নটি তাকে তাড়িত করে।

হঠাৎ খেয়াল হলো, অনেকক্ষণ হয়েছে সামনুনকে কিছুই খাওয়ানো হয়নি। ছুটে যান রান্না ঘরে। কাঁদছে সে, কাঁদুক। দ্রুততার সঙ্গে স্যুপের বাটিটি হাতে নিলেন। আগেই তৈরি করেছেন, রেখেছিলেন ফ্রিজে। হালকা গরম করে নিলেন কেবল।

সামনুন এখন স্যুপ খাচ্ছে, কান্না থেমে যায় ওর, শান্তি পেয়েছে, শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

- সামনুনের ক্ষিধা পেয়েছিল, ক্ষুধা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ড্রাইভ (drive) ।
- ড্রাইভের কারণেই কান্নার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। অর্থাৎ কান্নার মোটিভ (motive) হচ্ছে ক্ষুধা।
- সে খেলা বন্ধ করে দিয়েছিল, বন্ধ করে কেঁদেছে, আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়।
- যতক্ষণ স্যুপ পায়নি ততক্ষণ কেঁদেছে, স্যুপ বা খাদ্য ছিল তার লক্ষ্যবস্তু।
- তৃপ্তি সহকারে স্যুপ খেয়েছে সে।
- ক্ষুধাবৃত্তি নিবারণের কারণেই কান্না থেমে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে সামনুন।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে মানব মনের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিগত ইচ্ছার জন্ম, বিস্তার বা তাড়না এবং সফল পরিণতির বৈজ্ঞানিক সূত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু হাজারো ধরনের চাহিদা লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবমান পথে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। অভীষ্ট লক্ষ্যভেদ সম্ভব নাও হতে পারে। তখনই ব্যর্থতা বা হতাশার গোলক ধাঁধায় আটকে যায় মানুষ। শুরু হয়ে যায় নানা অশান্তি।

মনের ভেতর তখন জমে ওঠতে পারে টেনশন, নানাবিধ চাপ, দ্রোহ। বিপত্তি সব সময় মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না, শুরু হয়ে যেতে পারে আচরণগত জটিলতা।

হতাশার উৎস

১. বাহ্যিক কারণ

মৌরি বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতালে। সে থাকে চট্টগ্রামে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে সঠিক সময়ে জানানো হয়েছিল, কার্ড সে পায়নি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, চোখে পড়েনি। আজ সকাল ৭ টায় সে খবর পেয়েছে, মাথাটি ঘুরে ওঠে। কিভাবে যাবে ঢাকায়। এতো অল্প সময়ে কি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব। যদি বিমানের টিকেট পাওয়া যায়, তবেই সম্ভব। সকালের ফ্লাইট ৯টায়। টেলিফোন করে জরুরীভাবে একটি টিকেট পাওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া গেল। ছুটে যায় সে বাবার কাছে।

বাবা, টাকা দাও দু'হাজার, বিমান অফিসে যাবো। এক্ষুণি টিকেট কাটতে হবে। একবারেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে।

এতো টাকা এখন কোথায় পাবো মা। বাবার কণ্ঠে অসহায়ত্ব।

ওর বাবার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, চারদিকে ধার-কর্য করে রেখেছেন। এতো দ্রুত তার পক্ষে দু'হাজার টাকা ম্যানেজ করা অসম্ভব। মৌরি ছুটে যায় মামার কাছে। টাকা দাও মামা। দ্রুত। ঘটনা বর্ণনা করে সে মামার নিকট। মামা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন টাকার জন্য, কারণ এতো টাকা নগদ এ মুহূর্তে তার হাতে নেই।

মৌরি হতাশ হয়ে পড়ে। ঢাকা যেতে পারলেই ওর হতাশা দূর হয়ে যাবে। আপাতত টাকা যোগাড় করাই প্রধান ইস্যু। টাকাটাই এখন দৃশ্যমান সমস্যা। প্রচেষ্টা থাকলে এ সমস্যাটি সমাধান সম্ভব।

বাহ্যিক এ সমস্যাটির কারণেই মৌরি এখন নতজানু। কাঁদছে।

● কিছুদিন ধরে খরা চলছে। ঠাঠা রোদ। ভীষণ গরম। মাঠঘাট ফেটে চৌচির। এক ফোঁটা বৃষ্টির লক্ষণ নেই। কৃষকরা চাষাবাদ করতে পারছে না, অথচ মৌসুম চলে যাচ্ছে। কৃত্রিম পানির সেচের ব্যবস্থা নেই সবার। সবাই ভাগ্যের ওপর ভর করেছে, প্রকৃতির দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে, কখন আসবে বৃষ্টি, কখন লাঙ্গল নামবে মাঠে।

প্রচেষ্টা এখানে অসহায়। স্থবির। নিয়তির পরিহাস, বৃষ্টির অভাব, চাষাবাদের ব্যর্থতা, সামনে দুর্ভিক্ষের অশনি ছায়া, কৃষকরা দৃশ্যমান বৃষ্টির অপেক্ষায় দিন গোণে, হতাশায় ডুবে যায়।

● সামাজিক বিপত্তি এবং ব্যারিকেড থেকেও হতাশা আসতে পারে। রক্ষণশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা কড়া আদেশ নিষেধের মাঝে বড় হয়ে ওঠে। ফলে অনেক ইচ্ছেই অপূর্ণ থেকে যায়। অপূর্ণ ইচ্ছের ফাটল দিয়ে হতাশার বিষ ঢোকে তাদের মনে।

কড়া সামাজিক ব্যারিকেড এভাবেই শিশুদের ক্ষতি করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২. হতাশার ভেতরগত কারণ

● ব্যক্তির আত্মগত কারণ, শারীরিক এবং মানসিক অভাব অভিযোগ থেকেও হতাশা সৃষ্টি হতে পারে।

কেউ কানা, কেউ বোবা, কেউবা আবার প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। এ ধরনের শারীরিক ত্রুটি হতাশা বয়ে আনে, মনের শান্তি হরণ করে। কেউ হয়তো গায়ক হতে চাচ্ছে, শত চেষ্টা করেও পারছে না শিখতে। কেউবা সাহিত্যিক হতে চাচ্ছে, পারছে না লিখতে। নিজ মেধা এবং মনের কাছে সে পরাজিত। হতাশায় আক্রান্ত। পূর্বেই আমরা দেখেছি, দ্বন্দ্ব লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব থেকেও হতাশা আসে আত্মগত কারণেই।

হতাশার প্রতিক্রিয়া

হতাশা বা ব্যর্থতায় কখন কে কি করবে নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে প্রতিক্রিয়া সাধারণত দু'ধরনের হয় ঃ

১. অভিযোজিত প্রতিক্রিয়া (adaptive reaction) : এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হতাশা সৃষ্টিকারী অবস্থার সঙ্গে খাপে খাপে মিলেমিশে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে বাধাগুলোর পরিবর্তন, পরিশোধন কিংবা সরিয়ে ফেলার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়।

অভিযোজিত প্রতিক্রিয়া তিন ধরনের হতে পারে–

● **হতাশার কারণগুলো পুনর্গঠিত করে সমাধানের জন্য পুনরায় অগ্রসর হওয়া :** একবার ব্যর্থ হলে নিশ্চিত না হয়ে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়। বাধাগুলো যাচাই না করে কেউ যদি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে তা অপসারণের চেষ্টা করে, ফলাফল হবে আত্মহত্যার সামিল।

একটি দেশ অপর একটি দেশকে আক্রমণ করলো। কয়েকটি রণাঙ্গনে ভরাডুবি হলো প্রথম দেশটির। তাদের ভেতর হতাশার সৃষ্টি হলো। এখন প্রথম দেশটির কাজ হবে, বিপক্ষ দলের শক্তি সামর্থ সম্বন্ধে সব খুঁটিয়ে দেখা।

তারপরই নিজেদের শক্তির সঙ্গে আপেক্ষিক তুলনা করে অগ্রসর হতে হবে, নইলে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না তাদের ভাগ্যে। সুতরাং একগুঁয়েমি নয়। প্রয়োজন পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন এবং সেই আলোকে কর্মপন্থা ঠিক করা।

● **নিজেকে গুঁটিয়ে নেওয়া বা সরিয়ে রাখা (flight and withdrawal) :** অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, এ ধরনের অনড় প্রতিক্রিয়া কাম্য নয়। বাধা এবং শত্রু যদি অসম্ভব শক্তিধর হয়, তবে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হলো, ওই লক্ষ্যস্থল থেকে নিজেকে গুঁটিয়ে নেওয়া।

রাশিয়া কিউবায় স্থাপিত তাদের মিশাইলগুলো সরিয়ে নেয়। এটিই ছিল বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। নইলে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারতো বিশ্ব। অভীষ্ট লক্ষ্যপানে অগ্রসর হওয়ার অনড় প্রতিক্রিয়া শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, পারিপার্শ্বিকতাকেও বিষিয়ে তুলতে পারে। মিশাইল সরিয়ে না নিলে বিশ্ব পরিবেশ হয়ে যেতে পারতো ভঙুর, বিষাক্ত।

● **সমঝোতা এবং বিকল্প পন্থাবলম্বন :** কিছু কিছু পরিস্থিতিতে উপরে আলোচিত প্রতিক্রিয়াগুলো ফলোপ্রসূ নাও হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে এই পন্থাটি গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের দিকে ছুটতে গিয়ে যদি বোঝা যায়, এইদিকে ছোটা অপ্রয়োজনীয়, আর বেশি দূর অগ্রসর হলে ফেরার উপায় থাকবে না, বাস্তবতার আলোকে তখন সমঝোতার পথটিই কেবল খোলা থাকে।

পরবর্তীকালে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। একজন ক্ষুধার্থ মানুষ নিজের নৈতিকতার কাছে ধরা দিয়ে, চুরি কিংবা নিষিদ্ধ কিছু খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

২. আনোভিযোজিত প্রতিক্রিয়া (non-adaptive reaction) : ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া সব সময় সরাসরি এবং বাস্তবতার আলোকে ঘটে না। হতাশা এবং দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হলে যে শংকা এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা অবদমনের জন্য ব্যক্তি বিশেষের

ভেতর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া ঘটে যায় (defence mechanism)। এই পদ্ধতিগুলো হতাশা সৃষ্টিকারী মূল ঘটনা প্রবাহকে পাশ কাটিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনভাবে ঘটে যায় যেন, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া যায়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

❑ **যুক্তি প্রদর্শন** (rationalization) : এটি একটি সাধারণ আত্মরক্ষামূলক পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করে আমরা আচরণগত প্রতিক্রিয়া কিংবা ত্রুটিগুলো সঠিক প্রমাণ করতে চাই।

আঙুর ফল টক প্রবাদ বাক্যটি এখানে প্রযোজ্য। যখন আমরা কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হই, সেই ব্যর্থতাকে ঢাকতে নানা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করি। বলার চেষ্টা করি যে, কাজটি ছিল জটিল, কারো পক্ষে তা সমাধা করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে অসচেতনভাবেই যুক্তি প্রদর্শন করে ব্যর্থতাকে ঢেকে আত্ম-তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করি আমরা। মূলত যদি নিজস্ব দুর্বলতা এবং অক্ষমতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হওয়া যায়, যুক্তি প্রদর্শন সেখানে প্রাধান্য পাবে না, গুরুত্বহীন বিবেচিত হবে।

বাবু তুখোড় ফুটবল প্লেয়ার। ওকে ছাড়া আক্রমণ ভাগ চিন্তাই করা যেতো না। কিন্তু এবার কলেজ টিমে বাবুর নাম নেই। বাবু নিজেকে প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করে। পায়ে ব্যথা পেয়েছিলাম হেভি, তাই সরে দাঁড়ালাম এবার । নবীনরার তো চান্স পাওয়া উচিত। যুক্তি দাঁড় করায় বাবু।

আসল ঘটনা অন্য। বাবু এবার তেমন প্র্যাকটিস করেনি, পারফরমেন্স খুব খারাপ ছিল, তাই তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে টিম থেকে। নিজের ব্যর্থতাকে সে অন্যভাবে ঢাকার চেষ্টা করেছে মাত্র।

❑ **অপরকে দায়ী করে নিজের দোষ স্খলন** (projection) : আমাদের ভেতর অনেক প্রবণতা আছে যা সত্যিই দোষের, কিন্তু এই সত্যটি স্বীকার করতে চাই না আমরা।

দীপঙ্করকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে ডিম্পল বলে, 'ওই দেখো, মটু যায়।' দীপঙ্কর আহত হয়, কিছুই বলে না। দীপঙ্করকে আহত করা অবশ্যই একটা অপরাধ। কৃষ্ণা পয়েন্ট আউট করে, 'দেখ ডিম্পল, এটা উচিত নয়। সব সময় তুই দীপঙ্করকে হেয় করিস, আঘাত করিস।'

'বাঃ আমি একা বলি, আরো অনেকে কটাক্ষ করে ওকে, সেদিন বাবলু ও নেভলও করেছে।' ডিম্পল জবাব দেয়।

পরীক্ষায় নকল করা অপরাধ, জানে রওনক। তবুও নকল করে সে। এভাবে ভেবে শাস্তি পায়, অন্যরাও তো করছে, আমি কি একা করি। এভাবে নিজের দোষের ফিরিস্তি আমরা অকৃপণ হাতে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, নিজেকে নিরপরাধী বানানোর প্রচেষ্টা চালাই।

❑ **প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যূহ রচনা** (reaction formation) : এটি প্রতিক্রিয়ার বাড়াবাড়ি অবস্থান নির্ণয় করে। সম্পূর্ণ বিপরীত মুখি প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় নিজের ভেতর।

তাজুল খুন করেছে, নিদারাবাদ হত্যা মামলার আসল খুনী সে। খুন করার পর তার ভেতর ঢুকে গেছে ধরা পড়ার ভয়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে তবলিগ জামাতে ঢুকে যায়, একজন জঘন্য খুনী সম্পূর্ণ বিপরীত বেশভূষা ধারণ করে, আচরণেও পরিবর্তন আনে। এ ধরনের ঘৃণ্যতম একজন খুনীর মূল উদ্দেশ্য নিজের চারপাশে ভালোত্বের মুখোশ পড়া, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আচরণে নিজেকে ঢেকে রাখা।

❑ **পশ্চাদগতি** (repression) : বাধা যদি তীব্রতর হয়, সমাধান কিংবা অতিক্রম অসম্ভব, তখন আমরা এমন সব আচরণ করি, যা করেছিলাম অনেক কম বয়সে। অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্তির মাধ্যমে আমরা ফিরে যাই আমাদের ফেলে আসা আদি আচরণগত জগতে।

❑ **অবদমন** (regression) ঃ চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি যা সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়, নিজের অজান্তেই মনের অবচেতন অংশে ঢুকে যায়।

যৌন উদ্দীপনা এবং আক্রমণাত্মক ব্যবহার দুটো শক্তিশালী প্রবৃত্তি, সব সমাজই গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। ফ্রয়েড এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি শিশু যদি কখনো উপরোক্ত কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়, এ ধরনের উদ্দীপনার অবদমন ঘটবে তার ভেতর।

সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারা হলো অবদমনের অবদান, অবদমনে রয়েছে বিবেকের দংশন থেকে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ।

❑ **স্থানচ্যুতিকরণ** (displacement) : আজিম সাহেবের মেজাজ খারাপ। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বউয়ের সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে। অফিসে এসেও মেজাজ ঠিক হচ্ছে না। অল্পতেই ক্ষেপে উঠছেন, সহকর্মীদের সঙ্গে অযথা রাগ ঝারছেন, সামান্য ভুলের জন্য অধস্তনদের ধমক দিচ্ছেন।

হাশেম সাহেবের অন্য অবস্থা, মন মরা হয়ে বসে আছেন অফিসে। একটু আগে বস মারাত্মক বকেছে তাকে, গালিগালাজ করেছে। মন খারাপ করে বাসায় আসেন তিনি। বিউটি হাশেমের স্ত্রী। লক্ষ্মী মেয়ে। স্বামীকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

'সরো'। হাশেম তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলো। ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দেয় বিউটিকে। ঘরে ঢুকে যায়। চোখেমুখে ক্রোধ, উন্মত্ততা।

'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে'। প্রবাদটি এখানে প্রযোজ্য।

বসের সামনে রাগ দেখানো বিপদ। তাই সেখানে নীরবতায় শ্রেয়। হাশেম ভুল করেনি। সঠিক জায়গায় সঠিক কাজটি করেছে। রাগ চড়েছে নিরাপরাধ বউয়ের ওপর। আজিম সাহেবেরও একই অবস্থা, রণঙ্গিনী বউয়ের সামনে তিনি চুনোপুটি, অধস্তনদের সামনে রাগব-বোয়াল।

❑ **উদ্‌গতি** (sublimation) ঃ উদ্‌গতি হচ্ছে একধরনের প্রতিস্থাপন। দিবা ভালোবাসে দীপনকে। দীপনের সাড়া নেই। দীপন অনুরক্ত তানজিনার প্রতি। দিবা যখন বুঝলো, কেঁদে কেটে ভাসালো বুক। অবিশ্রান্ত হতাশার জগতে কলম নিয়ে বসে থাকলো, লিখলো অনেক কথা, কষ্ট এবং ভালোবাসার কথামালা সাজিয়ে তৈরি করে ফেললো বিশাল এক উপন্যাস। সাড়া জাগালো। ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো দিবা। এখানে দিবার ভালোবাসা ভর করেছে কলমে। কলমকে দিয়েছে শক্তি। ভালোবাসার এই শক্তিতে দিবা এখন শক্তিমান। দিবার কষ্ট এক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়েছে, কষ্টের মাধ্যমে সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিগুলো কি সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে মানুষ কে ?

স্বয়ংক্রিয় এই পন্থাগুলোর কারণে দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া যায়, চাপ কমে যায় মনের। ইগো রক্ষা পায়। প্রশ্ন হচ্ছে পরিপূর্ণ সফলতা কি আসে এর মাধ্যমে?

আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক, উভয় আচরণগত স্বভাবেই দেখা যায়। পুরোপুরি বলা যায় না, তবে আংশিকভাবে এই পদ্ধতিগুলো মানুষকে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে, হতাশা বা ব্যর্থতা থেকে শান্তি দিতে পারে, নিজের অজান্তেই। প্রতিবন্ধকতা অতিমাত্রায় শক্তিশালী হলে, অতিক্রম দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, ফলে সেক্ষেত্রে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস প্রবঞ্চনাই ডেকে আনে। প্রথমে বাস্তবতার আলোকে সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, আত্মরক্ষামূলক পন্থাগুলো আপাতদৃষ্টিতে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে কেবল।

দ্বন্দ্ব এবং হতাশা স্বীকার করার মানসিকতা ধারণ করতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণই কেবল শান্তিপূর্ণ সফলতা বয়ে আনতে পারে, মুক্ত করতে পারে হতাশা এবং দ্বন্দ্বের জটিল শৃঙ্খল থেকে।

দ্বন্দ্ব নয়, হতাশা নয়। চাই প্রশান্তিমাখা একটি মন। চাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

কীভাবে সম্ভব ?

● নিজেকে সুস্থ রাখাটিই হচ্ছে প্রথম শর্ত। সুস্থ দেহে বাস করে সুস্থ মন, প্রখর ব্যক্তিত্ব। কাজে থাকে উদ্দীপনা। তাই শারীরিক সুস্থতার বিকল্প নেই।

● নিজেকে জানতে হবে। দার্শনিকের মতো জানার প্রয়োজন নেই, নিজের যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

● অন্যকে জানতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। দু'জনের চাওয়া-পাওয়ার ভেতর প্রতিযোগিতা আসতে পারে।

অন্যের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে বিচার করতে পারলে, শান্তিপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যময় আচরণ বজায় রাখা খুবই সহজ।

● বিশ্বাস এবং বিশ্বস্ত সম্পর্কের বড়ই প্রয়োজন। বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ধরনের শান্তি সম্ভব নয়।

● সামাজিক উন্নয়নে এবং সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। প্রাপ্ত ফলাফল নিজের ভেতর প্রশান্তি আনে। অশান্তি, হতাশা, দ্বন্দ্ব সেখানে লাঘব করা সম্ভব।

নিরপেক্ষ বাস্তবধর্মী প্রবৃত্তি জাগ্রত হোক সবার ভেতর, সবাই মুক্ত হোক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে। শান্তিতে ভরে উঠুক সবার জীবন।

কর্মক্ষেত্রে মানসিকচাপ
নিজেকে রক্ষা করার কৌশল

হালকা বাতাস বইছে, জানালার পর্দা উড়ছে। ভোরের কচিরোদ পর্দার ফাঁক দিয়ে রুমে ঢুকছে।, রোদ এবং ছায়ার মায়াবি খেলা চলছে বেড শীটের ওপর। সকাল প্রায় সাতটা, অঘোরে ঘুমুচ্ছে রেখা। অফিসের সময় ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে। ওঠার নাম নেই। হঠাৎই এলার্ম ঘড়িটি বিকট শব্দে বেজে ওঠে। শরীর মোচড় দিয়ে একবার মাথাটি তোলার চেষ্টা করে, উঠতে পারে না সে, আবার ঝপাং করে মাথাটি চেপে ধরে বালিশের সঙ্গে।

সারারাত ঘুম হয় না তেমন, ভোররাতের দিকেই একটু গাঢ় হয় ঘুম। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই লাফিয়ে উঠতে হয় আবার। অথচ ভোরের অলস ঘুমটুকু সব সময়ই ছিল পরিতৃপ্তির।

চাকরি জীবনের শুরু থেকেই শুরু হয়েছে জটিলতা। এটিকে জটিলতাও বলা যায় না, বলা যায় জীবন যুদ্ধে সেঁটে যাওয়া। ব্যস্ত দিনের সূচনা হয় এভাবেই, আরামের ঘুম হারাম করে। অতৃপ্তি নিয়েই দিনের যাত্রা—নিজের জন্য প্রস্তুতি, সন্তানকে স্কুলের জন্য রেডি করা, স্বামীর সঙ্গে একত্রে নাস্তা খাওয়া, অতি দ্রুততার সঙ্গেই সারতে হয় প্রতিটি কাজ। ঠিক সময়ে অফিসে হাজির হতে হয়। বস অতি পাংচুয়াল, ঘড়ির কাটা ধরে উপস্থিত হন অফিসে। কারুরই বিলম্ব করার উপায় নেই।

রেখার জন্য অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো কঠিনতম একটি কাজ। ঘুম থেকে ওঠার পরেই প্রচণ্ড টেনশন ঠেসে ধরে। পুরোদিন টেনশন থেকে মুক্ত থাকার আর কোনো সুযোগ পায় না সে।

রাস্তায় নেমেও শান্তি নেই। যানযট, ধোয়াযট। স্রোতের মতো ধেয়ে আসে মানুষ। মানুষের চেয়ে গাড়ি বহরের স্রোতও কম নয়। কোথাও খালি নেই রাস্তা। জ্যাম আর জ্যাম। একটি সিগনাল পার হতেই প্রচুর সময় লেগে যায়। হাতে একটু বেশি সময় নিয়ে যে বের হবে, তারও উপায় নাই।

অবধারিতভাবে প্রতিদিনই, লেট। প্রতিদিনই অফিসে ঢুকে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। চাপা রোষানলের আবহ টের পায় সে। অফিসের পরিবেশ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে তখন। তবুও মুখ বুজে কাজ করে যায়। নিজের ত্রুটির প্রতি মোটেই নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। ভেতরে ভেতরে রিএকশন হতে থাকে। মাঝে মাঝে ভর্ৎসনার

শিকার হয়। সব কিছু মাথায় নিয়েই কাজ সারতে হয়। কাজের লোডও বেড়েই চলেছে। মন খারাপ থাকে বলে কাজে ভুল হয়, মনোযোগ থাকে না। ভুল থেকে ভুলের পাহাড় তৈরি হয়ে যায়। ফলে একই কাজ বার বার করতে হয়। ভুল হতে পারে এই টেনশন থেকেও ভুলের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। নিজের অক্ষমতার চিত্র প্রতিদিনই বসের সামনে ভেসে ওঠে।

আসলেই কি রেখা অদক্ষ? অযোগ্য? নাকি পরিস্থিতির শিকার ?

ইদানিং আরো নানা কারণে মেজাজও চড়ে থাকে। অনিন্দ্য সুন্দরী না হলেও সুন্দরীই বলা যায় তাকে। মনেই হয় না বিয়ে হয়েছে। টিনএজ অভিব্যক্তি চোখে-মুখে। ফলে বাড়তি সমস্যা লেগেই আছে। রাস্তাঘাটের সমস্যা গায়ে মাখে না সে। তবে অফিসের সমস্যাগুলো ক্রমশ জটিলই হচ্ছে। দু'জন সহকর্মীর দৃষ্টি মোটেই শোভন নয়। নানাভাবে তাকে বিব্রত করার চেষ্টা করে। অশোভন আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির জবাব কড়াভাবেই দিয়ে থাকে সে। ফলে অফিসে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে। একটি শান্তিপূর্ণ আবহের পরিবর্তে চাপযুক্ত পরিস্থিতির মধ্যে থেকে দীর্ঘ আট ঘণ্টা পার করতে হচ্ছে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন। মাঝে মাঝে অনিয়ন্ত্রিত অনেক আচরণ ঘটিয়ে ফেলে রেখা। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। কাছে ভিড়তে না পেরেই তাদের এই প্রতিক্রিয়া। কুৎসাটুকু সবাই লুফে নেয়। বুঝতে পারে সে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। সব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। এড়িয়ে চললেও একটা অযাচিত কষ্ট ও বিরক্তি সব সময়ই যেন তাকে কুঁরে কুঁরে খায়। আগে সে এমনটি ছিল না। কর্মস্থলের নেগেটিভ পরিস্থিতির কারণেই এমনটি ঘটেই চলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে একই ঘটনা, একই সমস্যা।

ব্যাখ্যা ঃ

রেখা মানসিক চাপ বহন করছে। এই চাপ ঘর থেকে শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণব্যাপী চলতেই থাকে একই ধারা। অফিসকালীন সময় মাত্রা আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলে দীর্ঘ মেয়াদি পীড়ন মানসিক স্বাস্থ্যে ধস নামায়। একই সঙ্গে শারীরিক অনেক উপসর্গও শুরু হতে পারে। মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে আবেগীয় ও কগনিশনের সমস্যা।

আবেগীয় সমস্যাগুলো হলো অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, রাগ ক্ষোভ, বিরক্তি, এগ্রেশন ইত্যাদি।

কগনিশনের জট থেকে মনোযোগের অভাব দেখা দেয়, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়, চিন্তার দ্রুততা হ্রাস পায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে আসে, জটিল সমস্যা সামনে এলে মোকাবেলা করার সামর্থ হারিয়ে যায়। সর্বোপরি কর্মদক্ষতা কমে যায়, কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

স্নায়ুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি শরীরের ভেতরগত বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মানসিক পীড়ন থেকে এটির সিমপ্যাথেটিক অংশ উদ্দীপ্ত হয়, নরএড্রিনালিন ও এড্রিনালিন হরমোন নিঃসরণ ঘটায়। নরএড্রিনালিন নেগেটিভ ইমোশনের সঙ্গে জড়িত। এড্রিনালিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে, অ্যাংজাইটি, টেনশন, পলায়নপর মনোবৃত্তি।

মানসিক চাপ বেড়ে গেলে রক্তে নিঃসৃত হয় স্ট্রেস হরমোন, কর্টিসল। স্বাভাবিক মাত্রার করটিসল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অস্বাভাবিক বেশি নিঃসৃত হলে এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ কাঠামো-ইম্মিউন সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন স্ট্রেসে ভুগলে কর্টিসলের উৎস, এড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড আকারে বড় হয়ে যেতে পারে।

কেস স্টাডির রেখা, দীর্ঘদিন মনো যন্ত্রণার কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরে অফিসে কোথাও দক্ষতা দেখাতে পারছে না। শারীরিক পরীক্ষায়ও উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়েছে, এসিডিটির সমস্যাও বেড়েছে। এছাড়াও রেখা এখন হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের (ব্রেইন অ্যাটাক) জন্যেও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। কারণ মানসিক চাপ এই দুটো রোগে ইন্দন জোগায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিও বাড়তে থাকবে।

মানসিকচাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল

মনোপীড়ন থাকবেই, টেনশন থাকবেই। মূল কাজ হচ্ছে মানসিক চাপের কারণে নিঃসৃত স্ট্রেস হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

কোনো কাজে স্বাভাবিক মাত্রায় টেনশন না থাকলে কাজের গতি বাড়বে না, নিজের ভেতর তাগিদ সৃষ্টি হবে না। কিন্তু মনের অতি আলোড়িত অবস্থা কিংবা অতি টেনশনের কারণে কাজের দক্ষতা কমে যায়, চিন্তার ক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার কোনো টেনশনই যদি না থাকে তাহলেও কাজটি শেষ করার ড্রাইভ থাকে না।

জটিল পরিস্থিতিতে বেশি চাপের মুখোমুখি হলে কী করবেন?

নিজের অবস্থানকে মেনে নিতে হবে, কৌশলের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। সমস্যার কথা আলাপ করুন। নিজের কষ্টের কথা বিশ্বস্ত কাউকে খুলে বলুন, এতে ব্রেইনের ওপর চাপ কমে যাবে। বন্ধু-বান্ধবীর সাহচর্যে থাকুন, সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন। নতুন দক্ষতা শেখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন। সৃষ্টিশীল কাজে যোগ দেয়ার চেষ্টা করুন।

রেখা কি করবে?

ব্যায়াম বা বন্ধুত্ব গড়ে তোলার তো সময়ই নেই তার। সকাল থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়ায়।

সময় কই? চাকরি ছেড়ে দেবে সে? না, মোটেই না।

সময় বের করে নিতে হবে। কর্মস্থলে সহমর্মি কাউকে বেছে নিতে হবে। সব নিজের ভেতর চেপে না রেখে হালকা আলাপ করতে হবে।

রেখা আর একটি সহজ কাজ করতে পারে।

অফিসে চেয়ারে আরাম করে বসে দেয়ালের দিকে একটি বিন্দুতে স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বুক ভরে নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারে, আবার ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিতে পারে। প্রতি সেশনে ৪ বার চর্চাটি করলে কিছুটা সে স্বস্তি পাবে।

মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমেও টেনশন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যোগব্যায়াম বা ইয়োগা চর্চার মাধ্যমেও টেনশন কমানো যায়।

মানসিক চিকিৎসা সেবার মধ্যে দিয়েও টেনশন শাসন করার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে 'প্রগ্রেসিভ মাসকুলার রিলাক্সেশন টেকনিক' শেখার জন্য অনেকগুলো সেশনে অংশ নিতে হয়। এতে মাংসপেশি শিথিল হয়, স্ট্রেস হরমোনের প্রভাব থেকে দেহমন রক্ষা করা যায়। মনে রাখা জরুরী, স্ট্রেসের কারণে মুখের কমণীয়তা, লাবণ্য ক্ষয়ে যায়, ত্বকের সমস্যা হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি কিংবা স্বল্প সময়ের অতি স্ট্রেসকে শাসন না করে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

সর্বোপরী নিজেই যদি সমস্যা মোকাবেলা করতে না পারেন, তাহলে মনোচিকিৎসা কগনিটিভ বেহেভিয়ার থেরাপী গ্রহণ করতে হবে আপনাকে। এটির মাধ্যমে টেনশনের ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে নিজেকে বের করা যায়, নেতিবাচক ধারণা পাল্টানো যায়, পরিস্থিতি সামলে নেয়ার সামর্থ বাড়ানো যায়। কেবল চিকিৎসা নেয়ার তাগিদটিই গুরুত্বপূর্ণ। লজ্জা, সংকোচ ও কুসংস্কারের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, নিজের দৈহিক ও মানসিক সমৃদ্ধি ধরে রাখার আর অন্য বিকল্প নেই।

ঘোরতর ক্রাইসিসে থাকলে ওষুধ খেতে হয়। টেনশন বিরোধী ওষুধ ক্রাইসিসের ধ্বংসযোগ্য প্রবাহ থেকে দেহ-মন প্রটেক্ট করবে। অল্প কয়েক সপ্তাহ ওষুধ খেতে হয়। পাশাপাশি মনোচিকিৎসাও চলতে পারে।

কর্মস্থল সবার জন্য হোক চাপমুক্ত, কর্মস্থলে নারী-পুরুষ বৈষম্য ঘুচে যাক, কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাক, কুসংস্কারমুক্ত হয়ে নারী-পুরুষ প্রয়োজনে অবহেলা না করে মানসিক চিকিৎসা সেবা নিতে এগিয়ে আসুক। নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হোক। এটিই গুরুপূর্ণ কামনা।

ডিপ্রেশন

প্রসঙ্গ ঃ বেকারত্ব ও কর্মক্ষেত্রে জটিলতা

কেসস্টাডি ঃ ১

ভার্সিটি জীবন শেষ হয়েছে প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেছে। একের পর এক দরখাস্ত দিয়ে যাচ্ছে তৌহিদ। কখনো ইন্টারভিউ কার্ড আসে, কখনো আসে না।

ইন্টারভিউ কার্ড এলে বেশ কিছুদিন পড়ালেখা করে, পরীক্ষা দেয়। কখনো লিখিত, কখনো মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। চাকরি জোটে না তৌহিদের। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা, মনের জোর যেন ধসে যাচ্ছে। এভাবেই চলে যাচ্ছে দিন।

ভার্সিটির বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডা নিভু নিভু। একদম বন্ধ হয়ে যায়নি। তৌহিদের যেতে ইচ্ছে করে না। ভেতরের ড্রাইভ কমে যাচ্ছে। আগ্রহ উদ্দীপনা, উৎসাহে ভাটা পড়েছে।

ইতিমধ্যে দুজন ক্লোজড ফ্রেন্ড বিসিএস কোয়ালিফাই করেছে। এখনো জয়েন করেনি। সুন্দর ভবিষ্যতের হাস্যোজ্জ্বল চোখগুলো দেখে নিজের ভেতর ঈর্ষা জাগে না, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি নিজের মনে ভেসে ওঠে। একা থাকলেই টের পায় সে, একধরনের সূক্ষ্ম কষ্ট যেন কুঁরে কুঁরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাকে।

বাবা রিটায়ার করবেন আগামী বছর। এ বছরই ছোটবোন লিসা ইন্টার শেষ করবে। ভার্সিটিতে পড়ার ইচ্ছে ওর প্রবল।

টিনা ওর প্রেমিকা, এখনো তৌহিদের আশায় বসে আছে। চারদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। বড়লোকের মেয়ে টিনা, অনিন্দ্য সুন্দরীও। ফিরিয়ে দিচ্ছে সব প্রস্তাব।

একসময় টিনাকে দেখার জন্য দুর্নিবার ইচ্ছা তাড়া করতো। চাকরি পেলেই ওকে বিয়ে করবে তৌহিদ, ভেবে রেখেছিল। চাকরি হচ্ছে না, সেও যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে। টিনাকে দেখার চাহিদা কমে এসেছে, তবে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই কোথাও না গেলেও টিনার কাছে যায়, দেখা করে। টিনাও ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারে, সাহস দেয়। চাকরি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই আশ্বাসে তাকে সতেজ রাখার চেষ্টা করে। দিন যায় চাকরি হয় না। হাসিখুশি অলরাউন্ডার তৌহিদের চোখে-মুখে যে উচ্ছ্বাসের প্লাবন ছিল তা যেন নিঃশেষ হতে চলেছে। টিনার সাহস আর আশ্বাসেও কাজ হচ্ছে না। কাজে আনন্দ পায়

না সে, মনটি যেন ডুবে আছে বিষাদের ঘোরে। নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ক্রমান্বয়ে হতাশার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে।

দিন যায়। জটিলতা আরো বাড়ে। টিনাকেও এড়িয়ে চলা শুরু করেছে। ভাবতে থাকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতে টিনাকে জড়িয়ে লাভ কি?

কোনো কাজেই এখন সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, দোদুল্যমানতায় ভোগে, খাওয়ার রুচিও কমে গেছে, ঘুম হয় না। হলেও হালকা ধরনের ঘুম হয়, ভোর রাতের দিকে ঘুম ছুটে যায়। অশান্তি তীব্রতর হয়।

সকালবেলাটুকু বেশি খারাপ লাগে, বিষাদে ভরে থাকে মন। বিকেলের দিকে একটু হালকা লাগে। তারপরও ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না।

মাথাধরা, শরীর ব্যথা লেগেই আছে। ব্যক্তিগত সব কাজই ব্যাহত হচ্ছে, সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানই টানে না তাকে। মাঝে মাঝে ভাবে তৌহিদ ঘোলাটে জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ?

কেসস্টাডি ঃ ২

অফিসে এলেই আতংকে ভোগেন সলীল চৌধুরী।

কাজের চাপ, বসের কঠিন জেরা কিছুই যেন সহ্য করতে পারছেন না তিনি। একাউন্টে গরমিল দেখা দিয়েছে, একটি হিসেবে বিশাল গ্যাপ ধরা পড়েছে। হিসাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কাজে একা জড়িত নয় সে, তবে তার দায়িত্বও কম নয়। তবুও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উন্মত্তের মতো আচরণ করছে। কেবল তাকেই দায়ী করে চলেছে। ভুল হয়েছে সত্যি, ভুলের উৎসটি ধরতে পারছেন না। তবে নিজের কাছে নিজেই পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ তিনি। কোনো করাপশনের সঙ্গে জড়িত নন। এটাই বড় সাহস। এই সাহসই তাকে এতো বড় বিপর্যয়ের পরও টিকিয়ে রেখেছে।

ঘরে আছে মমতাময়ী স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে কলেজে পড়ে, মেয়েটি এবার মেট্রিক দেবে। বেতনের টাকা দিয়ে টেনে-টুনে সৎভাবেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সৎ ও সুন্দর ঘরে যেন আগুন লেগেছে।

বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। দোষ ধরা পড়েছে। সলিল চৌধুরী সাসপেনশন অর্ডার হাতে পেয়েছে।

চারপাশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, মমতাময়ী সহধর্মিনীর সাহচর্য ভালো লাগছে না, স্নেহময়ী মেয়েটির চেহারা চোখের সামনে ফুটে উঠছে না আর, ছেলেটির কথাও মনে ঠাঁই পাচ্ছে না, ঘোরতর অমানিশায় যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি। বুকের ভেতর মাঝে মাঝে

দলা পাকানো কষ্টের প্লাবন মোচড় দিয়ে জেগে উঠছে। কান্না পায় এখন হু হু করে। কেঁদেও ফেলেন একা একা।

এভাবে কেটে গেল কুড়ি দিন। সলিল চৌধুরী পরিবর্তন হচ্ছে না। একাকী ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন, বিরক্ত হন, কাঁদেন। কারো সঙ্গে কথাও বলেন না। স্থবির হয়ে গেছে দৈনন্দিন জীবন-যাপন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জট পাকিয়ে গেছে। বর্তমান ধ্বংস হয়ে গেছে, ভবিষ্যতের আশার আলো পুরোপুরিই যেন নিভি গেছে তার কাছে।

রাতে ঘুম আসে না ঠিকমতো, মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে কিম ধরে থাকেন। প্রায়ই এমনটি হয়।

আজও ঘটেছে এমনি ঘটনা। সূর্য এখনো ওঠেনি, ভোরের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বের হলেন চৌধুরী, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন বাসার একটু দূরে রেল লাইনের নিকট। দূর থেকে হুইশেল শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

রেলগাড়ি দূরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। নিজের ভেতরও একধরনের বেপরোয়া ইচ্ছের দাউদাউ আগুন টের পাচ্ছে তিনি ।

মরে যেতে ইচ্ছে করছে, দূরন্ত ইচ্ছেটি যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছের নিকট পরাভূত হলেন তিনি। কোমল ঘাড়টি রেললাইনের ওপর পেতে দিয়ে লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন ।

এগিয়ে আসছে গাড়ি..... এগিয়ে আসছে..... নির্মম মৃত্যুই যেন এখন পরম আশির্বাদের, পরম আরাধ্য।

একটু দূরেই হেঁটে আসছিলেন দু'জন লোক। সলিল চৌধুরীর এই অবস্থা দেখে যা বোঝার বুঝে ফেললেন, তারা ছুটে গিয়ে রেললাইন থেকে টেনে নামিয়ে আনলেন চৌধুরীকে। পরে তাকে আনা হয় ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ এন্ড রিসার্চ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাউন্সিলিং সেন্টারে।

কেসস্টাডি ঃ ব্যাখ্যা/ পর্যালোচনা

আমরা দেখলাম সুমনকে, দেখলাম সলিল চৌধুরীকে। সুমন বেকারত্বের চাপ সইতে পারছে না, পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে। অনবরত ব্যর্থতা বিষাদের ঘোরে টেনে নিয়ে গেছে তাকে।

চারপাশের ঘনিষ্ট বন্ধুদের অনেকেই ভালো অবস্থানে চলে গেছে। আপেক্ষিক তুলনায় নিজের শূন্যতায় ভরা বর্তমানটি বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে। বাবার চাকরি জীবনও শেষ প্রান্তে এসে গেছে। ছোট বোনটির ভার্সিটি পড়ার দায়িত্ব নেবে কে? বেকার অবস্থায় কীভাবে বিয়ে করবে টিনাকে? ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের কারণে নিজের নড়বড় অবস্থান তীব্রভাবে অনুভব করছে, অনাগত দিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতই তার চোখের সামনে ভাসছে প্রতিনিয়ত। তাই বেঁচে থাকার অর্থ ক্রমশঃ প্রশ্নবোধক হয়ে যাচ্ছে। সাইকোপ্যাথলজির কারণে নেগেটিভ কগনিশন তৈরি হয়েছে তৌহিদের ভেতর। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতিবাচক ধারণা জেগে উঠছে। ফলে আচরণগত ও আবেগীয় উপসর্গ সৃষ্টি হচ্ছে। মোটিভেশন বা প্রেষণায় স্থূলতা প্রকাশ পাচ্ছে, জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ উদ্দীপনা, চাহিদা কমে গেছে। শারীরিক উপসর্গও শুরু হয়েছে। উপসর্গের কারণেই নেগেটিভ কগনিশন তীব্রতর হচ্ছে। নেগেটিভ কগনিশন থেকে আসছে উপসর্গ। এই চক্রের গোলক ধাঁধায় তৌহিদ এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কেস স্টাডির ভেতর দিয়েই প্রেক্ষাপট এবং উপসর্গের বিস্তার ও তীব্রতা তুলে ধরা হয়েছে।

সৎ কর্মচারী সলিল চৌধুরী সাসপেনশনের মতো ঘটনাটি মেনে নিতে পারেননি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষমতা পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলেন তিনি। মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হয়ে আত্মহননের attempt গ্রহণ করেন। তীব্র psycheache থেকেই পরিস্থিতি ডিপ্রেশনের দিকে গড়িয়েছে। সাইকোপ্যাথলজিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

তৌহিদের ডায়াগনোসিসও মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার। এই নিবন্ধে দু'জনের একই ডায়াগনোসিস, কেবল প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন।

কি ঘটে ব্রেইনে

তথ্য সঞ্চালনসহ ব্রেইনের নানা কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিছু রাসায়নিক উপাদান বা নিউরোট্রান্সমিটর। সেরোটানিন ও নরএড্রিনালিন নিউরোট্রান্সমিটর দুটোর মাত্রা কমে যায় ডিপ্রেশনে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

নিয়মিত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে সেরোটোনিন ও নরএড্রিনালিন-এর মাত্রা বাড়ানো যায়, ডিপ্রেশন মোকাবেলা করা সম্ভব। রোগী সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে, সুস্থ হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে এন্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও ডিপ্রেসিভ ডিসওর্ডারের মৃদু ও মাঝারি স্তর থেকে কগনিটি বিহেভিয়ার থেরাপির মাধ্যমে নেতিবাচক চক্রের গোলক ধাঁধা থেকে রোগীকে বের করে আনা যায়। সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সিলিংও কাজ দেয় ভালো।

সলিল চৌধুরী আত্মহননের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। এক্ষেত্রে তাকে ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি দেয়া হয়। সাধারণের ভাষায় এটিকে বলে 'ইলেকট্রি শক'। শক শব্দটির সঙ্গে ভয় জড়িত থাকলেও এটির সাকসেস রেট অনেক ভালো। তেমন কোনো কমপ্লিকেশন নেই বললে চলে। সলিল চৌধুরী প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে তিনি এন্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ পাচ্ছেন, সঙ্গে চলছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি। তৌহিদের অবস্থাও ভালো। সে কেবলই এন্টিডিপ্রেসিন্ট ওষুধ এমিট্রিপটাইলিন পাচ্ছে একশো মিলিগ্রাম প্রতিদিন, সঙ্গে চলছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি।

উভয় রোগীর ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরী।

মানসিক রোগ এবং কাজ করার ক্ষমতা

মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে তৌহিদ ও সলিল জীবন থেকে কি বাতিল হয়ে যাবে? তাদের দক্ষতা সৃজনশীলতা কি ধ্বংস হয়ে গেছে?

না, মোটেই না। এই সত্যের প্রতি সমাজের উপলব্ধি বাড়াতে হবে। বরঞ্চ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তৌহিদের মানসিক স্বাস্থের সুরক্ষা সম্ভব। চাকরিক্ষেত্রে সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণায় লাঘব হলে সলিল চৌধুরীও সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগীর কাজ করার যোগ্যতা এবং অধিকার রয়েছে।

উৎপাদনশীল কাজের পরিবেশ নির্মাণের কৌশল প্রসঙ্গ ঃ মানসিক স্বাস্থ্য ও ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স

কর্মস্থলে নানা সমস্যা লেগেই থাকে।

কাজের চাপ, সময়ের চাপ, সহকর্মীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বসের শৈন দৃষ্টি, সব কিছুই কাজের পরিবেশের শান্তি হরণ করে।

বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে– অতি দ্রততর হয়ে পড়ছে জীবনযাপন। বাড়ছে জীবন যন্ত্রণা, বাড়ছে আবেগীয় সমস্যা। ধৈর্যহীন হয়ে যাচ্ছি আমরা। অল্পতেই রেগে যাচ্ছি, ক্ষেপে যাচ্ছি সহিংস আচরণ করছি। নিজেদের কন্ট্রোল করার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছি। বুদ্ধি দিয়েই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হয়। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি, বুদ্ধি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। আবেগীয় সমস্যা কর্মদক্ষতা খর্ব করে। বুদ্ধি খরচ করে আবেগীয় সমস্যার নেতিবাচক অবস্থার উত্তোরণ ঘটে না।

ডেনিয়েল গোলম্যান আবেগীয় সমস্যা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রকাশনায় ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে এই ধরনে ইনটেলিজেন্স-এর মাধ্যমে সকল ধরনের মানসিক চাপ মোকাবেলা করা যায়, নিজেকে সুশৃঙ্খল রাখা যায়, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায়। ফলে কর্মস্থল নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ হয়।

ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স বলতে কি বোঝায়?

ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স হচ্ছে কিছু দক্ষতার সমাহার যার সাহায্যে সবাই অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনে সফলতার জন্য বেশি আইকিউ স্কোর সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। বরঞ্চ ইমোশনাল ইনটেলিজেন্সের প্রয়োজন অত্যধিক।

ইকিউ (EQ) এই সংকেত দিয়েই ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স বোঝানো হয়ে থাকে।

কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ইকিউ একটি গুরুত্বপূর্ণ টুলস। ইকিউ-ই কর্মচারী এবং মালিকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পথ সহজতর করে দেয়। ফলে ক্ষোভ-হতাশা কমে যায়। দ্বন্দ্ব লাঘব হওয়ার পথ এভাবেই তৈরি হয়। দ্বন্দ্বের মীমাংসার মধ্য দিয়েই

কর্মস্থলে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় থাকে। এটি কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর পূর্বশর্ত। উৎপাদন বড়ানোর সবচেয়ে বড় কৌশল হলো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে কর্মচারী এবং মালিক পক্ষ উভয় গ্রুপকেই ইকিউ-এর আলোকে সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। মূলত ইকিউ-এর মাধ্যমে নিজের আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। আমরা প্রায় উপদেশ পেয়ে থাকি; কিংবা দিয়েও থাকি– 'আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন', 'আবেগ ভুলে যান' ইত্যাদি। মনে রাখা দরকার, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং আবেগের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া এক কথা নয়।

আবেগের প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব নিজে বহন করতে পারলে, নিজের ক্ষমতা নিজেই ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্তে এসে যায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিই তখন নানা আঙ্গিক থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে।

কীভাবে ইকিউ টুলস ব্যবহার করবেন ঃ কীভাবে দক্ষতা বাড়াবেন

❑ ইকিউ ব্যবহারের প্রথম শর্ত হলো নিজের অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হওয়া, অন্যের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক আচরণের উৎস ধরা, নিজের ইমোশন শনাক্ত করা।

দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্টি হতে পারে আবেগীয় প্রতিক্রিয়া, নেগেটিভ ইমোশনই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। সহকর্মীদের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনীময় হতে পারে, মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। অতিদ্রুতই এসময় ব্রেইনে ইলেকট্রো কেমিক্যাল পদার্থ নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আগ্রাসী ও মারমুখী ক্ষোভ জেগে ওঠে। এই তর্কবিতর্ক, উতপ্ত আচরণ একে অপরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ম্লান করে দেয়, কাজের দক্ষতা কমিয়ে ফেলে, কর্মস্থলে উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত করে।

ওই মুহূর্তে করণীয় কি?

অপেক্ষা করতে হবে, কমপক্ষে তিন থেকে ছয় সেকেণ্ড। চট করে নিজের অনুভূতির প্রতি সতর্ক হতে হবে।

অপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, ইলেকট্রো-ক্যামিকেল রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হতে সময় দেয়া, মাত্রা কমতে সুযোগ তৈরি করা।

এসময় অপেক্ষা করতে পারা দুরূহ একটি কাজ। মনে রাখতে হবে, যদি ওই মুহূর্তে ভাবা যায়– ইমোশনাল out burst মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ডেকে আনে, শরীরের

বিভিন্ন অঙ্গগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে, সর্বোপরী নিজের মানবীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয় তাহলে ত্বরিত গতিতেই অপেক্ষা করার কৌশল রপ্ত হয়ে যাবে। এই কৌশল রপ্ত করার মাধ্যমে, কেবল কর্মক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল চত্বরেই জয়ী হওয়ার পথ পেতে পারেন যে কেউই।

❑ যখন শান্ত হতে থাকবেন, নিজের প্রতিক্রিয়া নিজেই বুঝতে পারবেন। বোঝা সহজ হবে কী ধরনের নেতিবাচক চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কী বিভ্রম তৈরি হয়েছিল নিজের মাঝে।

এই নেতিবাচক ইস্যুটি বুঝতে পারলেই, পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষমতা বেড়ে যাবে, প্রকৃত আচরণ কি হওয়া উচিত ছিল এই উপলব্ধি এবং শিক্ষা দুটোই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করবে। ভবিষৎতে এ ধরনের আচরণ থেকে নিজের আবেগই নিজেকে রক্ষা করবে।

❑ চাপমুক্ত পরিচ্ছন্ন মনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আবেগীয় তথ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা গেলে সঠিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যায়, গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রখরতা সমৃদ্ধ হয়। আবেগের সঙ্গে এক ধরনের 'মোটিভেশনাল ফোর্স' জড়িত আছে। পজিটিভ ইমোশন সম্পৃক্ত হলে সেই ফোর্স মানুষের দক্ষতা, আগ্রহ, উদ্দীপনা অনেক বাড়িয়ে দেয়, লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নিজের ভেতর বেপরোয়া শক্তি সঞ্চার করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের বিজয় গাঁথা মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো জাতির মধ্যে একটি 'মোটিভেশনাল ফোর্স' তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই ফোর্সই বিজয় ছিনিয়ে আনতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

যে-কোনো কর্ম সম্পাদনের কাজ শেষ করার জন্য আবেগের এই পজিটিভ ইস্যুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

❑ আগেই বলা হয়েছে, নিজের আবেগ নিজেই বুঝে নেয়ার কথা। প্রকৃত পক্ষে নিজের আবেগ বুঝতে পারলে, নিজের স্কিল বাড়ানো সহজ হয়, অন্যের আবেগ বোঝার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। ফলে যে-কোনো দ্বন্দ্বকে পজিটিভ ফোর্স হিসাবে রূপান্তরিত করার শক্তি নিজের মাঝেই গড়ে ওঠে। সামগ্রিক সফলতার জন্য এটি মানুষের একটি বড় গুণ।

সব শেষে বলা যায়, ইমোশনাল ইনটেলিজেন্সের মূল উপাদান হচ্ছে নিজের আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ, আশাবাদ এবং পজিটিভ কমিটমেন্ট। ছোটবেলা থেকেই চারপাশ থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি, সেটিই মূলত আমাদের আত্মসচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলে। এই সচেতনতাবোধই ইমোশনাল ইনটেলিজেন্সের প্রারম্ভিক ধাপটি রচনা করে দেয়। পরবর্তী জীবনে এটি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে প্রশান্তিময় রাখতে গুণগত মান নিশ্চিত করে, কর্মোদ্দীপনা বাড়ায়, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

মালিক কর্তৃপক্ষের জন্য যা জানা প্রয়োজনীয় ঃ কীভাবে কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সজীব রাখবেন

❑ কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে চারপাশের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে। এটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে empathy। নেতৃত্বের এই গুণই কর্মস্থলে স্থিতি ও শান্তি বজায় রাখার মূল হাতিয়ার। মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে, সর্বোচ্চ যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটানোর মতো কাজের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কিনা। সুযোগ এবং সহজ সুবিধা কর্মীর গুণগত মানের বিকাশ ত্বরান্বিত করে। সেই চাহিদা নিশ্চিত না হলে উৎপাদন কখনই বাড়বে না।

❑ কর্মচারীদের মতামত শুনতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির। এটিই মূলত কর্মীর আত্ম-মর্যাদাবোধ সুসংহত করে। ফলে সে নিবিড়ভাবে কাজে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পায়, কাজ করে শান্তি পায়। মনের স্বাস্থ্য এভাবে উন্নতর হয়।

❑ প্রত্যেক ফেলো সদস্যরই গুণগত মানটি বুঝতে হবে।

❑ তাদের কাজের সঙ্গে কোম্পানির নানা মিশনের সরাসরি সংযোগ রাখতে হবে। তাহলেই তারা নিজের মনে করে কোম্পানির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। এটিও গুণগত মান নিশ্চিত করে। কর্মীর মন সজীব রাখে।

Personal Library
Book No.........
Collected by Prasenjit Chowdhury

মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন কাজের নিশ্চয়তা ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা

সাম্প্রতিক বিশ্বে পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন যাত্রার নানামুখি চাপ, বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি পায় এ চাপ বা পীড়ন থেকে। সুতরাং কর্মস্থলে স্ট্রেস কমাতে হবে, চাপমুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, চলমান সময়ের গতিধারায় এটি একটি বড় লক্ষ্য, সবারই জন্যে অর্জন করতে হবে এই প্রাপ্তি।

কর্মস্থলের বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করি আমরা। এসব কাজে আর্থিক প্রাপ্তি না থাকলেও, ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি অর্জনই অনেক বড় পাওয়া। কাজের স্বীকৃতি ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যক্তিবিশেষের মনের সমৃদ্ধি বাড়ায়, কাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহী করে তোলে।

১৯৯৯ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী মর্যাদাসম্পন্ন কাজের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যটি হচ্ছে সকল নারীপুরুষের জন্য যথোপযুক্ত শালীন ও উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে, স্বাধীনতা নিরাপত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। এই অধিকার কর্মীর আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকার জন্য চাই কাজ, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন কাজ, মনের শান্তির জন্য কাজের বিকল্প নেই। কিন্তু কেবল প্রাচুর্য নয়; শান্তির ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুস্থ মনও।

সুস্থ মন ধরে রাখার একটি উপায় হলো কর্মে নিয়োগ লাভ। নিয়োগ প্রাপ্তির মাধ্যমে রোজগারের একটি নিয়মিত উৎস হাতে এসে যায়। জীবনের নানা অনুষঙ্গের প্রতি তখন আগ্রহ উদ্দীপনা ও আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে যায়। নিজেকে সমাজের একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করার মতো অনুপ্রেরণাও মনের মাঝে জেগে ওঠে। নিজের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগও পাওয়া যায় কর্মে নিয়োজিত হবার সুযোগ পেলে। অনেক ক্ষেত্রেই উপার্জিত আয় ধর্তব্যের আসে না, কর্মের গুরুত্বই বড় হয়ে ধরা দেয়। উপার্জন না হলেও কাজের সুযোগ পেলে ব্যক্তি বিশেষের মনোবল ও নৈতিক শক্তি বেড়ে যায়।

একজন মানুষ সুস্থ ছিল, হঠাৎ করেই মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে, কাজ করার যোগ্যতা ফিরে পেয়েছে–

সমাজ কি তাকে কাজ করার অধিকার দেবে?

সরকার কি এদের কাজের সুযোগ রাখবে?

বেসরকারী নিয়োগকর্তারা কি তাদের চাকরিচ্যুত করবেন?

সকল ক্ষেত্রেই কাজ করার অধিকার কি সংকোচিত হয়ে যাবে?

চাকরিকালীন অবস্থায় কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে কি তাকে বরখাস্ত করা উচিত? ডিমোশন দেয়া উচিত? বর্জন করা উচিত? নাকি চিকিৎসার মাধ্যমে তার যোগ্যতা রক্ষা করার কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত?

আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের অধিকার বলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবারই যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার রয়েছে। আবার দেখা যায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে মানসিক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব, তাকে কর্মক্ষম রাখা যায়। গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা দরকার। বর্তমানে সুস্থ মানুষটিকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে হবে, সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, নিয়মিত উপার্জনের পথ তৈরি করে দিতে হবে। এটি কেবলই করুণা নয়; চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, এটি তাদের মৌলিক একটি চাহিদা।

চারপাশে কি দেখতে পাই আমরা?

চারপাশে রয়েছে নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার এক করুণচিত্র।

প্রায় মানসিক রোগীদের মৌলিক ইস্যুগুলো পদদলিত করা হয়, খাটো করা হয় তাদের যোগ্যতা। সুস্থ হওয়ার পরও পূর্বের মান মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পায় না তারা। মনোরোগ ডায়াগনোসিসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অজ্ঞতার শাণিত চাবুক পিঠে আঘাত হানে, কুসংস্কারের অন্ধ ছোবলে বিপর্যস্ত হয়ে যায় অসংখ্য জীবন। মানসিক রোগের প্রতি মানুষের এই নেতিবাচক মনোভাব যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। বেশি শিকার হয়েছে গুরুতর মানসিক রোগীরা। জনগোষ্ঠীর একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এই যে, তাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বলে কিছুই থাকে না। জনগণের গড়ে ওঠা ভুল বিশ্বাসের শেকড়ে গেঁথে আছে যে, মানসিক রোগীরাঃ

- ❑ কখনই পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।
- ❑ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যেকোনো সময় যে কোনো বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারে।
- ❑ চারপাশের সাধারণের প্রতি বিপজ্জনক।

কেন গড়ে উঠেছে এই নেতিবাচক ধারণা?

মূলত অশিক্ষা ও কুসংস্কারই দায়ী, অবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর ভর করেই ভুল সংস্কার ডালপালা বিস্তার করেছে। সমাজে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। সম্ভাব্য নিয়োগকারীরাও এই ধারণার উর্ধ্বে নয়। তাদের পরিকল্পনা থাকে উৎপাদন বাড়ানো, দক্ষ

কর্মী নিয়োগ। মানসিক রোগীরাও দক্ষ কর্মী হতে পারে এটি তাদের ধারণার বাইরে, প্রচলিত বিশ্বাসের কারণেই এ ধরনের কাউকেই তারা কাজ দিতে রাজি নন। ফলে মানসিক চিকিৎসা পেয়েছে এমন রোগীরা কাজ জোটাতে পারে না। কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বব্যাপী এই বেহাল অবস্থা বিরাজমান।

মানসিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এমন রোগীদের ওপর আমেরিকার জর্জ মাসন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল তারা যে কুসংস্কার ও বৈষম্যের শিকার হয় সেই ভয়াবহতা পরিমাপ করা।

আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও তিনটি বিদেশী রাষ্ট্রের মোট ১৪০০ রোগীকে ইন্টারভিউ করা হয়। পঞ্চাশ শতাংশ বলেছে তারা বর্তমানে বেকার। ৩৩.৩% বলেছে যখন নিয়োগ কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে মানসিক রোগের চিকিৎসার কথা, কোয়ালিটি থাকা সত্ত্বেও চাকরিচ্যুত হয়েছে তারা। ব্যক্তি বিশেষের ওপর আরোপিত নানা নিষ্ঠুরতার কথাও সার্ভে রিপোর্টে ধারণ করা হয় ঃ

একজন জানিয়েছেন, একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সকল যোগ্যতাই ছিল। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এর পূর্বে আন-ডায়াগনোজড একটি রোগের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করেননি। কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক থেকে সার্টিফিকেট জমা দেয়ার শর্ত জুড়ে দেয়। শর্ত অনুযায়ী সার্টিফিকেট জমা দেয়া হয়েছিল। চিকিৎসকের মন্তব্য ছিল ওই ব্যক্তি মানসিক রোগে ভুগেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সুস্থ আছেন, কাজের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বজায় রয়েছে। তবুও তার অর্জিত সাফল্য নির্মমভাবে কেড়ে নেয়া হয়। চিকিৎসকের মন্তব্য মূল্যায়ন করা হয়নি।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত অমানবিক, সুস্থ থেকে জীবন-যাপনের পথে বিরাট ব্যারিকেড সৃষ্টি করে, মানসিক রোগীরা দিনে দিনে ঘোরতর সংকটের দিকে এগিয়ে যায়।

গবেষণায় এমনও দেখা গেছে, অনেকে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজের জন্য নিজের শ্রম দিতে চেয়েছে, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছে, কিন্তু নীতি নির্ধারণীর কারণে চিকিৎসাধীন মানসিক রোগীদের সেই সুযোগ সংকোচিত করে ফেলা হয়েছে। কেবল চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়, যারা চাকরি করছে, তারাও কর্মস্থলে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়, অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের ওপরও নেমে আসে অনিশ্চয়তার খড়্গ।

সার্ভেতে একজন জানায়, খুব সুন্দর পরিবেশে আলাপচারিতায় মুখ ফসকে ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার সামনে তার পুরনো রোগের বিষয়টি বলে ফেলে। খুব দ্রুতই তাকে চাকরি থেকে ডিমোশন করা হয়, যদিও দীর্ঘ ১০ বৎসর সুনামের সঙ্গেই ওই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তিনি। দশ বৎসরের শ্রমের মর্যাদা মুহূর্তের সিদ্ধান্তে কেড়ে নেয়া হয়।

একজন স্কুল সাইকোলজিস্টের ব্যাপারেও ঘটেছিল এমনি ঘটনা। তিনি নিজেই মানসিক চিকিৎসা গ্রহণ করতেন, কোনো সমস্যা ছিল না কাজে, কোনো ধরনের গাফিলতি ছিল না, কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা কর্মস্থলে কেউ জানতো না। একদিন হঠাৎ রোগটির পুনরাক্রমণ ঘটে, হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিস জুড়ে হৈচৈ বেধে যায়, সহমর্মিতার বদলে তিনি পেয়েছিলেন অমানবিক ফলাফল।

আর একজন জানায়, দীর্ঘ নয় বৎসর তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। একবার ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন চাকরিকালীন সময়। ফলে বেশ কিছু দিন চিকিৎসার জন্যে ছুটিতে চলে যান। সুস্থ হয়ে ফিরে এলে সুপারভাইজার তাকে স্ব-ইচ্ছায় চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে চাপ দেয়। সুপারভাইজার জানায়, মানসিক রোগ মানুষের গুণাবলী ধ্বংস করে দেয়, মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। সুতরাং তোমার চাকরি করার অধিকার নেই। চাকরি ছেড়ে দেয়া উচিত।

এ ধরনের অসংখ্য ভুল ধারণার কোপানলে পড়ে কর্মস্থলে মানসিক রোগীদের ভোগান্তি বাড়তেই থাকে। সবাই তাদের এভয়েড করে, ভয় পায়। অনেকেই তাদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করে। এমন কি সহকর্মীরা অফিসে এলে তাদেরকে হায়, হ্যালো বলে না। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে ডাকে না, অফিসে এবং অফিসের বাইরে এভাবে তাদের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গবেষণায় একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যারা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের নিকট নিজেদের রোগের বিষয়টি গোপন রেখেছিল প্রতিনিয়তই তারা বাড়তি স্ট্রেসের মুখোমুখি থেকেছে। সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চিকিৎসার ইনসুরেন্স সিস্টেমের কোনো সুবিধা নিতে পারেনি। গোপনীয়তা ফাঁস হলে চাকরি চলে যাবে এই ভয়ে ভীত থাকার কারণে রোগের প্রকোপও বেড়েছে অনেকের। ফলে রোগের একটি চক্রের মাঝেই তাদের ঘুরপাক খেতে হয়। ডিফিকাল্ট সময়ে সহকর্মীদের কোনো সাপোর্ট ও সহযোগিতা পায় না তারা, রোগের উন্নতি তখন ব্যাহত হতে বাধ্য।

কেবল মানসিক রোগীদের বিপর্যয় ঘটে না, মানসিক চাপ কর্মক্ষেত্রে সাধারণ সুস্থ কর্মীদেরও মনোরোগ সৃষ্টি করতে পারে, কাজের দক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে চাপমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ব্যক্তির সৃজনশীলতা বেড়ে যায়, কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সাধারণের মতো মানসিক রোগীদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

সমাজের করণীয়

❑ মানসিক রোগীদের সামর্থ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। এই রোগের সেবা প্রদানকারীদের অনেকেই পুরনো ধারণা নিয়ে বসে আছে। তাদের ধারণা

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে মানসিক রোগীরা চাকরি জোগাড় করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, উন্নত ওষুধ ব্যবহার ও পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে গুরুতর মানসিক রোগীদের সুস্থ রাখা যায়, কাজে নিয়োগ লাভের মতো সামর্থ বাড়ানো যায়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো চিকিৎসার পাশাপাশি কমিউনিটিতে সেবা প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কর্মে নিয়োগ লাভ মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি মৌলিক অংশ, বিষয়টি সবাইকে মনে রাখতে হবে।

❑ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারীদেরও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। রোগীর সৃজনশীলতা ও সামর্থ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে যে অধিকাংশই মানসিক রোগ, এমনকি সিজোফ্রেনিয়ার মতো গুরুতর চিকিৎসাধীন মানসিক রোগীর ধ্বংসাত্মক ও আগ্রাসী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, সুস্থ করা এখন আর কঠিন নয়। এসব রোগীরা কর্মস্থলে কারো জন্য হুমকি সৃষ্টি করে না, বরং তারা হতে পারে কর্মঠ, সৃজনশীল ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

❑ মানসিক রোগীদের কাজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া, নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করারই সামিল। এই বৈষম্য ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। এই বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ও আইনগত অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট এই মেসেজ পৌঁছাতে হবে।

❑ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত মানসিক রোগীর প্রতি উদার দৃষ্টি থাকতে হবে, সাপোর্ট দিতে হবে। তাদের কর্মকালীন সময়ের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেয়া যেতে পারে, কঠোর স্ট্রেসফুল শ্রমের পরিবর্তে সহজ কাজের দায়িত্ব দিতে পারলে ভালো হয়। মানসিক রোগীর 'ফলো আপ' চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে চিকিৎসার ব্যাপারে 'টাইম অফ' দেয়া উচিত। শারীরিক অসুস্থতা কিংবা জখম থেকে সেরে ওঠার জন্য সাধারণ রোগীরা যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়, মানসিক রোগীদেরও সেই সুযোগ দিতে হবে। বাসস্থানের বরাদ্দের ব্যাপারে, মনোরোগ যেন কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। রোগীরা যেন রোগ সম্বন্ধে লুকোচুরি না করে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। সবাইকে এই বিষয়টির প্রতি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর আলোকে সহমর্মিতার দৃষ্টি রাখতে হবে, সাপোর্ট দিতে হবে।

❑ কোনো মানসিক রোগীই মূল্যহীন নয়, তাদের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায় না। নানা তির্যক বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থেকে এদের প্রশংসা করতে হবে যে-কোনো সাফল্যের। তখনই তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ বেড়ে যাবে। সুস্থ সমাজ গঠনে বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, বেকারত্ব সমাজের জন্য একটি অভিশাপ। বেকারত্বের কারণে নানা ধরনের মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সুস্থ একজন বেকার দিনের পর দিন বেকারত্বের তীব্র কষাঘাতে ভেঙ্গে পড়ে, মানসিক স্বাস্থ্যে ধস নামতে পারে তার। একইভাবে বেকার মানসিক রোগীও রোগের পুনরাক্রমণের ঝুঁকিতে থেকে যায়। সব ক্ষেত্রেই বেকারত্ব থেকে মানসিক রোগের প্রতিরোধ তৈরি করা যায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থের সুরক্ষার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মসংস্থান হলেই চলবে না, কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানসিক চাপমুক্ত কাজের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। কর্মীরা ডিপ্রেশন কিংবা অ্যাংজাইটিতে ভুগলে উৎপাদন কমে যাবে, জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে তা বাধা হয়ে থাকবে। তাই কর্মস্থলে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

গবেষণায় আরও দেখা যাচ্ছে, ডিপ্রেশনের কারণেই কর্মকালীন সময়ের বেশি অপচয় ঘটে। বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে ডিপ্রেশনের কারণে। বিশ্বব্যাপী ডিপ্রেশনের প্রকোপ এতোই দ্রুত বাড়ছে যে, হৃদরোগের চেয়ে ডিপ্রেশনকেই এখন মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় বোঝা হিসাবে ধরা হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন বেকারের ডিপ্রেশনের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে, কর্মস্থলে চাপহীন কাজ মনকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করে গড়ে নিতে পারে।

নানা কারণে জনগোষ্ঠী মানসিক রোগ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক পথে এগিয়ে আসতে পারে না।

বাংলাদেশ জার্নাল অব সাইকিয়াট্রিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ৮০.৬৫ শতাংশ গুরুতর মানসিক রোগীই প্রথম দিকে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে। তাদের ৮০ শতাংশেরই কোনো উপকার হয়নি। একজন রোগীকে সর্বোচ্চ নয় ধরনের সনাতন পদ্ধতির চিকিৎসা দেয়া হয়। এদের মধ্যে ১৯.৬ শতাংশ রোগীর ব্যয় হয় গড়ে ৫০০০ টাকা। একজন রোগী সর্বোচ্চ ব্যয় করে চার লক্ষ টাকা (আলম, হক '৯৮)।

রিপোর্টের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, শিক্ষা, ধর্ম, উচ্চ বা নিম্নশ্রেণী সবার ক্ষেত্রেই মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকম। সবাই প্রথম সনাতন পথেই এগিয়ে যায়। এরা বৈদ্য, কবিরাজ, খোনকার, পীর সাহেবদের কাছে ধর্ণা দেয়, মাজার বা কালিবাড়ির জন্য মানত করে, ঝার ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করে। ধোঁয়া দিয়ে শ্বাস টানতে বাধ্য করা, কধু কাটা, জিন হাজির থেকে শুরু করে শারীরিক নিবর্তনমূলক অনেক ধরনের অমানবিক পদ্ধতি আরোপ করা হয় রোগীদের ওপর। যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি মিথ এই যে, 'ভর করা আছরের' কারণে মানসিক সমস্যা ঘটে থাকে। এটিকে বলে possession states। এই ভ্রান্ত ধারণাটিতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মোড়ক পড়িয়ে সাধারণের নিকট ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল, এখনো

চলছে একই ধারা। ফলে কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বব্যাপী মানুষ সহজেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভুল পথেই এগিয়ে যায়। রোগীর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সঠিক সময়ে ব্যাহত হয়। মনে রাখা দরকার, বৈজ্ঞানিক স্লোগান এই যে, কুসংস্কার ও অপচিকিৎসা মানসিক রোগ-ভোগ দীর্ঘায়িত করে।

মানুষের মনে গড়ে ওঠা ভুল ধারণাগুলো ভাঙতে হবে। সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রোনিকস মিডিয়া। একই সঙ্গে প্রতিটি দেশে মানসিক চিকিৎসা সেবার বৈজ্ঞানিক প্লাটফর্মটিও সমৃদ্ধ করতে হবে। সহজলভ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পাওয়ার পথটি তৈরি করে দিতে হবে। সহজলভ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পাওয়ার পথটি তৈরি করে দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার অতি দ্রুতই শেরেবাংলা নগরে চালু করতে যাচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথের নূতন ভবন। এটির মাধ্যমে দেশে মানসিক রোগ চিকিৎসার ইস্যুটি আরো সমৃদ্ধ হবে আশা করা হয়।

নাটক, সিনেমায় মানসিক রোগীদের ভুল ইমেজ প্রতিফলিত করা হয়। মানসিক রোগী মানেই অন্যের জন্য হুমকি স্বরূপ, মানসিক রোগ মানেই উন্মাদগ্রস্ততা ইত্যাদি ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের এটিচুড গড়ে তোলা হয়। কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বজুড়েই চলছে এমনতরো নির্মমতা। বিনোদনের নামে সস্তা পদক্ষেপের কারণে মানুষের অবচেতনে এই রোগ সম্বন্ধে ভুল ইমেজ গড়ে ওঠে। এই নেতিবাচক ইমেজটি শিক্ষিত সমাজকেও বিভ্রান্ত করে। তারাও সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে এগিয়ে আসে না।

মনে রাখা দরকার, মানসিক রোগ মানেই লজ্জার কোনো কারণ নয়। মানসিক রোগ শারীরিক রোগের মতোই অসুস্থতা। সকল মানসিক রোগেরই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্ভব। বর্তমানে অনেক উন্নত ও কার্যকর ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। রোগ পুরোপুরিই সেরে যাচ্ছে। রোগীরা কর্মক্ষম থাকতে পারছে। কোনো কোনো রোগীকে দীর্ঘদিন ওষুধ খেতে হয় যেমনটি খেতে হয় অনেক শারীরিক রোগীদেরও, যেমন উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এ্যাজমা ইত্যাদি। অধিকাংশ মানসিক রোগীকেই দীর্ঘদিন ওষুধ খেতে হয় না। মানসিক চিকিৎসা সেবার মান এমনিভাবে নানা আঙ্গিক থেকে সফলতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মনোচিকিৎসার পদ্ধতিগুলোও অনেক উন্নততর হয়েছে, স্যোশাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিও চিকিৎসার মান বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২০০০ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে মিল রেখেই স্লোগান গ্রন্থিত হয়েছে 'বেকারত্ব ও মানসিকরোগ ঃ কর্মসংস্থানই প্রতিকার'।

বেকারত্ব থেকে মানসিক রোগ সৃষ্টি হতে পারে, আবার বেকারত্বই মানসিক রোগীর পূনর্বাসনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এই বাধা দূর করার দাবী বিশ্বব্যাপী সোচ্চারের সঙ্গেই উচ্চারিত হচ্ছে। মানসিক রোগীদের মঙ্গলের জন্য নিয়োগকারীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই কাম্য।

মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশ কর্মীর দক্ষতা বাড়ায়

পেশাগত সমস্যার কারণে কর্মস্থলে নানা ধরনের মানসিক সংকটে ভুগে থাকেন অনেকেই। মানসিক সমস্যার কারণেও পেশাগত জটিলতা বাড়তে পারে। এক সময় মানসিক রোগে ভুগেছিল এখন সুস্থ আছে, এমন কর্মী কর্মস্থলে নানা ধরনের তীর্যক বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়। সহকর্মী কিংবা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হাস্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। চিকিৎসাধীন মানসিক রোগীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় চাকরির জন্য নির্বাচিত হলেও, জানাজানি হলে, চাকরি আর জোটে না তার ভাগ্যে। যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয় না তাদের। সনাতন ধারায় গড়ে ওঠা কুসংস্কারের কারণে ধরে নেয়া হয়, এরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো গুণ নেই তাদের, কাজ করার যোগ্যতা নেই, যে-কোনো সময় অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, অন্যকে আক্রমণ করতে পারে, চিকিৎসায় কখনই তারা ভালো হবে না, ধরে নেয়া হয় তারা অকর্মণ্য, অপদার্থ। ফলে চাকরি পায় না। চাকরিকালীন সময়ে মানসিক সমস্যা হলেই রোগী কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের কাছ থেকে নানা ধরনের অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের শিকার হয়। পূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

মনে রাখা জরুরী, কার মানসিক রোগ হবে কেউ জানি না আমরা। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, গুলশানবাসী কিংবা বস্তিবাসী যে কারুরই সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা বায়োলজিক্যাল কারণে মানসিক রোগ হয়ে যেতে পারে। কেবলই একক কারণ নয়, এটি ঘটে থাকে সাধারণত মাল্টি ফ্যাক্টরিয়াল সমস্যার জট থেকে। আরো মনে রাখা জরুরী, মানসিক রোগীদের ব্যাপারে উপরে উল্লিখিত যতগুলো নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সব ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

মানসিক রোগ মানেই কেবল তথাকথিত উন্মাদগ্রস্ততা নয়। মাত্র এক শতাংশ জনগোষ্ঠীর বড় ধরনের মনোরোগ থাকতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত বিশাল জনগোষ্ঠী জানেই না যে তারা মানসিক রোগে ভুগছে, সুতরাং চিকিৎসার জন্য সঠিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পায় না। এদের রোগভোগ দীর্ঘায়িত হতে থাকে, জটিল হতে থাকে। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনার পেছনে রয়েছে সামাজিক অজ্ঞতা, সনাতন ভুল ধারণা। মনে রাখা দরকার, সব ধরনের মানসিক রোগেরই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষম রাখা সম্ভব। বেকারত্ব

থেকে মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়, আবার বেকাত্বের কারণেই মানসিক রোগীদের পুনর্বাসন ব্যাহত হয়। সঠিক চিকিৎসার একটি প্লাটফর্ম হলো পুনর্বাসন। কর্মের মাধ্যমে পূনর্বাসিত করা না গেলে মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি ধাপ অপূর্ণ থেকে যায়, যা পূর্ণাঙ্গ সুস্থতার পথে অন্তরায়। কর্মস্থলে যে সব সুস্থ কর্মী মানসিক চাপের মুখোমুখি হন, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা সৃজনশীলতা কমে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি চাপ থেকে নানা ধরনের মানসিক ও দৈহিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। যারা অফিসে বা নানা পেশায় 'টাইম প্রেসারে' ভোগে তাদের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার মাত্রা বেশি। সংবাদপত্র শিল্পে যারা 'টাইম প্রেসারে' প্রতিদিনের অস্থির সময় পার করেন, গবেষণায় দেখা গেছে তারা অধিক হারে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, আলসারে ভুগে থাকে। স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। তাদের ভেতর আবেগীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ক্ষোভ, বিরক্তি এমনকি মাঝে মাঝে তারা এগ্রেসিভ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন। এভাবে যেখানে টাইমপ্রেসার এবং 'ওয়ার্ক ওভার লোড' (work over load) থাকে, সেখানেই কর্মীরা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে থাকেন।

এ কারণেই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০০০-২০০১ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে পেশাগত পরিবেশ ও পেশাগত সমস্যাটি। কর্মীর পেশাগত অধিকার রক্ষাকে মানবাধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। পেশায় সুস্থ ও মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত রেখে অমানবিকভাবে শিশু-শোষণের বিষয়টিও সোচ্চারের সঙ্গে উচ্চারিত। কর্মস্থলে নারী-পুরুষ ভেদে নারীর বৈষম্যরোধের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশু ও নারী পাচারের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ব্যবসায় ব্যবহার করে মানবিক মূল্যবোধ লুণ্ঠিত করা হয়, নারী ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটানো হয়, এই দিকটিও এবার গুরুত্ব পাচ্ছে।

সর্বোপরি বলা হচ্ছে, কুসংস্কার ও সনাতন বিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। মানসিক রোগীদের কর্মের সুযোগ দিতে হবে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে যেন অবহেলা বা অমানবিক সিদ্ধান্তের শিকার না হয় কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে বিষয়টি। মানসিক চাপের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে হবে কর্মীদের। 'স্ট্রেস রিলেটেড' সমস্যা থেকে " employee burnout" প্রতিরোধ করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করতে হবে। কারণ সুস্থ মনই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান
মানসিক রোগীদের কাজের দক্ষতা বজায় রাখে

১০ অক্টোবর, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০০০ পালিত হয়েছে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে।

কেন এতো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কেন সচেতনতা বাড়াতে হবে, কেন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নীতি নির্ধারকরা তাগিদ বোধ করছেন। বিষয়ের গভীরে যেতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি।

শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার নামই স্বাস্থ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে মানসিক উপাদান, মনের সুস্থতা।

মানসিক স্বাস্থ্য আর মানসিক রোগ এক নয়।

মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষ তার পরিবার, কর্মক্ষেত্রে, খেলাধূলায়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচারণ ইত্যকার সকল ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতিদিন কাটায় তারই সার্বিক প্রকাশ হলো মানসিক স্বাস্থ্য।

দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাপক।

দেহে যেমনি আছে সুস্থতা-অসুস্থতা মনেরও তেমনি সুস্থতা আছে, আছে নানা ধরনের ব্যাধি। মন আমরা দেখি না। তবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে মনের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়, মনের ব্যাধি বুঝতে পারি। নির্মম সত্য এই যে, সারা পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মনের দাবী উপেক্ষা করে, অজ্ঞতা ও সনাতন প্রথায় গড়ে ওঠা মানসিকতার কারণে মনের অসুস্থতার চিকিৎসা অবহেলা করে। মানসিক রোগের চিকিৎসা, কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চত করণ, ইত্যাদির সুফল সম্বকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য। ২০০০-২০০১ সালে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Mental Health & Work". একই বিষয়ের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত আছে। মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে উপার্জনশীল কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাবিত করে এটিই দেখা হচ্ছে প্রথম। গবেষণায় অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মানসিক চাপের কারণে কর্মী ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হতে পারে, এমনকি employee burnout হতে পারে। পূর্বে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে।

কর্মস্থলে এ ধরনের পরিস্থিতি শনাক্ত করতে হবে। কারণ এতে কর্মীর পেশাগত দক্ষতা কমে যায়, উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মানসিক চাপমুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত কর্মীর পেশাগত অধিকারটির সঙ্গে উঠে এসেছে অমানবিক শিশু শ্রমের বিষয়। আলোচিত হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীপুরুষ ভেদে নারীর বৈষম্যের কথা, শিশু ও কিশোরী পাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার দাবী উঠেছে, বয়স্ক মহিলারা যে আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয় কর্মক্ষেত্রের এই ইস্যুটিও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত সনাতন কুসংস্কারের নির্মমতায় যেভাবে চিকিৎসাধীন মানসিক রোগীরা ভোগান্তির শিকার হয়, সেই বিষয়টিও হাই লাইট করা হয়েছে। যারা সাম্প্রতিক মানসিক চিকিৎসা পেয়েছেন কিংবা চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়েছেন, প্রতিনিয়তই রোজগারের জন্য কাজ জোটাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তারা। এমনকি অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও কাজ করার অধিকার মিলে না তাদের পক্ষে।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সনাতন বিশ্বাসের মূলে রয়েছে জনগণের কুসংস্কার। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই মনে করে মানসিক রোগীরা সুস্থ হয় না, কখনই সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না, তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, যে-কোনো সময় যে-কোনো বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারে, চারপাশের সাধারণের জন্য তারা বিপজ্জনক।

এসব ধারণা মোটেই সত্যি নয়। বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক উন্নত হয়েছে মানসিক রোগ চিকিৎসা ব্যবস্থা। মানসিক রোগীদের সুস্থ করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা ধরে রাখা যায়। সমাজের উন্নয়নের জন্য তারা ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের আচরণগত সমস্যাও চিকিৎসাযোগ্য, সুস্থ রোগীদের সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে যায় না। কোনো মানসিক রোগীই মূল্যহীন নয়।

নানা কটুক্তি ও তির্যক বাক্যবাণে চিকিৎসাপ্রাপ্ত সুস্থ মানসিক রোগীদের হয়রানি থেকে রেহায় দিতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে উদার হতে হবে। এদের কাজের সুযোগ দিতে হবে।

মনের স্বাস্থ্য সমস্যা
প্রচলিত মিথ ও বৈজ্ঞানিক সত্য

কুসংস্কারের কারণে মানসিক রোগীরা সমাজে যথাযথ মূল্য পায় না, অবহেলার শিকার হয়। রোগ ভোগ দীর্ঘায়িত হয়। ভুল ধারণায় গ্রথিত কুসংস্কারের শেকড় উপড়ে ফেলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কেবল বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানসিক রোগীরা কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে আছে এখনো। সমাজের সবার দৃষ্টিভঙি পাল্টাতে হবে, বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকেই প্রচলিত মিথগুলো ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে সবাইকে। সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য এটি জরুরী।

এই নিবন্ধে তাই পুরনো প্রচলিত মিথগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে ঃ

মিথ ঃ মানসিক রোগী কখনই সুস্থ হয় না; জনমের জন্য সৃজনশীলতা ও কাজের দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।

সত্য ঃ প্রধানতই মানসিক রোগ সাময়িক একটি অবস্থা। পরিপূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, সপ্তাহ বা মাসব্যাপী চলতে পারে এই ইপিশোড। পরবর্তিকালে দেখা গেল, সারা জনমের জন্যই আর সমস্যা হয়নি। এ ধরনের সুস্থ কাউকে এক/দুইটি ইপিশোডের জন্য পুরো জীবন অস্বাভাবিক হিসাবে চিহ্নিত করা কি অবৈজ্ঞানিক নয়? অমানবিক নয়? অসুস্থতা চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হতে পারে। ওই সময়ে সৃজনশীলতার প্রকাশ নাও থাকতে পারে, এর অর্থ এই নয় যে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে গেছে।

মনে রাখা জরুরী, বর্তমানে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিটি ফ্যাকালটিরই উন্নতি সম্ভব, রোগীকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা যায়। কর্ম সংস্থানেই রোগীর পুনর্বাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। রোজগারের উৎস হাতে থাকলে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি পায়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সুদৃঢ় হয়। ফলে উৎপাদন বাড়ে। উৎপাদন বাড়লেই অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। এভাবে সামাজিক উন্নয়নে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীরা ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সুস্থ রোগীরা বেকার থেকে গেলে চিকিৎসা ব্যাহত হয়। রোগের পুনরাক্রমণ ঘটতে পারে। তাই বিশ্ব মানসিক দিবসে স্লোগান গ্রন্থিত হয়েছে "বেকারত্ব ও মানসিক রোগঃ কর্মসংস্থানই পুনর্বাসন।"

মিথ ঃ সিজোফ্রেনিয়াসহ অধিকাংশ গুরুতর মানসিক রোগীই হিংস্র, আক্রমণাত্মক, চারপাশের জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক। এরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যে কোনো সময় যে-কোনো বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

সত্য ঃ ❑ একটি ভুল ধারণা ক্রমাগতভাবে প্রচার পেয়ে এসেছে। নানা ঢংগে, নানা রঙে মানসিক রোগীদের উপস্থাপন করা হয়েছে, তিলকে তাল করে মানসিক রোগীর আচরণকে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধারণাটি সঠিক নয়।

কেবল ড্রাগ আসক্তিতে আক্রান্ত মানসিক রোগীরাই সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে সামান্য বেশি হিংস্র আচরণ করতে পারে। অধিকাংশ হিংস্রতার সঙ্গে প্রধানত জড়িত রয়েছে উদ্দাম ও বেপরোয়া তারুণ্য, মাদকাসক্তি, পূর্বে ভায়োলেন্সের সঙ্গে জড়িত থাকার ইতিহাস। নারীর চেয়ে পুরুষের মধ্যেই সহিংসতা বেশি দেখা যায়।

❑ যে-সকল মানসিক রোগী অ্যারেস্ট হয়েছে, তাদের অধিকাংশই সঠিক সময়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পায়নি, দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসার কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। এদেরকে বিবেচনায় রেখে সব ধরনের মানসিক রোগের ব্যাপারে ইনফারেন্স টানা অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক।

❑ মানসিক রোগী যতোটুকু সহিংস আচরণ করে তা কখনই গুরুতর নয়, অজানা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক নয়। তাদের সামান্য আচরণের গরমিল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে পরিমাপ করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে, সেই ভ্রান্ত ধারণাই বৈজ্ঞানিক যুগেও তাদের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে।

❑ সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এসব রোগীদের সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়, নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় না, স্বল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতিত এরা নিয়ন্ত্রিতই থাকে। অসুস্থতা যতোই বড় হোক না কেন কারুর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে না, কারুর প্রতিই আক্রমণাত্মক নয়।

❑ মনে রাখা দরকার, কুসংস্কার ও অপচিকিৎসা রোগ-ভোগ দীর্ঘায়িত করে। দীর্ঘ দিনের অসুস্থ রোগীকে মানুষ অনিয়ন্ত্রিত ভাবতে শেখে, ভুল শিক্ষণ থেকে তখন মানুষের মনে গেঁথে যায় নেতিবাচক ইমেজ। একজন স্বাভাবিক মানুষের সহিংসতা, অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংসাত্মক আচরণের তুলনায় মানসিক রোগীরা অনেক বেশি সহজ সরল, জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক বেশি নিরাপদ।

কিন্তু এক গবেষণায় দেখা গেছে, টিভিতে প্রদর্শিত৭২% শতাংশ মানসিক রোগীদের দেখানো হয় হিংস্র আচরণের প্রতিভু হিসাবে। এই অজ্ঞতা ও নির্মমতার চিত্র এখানেই

শেষ নয়। বিভিন্ন উপন্যাসের পেপার ব্যাকে মানসিক রোগীদের উপস্থাপন করা হয় ক্ষমাহীন জঘন্য ঘাতক হিসাবে। জনপ্রিয় অনেক মুভিতেও মানুষকে ধারণা দেয়া হয় মানসিক রোগী মানেই ভিলেনের মতো হিংস্র আচরণ করে। ফলে সমাজের মানুষ অসহায় রোগীদের ভয় পেতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে তাদের পরিহার করে চলে, দূরে দূরে থাকে।

মিথ ঃ মানসিক রোগ শারীরিক রোগের মতো কোনো অসুস্থতা নয়। এই রোগ ঘটে থাকে জীন, ভূত পরীর আছর বা কূপ্রভাব থেকে।

সত্য ঃ রক্ত পরীক্ষা কিংবা বায়োপসি করলে ক্যান্সার ধরা পড়ে। ইসিজি বা ইকো কার্ডিওগ্রাম করলে হৃদরোগ ধরা পড়ে। শারীরিক এসব রোগ নির্ণয় করার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বায়োলজিক্যাল কারণ থাকলেও মনোরোগ নির্ণয় করার এ ধরনের কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষা তেমন নেই। না থাকলেও গুচ্ছ উপসর্গের মাধ্যমে এই রোগ ধরা হয়। হঠাৎ অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাখ্যাও তাই যুগে যুগে নানাভাবে এসেছে, ভুল পথে পরিচালনা করে ধরে না নেওয়া হয়েছে জীন ভূতই এর অন্যতম কারণ। আছর বা কূপ্রভাব থেকে মানসিক রোগ হয় এই অযুহাতে দিনের পর দিন শারীরিক অনেক টর্চার করা হতো রোগীর ওপর, এখনো চলছে একই প্রথা।

মূলত মানসিক রোগীর কারণ হিসাবে বায়োলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল ও সোশাল সমস্যাই দায়ী। জীন ভূত বা পরীর আছরে এই রোগ ঘটে না।

মিথ ঃ মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য রোগীকে আলাদা প্রতিষ্ঠানে আটকে রাখতে হবে।

সত্য ঃ এটি অতীতের ধারণা। সাম্প্রতিক সময়ের দাবি, 'জেনারেল হাসপাতাল ওরিয়েন্টেড চিকিৎসা সেবা।' আটকে রেখে চিকিৎসা চালানোর 'ব্যাকডেটেড' ব্যবস্থা বদলে গেছে। অনেক উন্নত ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এখন, গড়ে উঠছে নানা সেবা প্রদানকারী সংস্থা। সাইকোলজিক্যাল ও সোশাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিও এখন অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। রোগীর চিকিৎসার বড় একটি অংশ হচ্ছে পুনর্বাসন। চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করা।

আলাদা বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা রোগীর জন্য ক্ষতিকর। ইনসাইট ফিরে এলে রোগীর আত্মবিশ্বাস তখন ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক রোগীই ভালো হওয়ার পরও দিনের পর দিন পাবনা মানসিক হাসপাতালে পড়ে আছে। টিভি রিপোর্টিং ও পত্রিকার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা যায়। আত্মীয়স্বজন এদের নিয়ে যেতে আসে না। দিনের পর দিন অমানবিক মূল্যবোধের স্বীকার হয় এরা কুসংস্কারের কারণে।

ভুল সংবাদ, মনের চাপ ও প্রতিক্রিয়া
প্রসঙ্গ ঃ রেজাল্ট

ঝলমলে আকাশ। স্বচ্ছ। নীল। পরিচ্ছন্ন।

দুপুরের গনগনে রোদের তেজ অনেক কমে এসেছে। উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়িটির চারিদিকে নারিকেল গাছ। প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় নারিকেল ঝুলে আছে। অল্প অল্প বাতাসে গাছের পাতাগুলো দুলছে, নড়ছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীলাকাশের দিকে তাকালো সালমান শাহ। শাদা শাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো মেঘপুঞ্জের উড়ে যাওয়া এতো সুন্দর।

সাঁ করে একজোড়া চড়ুই উড়ে গেল সামনে দিয়ে, সামনের গোলাপ গাছটিতে বসেছে। গাছে মাত্র দু'টো লাল গোলাপ ফুটে আছে। টকটকে লাল, আজই ফুটেছ। গোলাপ দুটো খুব কাছাকাছি। একটি যেন আর একটির মুখের ওপর ঝুলে আছে। যেন দু'টো লাজুক কিশোরী কানের কাছে কান রেখেছে। ফিসফিস করে কথা বলছে।

আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যটির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে সালমান।

যেদিকে চোখ যায়, কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যই যেন উপচে পড়ছে।

মনের ভিতরের আনচান করা এক অস্তিরতাও যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুস্থির হতে পারেছে না, বার বার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাচ্ছে সালমান।

বিকেলের টিভি নিউজ শুরু হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকি। খবর রটেছে আজ বিকেলের নিউজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের ঘোষণা আসতে পারে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কিছু নেই। পরীক্ষা ভালো হয়েছে। বলা চলে, 'একসিলেন্ট'। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছিল ও। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র হিসেবে সবাই তার ব্যাপারে আশাবাদী।

প্রিন্সিপাল স্যার তো একেবারেই গদগদ।

প্রথম স্থানটিই চাই, কি সালমান, পাবে না ?

সালমানের মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটে ওঠে। নতমুখে বলে, দোয়া করবেন স্যার। আমার আত্মবিশ্বাস আছে।

সাবাস ! মাই সান। পিঠ চাপড়ে তিনি আনন্দ ব্যক্ত করেছিলেন।

পিপ্ পিপ্ ..... পিপ্ পিপ্..... ড্রয়িং রুমের কোণায় রাখা টেলিফোন সেটটির শব্দে চমকে ওঠলো সালমান। নিজের অজান্তেই একবার পা বাড়ায়। থমকে দাঁড়ায় আবার।

ছোট বোন রেখা টেলিফোন রিসিভ করেছে।

রেখা বেশ উচ্ছ্বসিত। কার সঙ্গে কথা বলছে! নীলা নয় তো।

নীলা ওর বান্ধবী। দু'জনই একসঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। সালমানের সঙ্গে নীলার সম্পর্কের ব্যাপারে সব চাল চেলেছে রেখাই।

রেখা কথা বলতে বলতে হাসিতে ভেঙে পড়ছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ও যেন কোনো এক অচিন ভাষায় কথা বলেই চলেছে।

ড্রয়িং রুমের দিকে অগ্রসর হয় সালমান।

ভাইয়া, নীলা ফোন করেছে, নাও। তোমাকে চাচ্ছে।

সালমানের বুকটা ধড়াস করেই যেন লাফিয়ে ওঠলো। না, আনন্দে নয়, যেন অদৃশ্য এক আতংক এসে ঝাপটা দিলো সজোরে।

এমন লাগলো কেন! নীলার টেলিফোন তো আগে এভাবে কখনই ওকে শংকিত করেনি। রিসিভার হাতে নেওয়ার সময়ও যেন একটু কেঁপে উঠলো ও।

হ্যালো। সালমান বলছি।

ও প্রান্তে শব্দ নেই। নিশ্চুপ।

হ্যালো! হ্যালো ! নীলা! নীলা!

না, সাড়া নেই। ও প্রান্ত নিথর। নিস্তব্ধ।

নীলা! নীলা! আমি সালমান।

একটু গ্যাপ। নীরবতা। তারপরই খিলখিল হাসি ভেসে আসে, নরম অথচ মিষ্টি হাসির ছোট ছোট ঢেউ আলতো আঘাত হানছে কানের পর্দায়। যেন সাগরের সহস্য উর্মিমালা কোমল সুরে হেসে উঠছে..... মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যালোকে।

আহ! নীলার স্বরে এতো মধু।

বুক ভরে বাতাস টেনে নিলো সালমান। কিছুটা সুস্থির সে এখন। কিন্তু নীলার কণ্ঠে অভিমান, এতো দেরি করলে কেন রিসিভার হাতে নিতে?

বাহ্ দেরি কোথায়। তাড়াতাড়িই তো ধরলাম ।

না তাড়াতাড়ি ধরোনি। দেরিতেই ধরেছ।

আচ্ছা হার মানলাম। রাগ করো না। মন এমনিতেই অস্থির । একটু পরেই টিভি নিউজে ফল প্রকাশিত হতে পারে। মেধা তালিকার প্রথম তিনজনের নামও ঘোষিত হতে পারে। ভয় করছে। বুক ধড়ফড় করছে।

ভয়ের কি আছে। একটু পরেই টিভিতে সালমান শাহের নামটি শুনতে পাবো। প্রথম তিনজনের মধ্যে তো নামটি থাকবেই। নীলার কণ্ঠে জোর, আত্মবিশ্বাস দৃঢ়।

সালমান হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। ছোট্ট একটি অভিমানের পেরেক খুট করে গেঁথে গেল বুকে। নীলা ওকে তিনজনের মধ্যে দেখতে চায়।

কেবলই 'প্রথম' ভাবতে পারলো না সে। এতোই নিচের দিকে ওর চোখ।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল নীলা। কাট। লাইন কেটে গেছে। একটানা ডায়ালিং টোন বেজেই চলেছে। অনেকক্ষণ পরই সে রাখলো রিসিভার।

অন্য সময় হলে খুনসুটি করতো রেখা। এখন করলো না। ওকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

ভাইয়া, গতবার তো টিভির নিউজের আগেই সাংবাদিকরা বাসায় চলে এসেছিল। এবার তো এলো না। তবে কি আজ ফল ঘোষিত হবে না?

সালমান কিছুই বললো না।

ওর বাবা-মা দু'জনেই চিন্তিত। ড্রয়িং রুমে এসেছেন নিউজ শোনার জন্য। খবরের আবহ সঙ্গীত বাজছে। একই সঙ্গে পুরো পরিবারের সবার ধুকপুকানিও বেড়ে গেছে হাজার গুণ বেশি।

সংবাদ শুরু হয়েছে। শিরোনামে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত সংবাদে সম্মিলিত মেধা তালিকার তিনজনের নাম ঘোষিত হয়েছে।

না। সালমান শাহের নাম নেই।

ওর বাবা সোফায় এলিয়ে পড়েছেন। হৃৎপিণ্ডর পাম্পিং ক্ষমতা যেন কমে গেছে। বুকে যেন হালকা টনটন ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। ঘামছেন একটু একটু। নিথর তাকিয়ে আছেন টিভি স্ক্রিনের দিকে।

মা উঠে গেছেন, রেখাও। ওরা যার যার বেড রুমে চলে গেছে।

মা খুব শক্ত মহিলা। হতাশ হয়েছেন, ধৈর্য হারা হননি একটুও।

তবে মুখটি মলিন লাগছে। মলিনতার স্তর ভেদ করে যেন এক ধরনের দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের স্ফূরণ ঘটছে চোখ থেকে।

রেখা খুব চঞ্চলমতি। ভাইয়াকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই। অতি উচ্চাশার চূড়া থেকে যেন টুপ করে ছিটকে পড়লো অনেক নিচে, গভীর খাদে। কাঁদছে সে। শব্দহীন কান্না। বুকের ভিতর যেন কঠিন একটি বোঝা চেপে বসেছে। কেবল ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

সালমান নিঃসাড় বসে আছে। স্পন্দনহীন। সকল অনুভূতি যেন টিভির মাইক্রোওয়েভ চুষে নিয়েছে। কান্না আসছে না। কষ্টও পাচ্ছে না। মাথাটি খুব শূন্য শূন্য লাগছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেছে। লোডশেডিং চলছে।

এ মুহূর্তে তো মনের ঘরেও লোডশেডিং শুরু হয়েছে। ভিতরে বাহিরে অন্ধকার জেগে উঠছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের কালো থাবা যেন পুরো বাড়িটির ইট সুড়কি পর্যন্ত বোবা বানিয়ে দিয়েছে। ভয়াবহ মৌনতা গ্রাস করে নিয়েছে ন্যূনতম অস্তিত্বের সাড়া।

ভোর হয়েছে।

রাত কিভাবে কেটেছে এ বাড়ির কেউই জানে না।

ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হালকা বাতাস বইছে। শীত শীত লাগছে। সূর্য পূর্বাকাশে এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে পূর্ব দিগন্তে হালকা লালিমা ছড়িয়ে পড়ছে।

বাড়ির গেইটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সালমান।

একটু পরেই হকার আসবে।

প্রথম তিন জনের মধ্যে না হয় স্থান নাই-ই পেলো, স্ট্যান্ড সে করবেই, স্টার পাবেই। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অতি উচ্চাশার স্তরটি কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসেছে। সেটেলড্ হয়েছে একটি পর্যায়ে। হতাশার মোকাবেলা করা যাচ্ছে এভাবে। এখনো তাই শক্ত সালমান। তবে বুক চিরে যে অনল বর্শা গেঁথে গেছে, তার বেদনা মুছে যায়নি।

বেল বাজাতে বাজাতে সাইকেলে চড়ে হকারটি এসে সামনে দাঁড়ালো। অতি ব্যস্ত সে। আজ পেপারও নিয়েছে বেশি। দ্রুততম হাতে পেপারটি তুলে দেয় সালমানের হাতে।

হাত কাঁপছে। কাঁপা হাতেই পেপারটি ধরে ও।

প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে ছবিসহ কয়েকজনের সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছে। ওদের বাবা-মাও আছেন ছবির সঙ্গে। সবার মুখ জুড়ে হাসির বন্যা যেন উপচে উঠছে।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় চোখ বুলায়, না নিজ নামটি খুঁজে পেলো না সে।

কপালে ঘাম জমে গেছে। আবার পড়ে। না, নেই।

চোখের দৃষ্টি কি কমে গেছে। অক্ষরগুলো এমন ঝাপসা লাগছে কেন। এ কারণেই কি নামটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আবারো পড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। না, নেই।

কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট। ভীষণ কষ্ট। মা! মাগো! এতো কষ্ট কেন!

একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। বিশাল আকাশ জুড়ে শূন্যতা। কেবলই শূন্য চক্রের আবদ্ধ সীমানায় যেন সে ঘুরছে, ভোঁ ভোঁ ঘুরছে।

সূর্য উঁকি দিচ্ছে। পূর্বাকাশের হালকা লাল রং মিলিয়ে গেছে। কড়া, রক্তিম লাল আলো স্ফীত হচ্ছে, বিস্তার লাভ করছে।

যন্ত্রণার নীল ছোরাটি যেন সালমানের ভিতরের নরম লালিত্য ফালা ফালা করে দিয়েছে। লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠছে।

সকালের সূর্য উঠছে, আর তার মনের সূর্য ডুবছে। তবে কি সে ঝরে যাচ্ছে সময়ের সুবর্ণ বর্তমান থেকে ?

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ও।

মাটি কাঁপছে, দুলছে। আকাশও দুলছে।

মাটি এতো নিষ্ঠুর কেন! কেন তার ভার বহন করতে পারছে না।

গেইট ধরে একটু দাঁড়ালো, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দাঁড়িয়েই থাকলো। বাম হাতে পেপারটি ঝুলে আছে, পড়ে যাচ্ছিল প্রায়।

রেখা ভিতর থেকে দেখতে পায় সালমানকে।

ছুটে আসে।

ভাইয়া! এমন লাগছে কেন তোমাকে। হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। সাড়া নেই সালমানের। বোবা এক সালমান যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পেপারটি দ্রুত হাতে মেলে ধরে রেখা। মেধা তালিকাটি নিমিষেই পড়ে শেষ করে। তারপরই বুক ফাটা এক চিৎকার দেয়।

রেখার চিৎকার শুনে বাবা জাহেদ চৌধুরী ছুটে আসেন। মা সালমা চৌধুরীও এলেন পিছু পিছু।

জাহেদ চৌধুরীও পড়লেন মেধা তালিকা। স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছু সময়ের জন্য।

বুকের ভিতর চাপা এক উত্তেজনা জট পাকাচ্ছে। ব্যথা হচ্ছে। তীব্র। তীক্ষ্ণ। পুরনো ব্যথাটি যেন জোরদার হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। মাথাটি ভার ভার লাগছে। পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়।

মিসেস সালমা চৌধুরী স্বামীকে ধরে ফেলেন, কোনো মতে বাসায় নিয়ে এলেন। রেখাও সালমানকে ভিতরে নিয়ে এলো।

বুকের ব্যথা বাড়ছেই, জাহেদ চৌধুরীর সেদিকে খেয়াল নেই। এলোমেলো হাতে আবার পত্রিকাটি ওল্টাতে লাগলেন। প্রথম বিভাগের ঘরে সালমানের রোল নম্বরটি খুঁজছেন।

রোল নম্বরটি কতো। মনে নেই।

সালমানের মুখে কথা নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

রেখা ছুটে গিয়ে অ্যাডমিটকার্ডটি নিয়ে এলো। রোল নম্বরটি দিলো বাবাকে।

তন্নতন্ন করে খুঁজলেন নম্বরটি, পত্রিকার পাতা চোখের কাছে এনে দেখছেন জাহেদ চৌধুরী। না, প্রথম বিভাগেও সালমানের নম্বরটি নেই। দ্বিতীয় বিভাগে নেই, তৃতীয় বিভাগেও নেই।

তবে কি কোনো কারণে ফল স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

একটু যেন শক্তি ফিরে পেলেন তিনি।

নির্মম সত্য এই যে, স্থগিতের কলামেও নম্বরটি নেই।

নো, নেভার। হতেই পারে না।

ভয়াবহ চিৎকার দিলেন, দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছেন। দরদর করে বেরিয়ে আসছে ঘাম। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে যেন বেরিয়ে এলো সকল কষ্ট, যন্ত্রণা। নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি।

সালমা চৌধুরী স্বামীর মাথাটি সোফায় এলিয়ে দিলেন। ছুটে গেলেন টেলিফোনের কাছে। ফায়ার বিগ্রেড খুব কাছেই, ফোন করলেন সেখানে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স চলে এলো।

আশেপাশের অনেকেই চলে এসেছে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শুনে। ত্বরিত গতিতে রোগীকে তোলা হলো। পুঁ পুঁ করে সাইরেন বাজিয়ে ছুটছে অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালের করোনারী কেয়ার ইউনিট।

পুরো রুমটিতে সেন্ট্রাল এসি সিস্টেমের আওতায়। এয়ারকুলারের ঝিম ঝিম শান্ত পরিবেশে শুয়ে আছেন জাহেদ চৌধুরী। পাশে বসে আছেন বেগম চৌধুরী, ভিতরে থাকার অনুমতি পেয়েছেন তিনি।

কার্ডিয়াক মনিটরটি চলছে। এক ধরনের শব্দ বেরুচ্ছে, টু... টু.ং. টু...টুং. টু.... টুং....

মনিটরটির স্ক্রিনে আঁকাবাঁকা রেখাচিত্র ভেসে আসছে একপাশ থেকে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্য পাশ দিয়ে। লাল দাগগুলোই যেন কেবল জীবনের স্পন্দন ঘোষণা করছে।

সালমা চৌধুরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে অক্সিজেন মাস্ক। চোখ দু'টো বোঁজা। সেলাইন ড্রিপ চলছে। বুক ওঠানামা করছে। শ্বাস-প্রশ্বাস কি একটু দ্রুত চলছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পরবর্তী কম্প্লিকেশন সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত নন তারা। অনিশ্চিত শংকা বুকে ধারণ করে বসে আছেন মিসেস চৌধুরী।

বাসার অবস্থা অন্যরকম। সবাই আসছে। দেখে যাচ্ছে সালমানকে। প্রিন্সিপাল স্যারও এসেছেন।

সালমানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ঝাঁকুনি দেন,

সালমান কথা বলো। তুমি ফেল করতেই পারো না। আজই আমি বোর্ড অফিসে যাবো, খাতা রিভিউ করার জন্য আবেদন করবো।

সালমান নিশ্চুপ। ফ্যাকাসে চোখে স্যারের মুখের দিকে তাকায় একবার।

স্যারের চোখে পানি এসে গেছে। স্পন্দনহীন সালমানের শূন্য চোখের দিকে তাকিয়ে ওঁনার যেন বুক ভেঙে গেছে।

প্রিন্সিপাল স্যার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলা এসে সামনে দাঁড়ায়। নীলার পরণে হালকা নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ। ড্রেসটি সালমানের খুব প্রিয়।

নীলাকে যেন চিনতেই পারলো না সালমান।

বুক ভেঙে হু হু করে কান্না বেরিয়ে এলো নীলার। এক ছুটে পালালো সামনে থেকে। পালিয়ে এলো রেখার রুমে। রেখা এলোমেলো শুয়ে আছে।

একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। তুমুল কান্নায় আছড়ে পড়লো উভয়ই।

বোর্ড অফিসের সামনে শত শত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের ভিড়। কেবল সালমান নয়। অনেক মেধাবী ছাত্রের রোল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই প্রতিবাদ জানাতে এসেছে, খাতা পুনঃনিক্ষণের জন্য দরখাস্ত নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কম্পিউটরের মাধ্যমে নাম্বার টেবুলেশন হয়েছে। কম্পিউটরের মাধ্যমে ফল প্রকাশিত হয়েছে।

তবে কি কোথাও বড় গলদ হয়েছে। প্রোগ্রামিং-এ কি ভুল হতে পারে না।

না, পারে না। আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম এশিয়ার মধ্যে অনেক বেশি উন্নত, বিশ্বস্ত। কন্ট্রোলার সাহেব গর্ব করে বললেন।

একটি বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, সালমানের টিচার রুমে ঢুকলেন। কন্ট্রোলারের সামনে বসেছেন। মুখ তাঁর থমথমে। ভারি কণ্ঠে বললেন, যে ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হতে পারে, সে কি উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল করতে পারে?

কন্ট্রোলার থতমত খান। চিন্তিত হয়ে পড়েন।

প্রিন্সিপালের একটি সরাসরি প্রশ্নে কম্পিউটার নিয়ে উঁচু গর্ব মুহূর্তের মাঝে উধাও হয়ে গেল।

সকলের দরখাস্ত গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন তিনি।

সারারাত ঘুম হয়নি নীলার। ভোররাতের দিকেই উঠে বসে আছে। ক'দিনেই পুরো স্বভাব পাল্টে গেছে যেন।

শরীরের অণুতে অণুতে নাম না জানা কষ্টের প্লাবন, একই চিন্তা বার বার ঢুকছে মগজে, বিক্ষিপ্ত করছে ওকে।

কলিং বেলের শব্দে চমক ভাঙলো। গেইটের উপর দিয়ে টুপ কর ভিতরে পড়লো আজকের দৈনিক পত্রিকা।

পত্রিকাটিকে বড় শত্রু মনে হলো। পত্রিকা তার ভালোবাসার মানুষের নাম ছাপেনি।

অনিচ্ছা সত্বেও উঠলো সে। পত্রিকাটি হাতে নিলো। প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন দেখে চমক লাগলো।

"কম্পিউটারের রেজাল্ট প্রকাশে বিভ্রাট ঃ হাজার হাজার ছাত্রের ফল প্রকাশিত হয়নি।"

আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট হেড লাইন চোখে গেঁথে গেল। "সালমান শাহ মেধা তালিকায় তৃতীয় ঃ ফেল করেনি।"

পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলো, আনন্দ-জোয়ার যেন মুহূর্তের মাঝে ভাসিয়ে দিলো ওকে।

মা! মা! দেখো। পত্রিকাটি সে মায়ের হাতে তুলে দেয়। তিনিও খবরটি পড়লেন।

একটি সাবজেক্টে সালমান ৯২ পেয়েছিল অথচ কম্পিউটারে ভুল করে রিডিং দিয়েছে ২৯। নীলা পত্রিকাটি হাতে নেয়। এতো ভোরে নিশ্চয় কেউ পত্রিকা পড়েনি, খবর পায়নি কেউ। সেই-ই প্রথম খবর দেবে সালমানকে।

দ্রুত ঘর থেকে বের হয়, রিকশা নেয়। বাসা কাছেই। ছুটে আসে নীলা সালমানদের বাসায়।

রেখা খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে। মা বাসায় নেই। বাবার সঙ্গে হাসপাতালে। সালমান ঘুমাচ্ছে। ওকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল রাতে।

ঝড়ের বেগে নীলা এসে ওদের রুমে প্রবেশ করে। রেখাকে কিছুই বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুমন্ত সালমানের চুল খামছে ধরে।

সালমান ! সালমান! ওঠো ! ওঠো!

করছিস কি! রেখা এক ধাক্কা দেয় নীলাকে।

দেখ্! পেপার দেখ্।

রেখা পেপার হাতে নেয়। আনন্দে বিমূঢ় হয়ে যায়।

সালমান চোখ খুলেছে। দীর্ঘ ঘুমের পর মগজ যেন হালকা লাগছে। নীলাকে দেখে চোখ খুলেই। নীলার আনন্দ মুখ যেন ওকে টেনে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো।

নীলা হাঁটু গেড়ে বসলো সালমানের পাশে।

সালমান, দেখো, তুমি তৃতীয় হয়েছো! দেখো, নতুন করে মেধা তালিকা ছেপেছে পত্রিকা।

সালমানের চোখ বেয়ে গড় গড় করে নেমে আসে অশ্রু বিন্দু। কয়েক ফোঁটা পড়লো নীলার ডান হাতে। হাতটি সে নিজ গালের সঙ্গে ঘষে।

আহ্! ভালোবাসার মানুষের আনন্দ এতো শান্তির !

নীলার চোখ দিয়ে টসটস করে ধেয়ে আসে অশ্রু।

সালমান দু'হাত দিয়ে মুছে দেয় ওর চোখের পানি। এই পানি এতো মধুর! এতো মধুর! প্রশান্তিতে চোখ বুঁজে আসে সালমানের।

রেখা ছুটে গেছে টেলিফোনের কাছে।

ডায়াল করে হাসপাতালে।

হ্যালো, কাকে চাচ্ছেন? একটি ভারি গলায় শোনা গেল।

জ্বি, আমি করোনারী কেয়ার ইউনিটের পাঁচ নম্বর রোগীর মেয়ে, একটু আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলবো। মা রোগীর পাশেই আছেন।

লাইনে থাকুন প্লিজ।

একটু পরই সালমা চৌধুরী এলেন।

মা... মা...। গলা যেন আটকে যাচ্ছে। কিছুই বলতে পারছে না রেখা।

কি হয়েছে রেখা। মায়ের কণ্ঠ উদ্বিগ্ন।

ভাইয়া তৃতীয় হয়েছে মা। নতুন করে মেধা তালিকা ছেপেছে আজ পত্রিকায়। ভাইয়া কথাও বলছে এখন। বাবা কেমন আছে মা?

সালমা চৌধুরীর চোখেও পানি চলে এলো।

একটি ভুল নিউজ পুরো পরিবারকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। কিছু কিছু ভুল শোধরানো যায়, কিছু ভুল শোধরানো যায় না।

বুলেট বিদ্ধ ভুলটির ধকল কি জাহেদ চৌধুরী কাটিয়ে উঠতে পারবেন! সময় কি অপেক্ষা করছে তার জন্য! চিকিৎসকরা এতো উদ্বিগ্ন কেন!

মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না তিনি।

মনে হচ্ছে সালমানের রেজাল্টটি বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সম্মুখ দিনে সৌরভ ছড়াবে চারিদিকে। সেই সৌরভ অবশ্যই আনন্দের, আকাঙ্খিত। কিন্তু প্রিয়তম স্বামীটি হয়ত আর তার ভাগ পাবে না। স্বামীর এখনো হুঁশ ফেরেনি। অবস্থা খারাপ হচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায়।

কথার জবাব দিচ্ছে না কেন, মা?

মেয়ের তীব্র প্রশ্নও তার মুখ খুলতে পারলো না। হুঁ হুঁ করে কেবল কান্না শুরু করলেন তিনি।

একটি ভুলের মাসুল কি সারা জীবনভর তাকেই বহন করতে হবে।

সালমান ছুটে এলো, রেখার হাত থেকে দ্রুত রিসিভারটি কেড়ে নিলো, মা। মা! কেমন আছো? বাবা কেমন আছে?

ছেলে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল. আবার তার মুখে কথা ফুটেছে, চরম কষ্টের মাঝেও মায়ের মন জুড়িয়ে গেল।

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, বলার সুযোগ পেলেন না।

নার্স চিৎকার করে ডাকছে, এই যে মিসেস চৌধুরী, তাড়াতাড়ি আসুন। তাড়াতাড়ি। সম্ভবত আপনার স্বামী.....কথা শেষ করলো না নার্সটি।

বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠলো, টেলিফোনের রিসিভারটি ঠাস করে রাখলেন টেবিলে, ছুটে এলেন স্বামীর কাছে।

সালমানের কানে এখনো রিসিভার ধরা। একটু পরেই সে গগনবিদারি এক চিৎকার শুনতে পেলো। মায়ের চিৎকার, বুক ফাটা আর্তনাদ।

ব্যাখ্যা ঃ

অবিশ্বাস্য ভুল সংবাদে সাফল্যের স্বর্ণচূড়া থেকে খসে পড়েছিল সালমান। তীব্র বেদনাদায়ক এই সংবাদে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। এটি ছিল acute traumatic event (psycholocical trauma)। গল্পের প্রতিটি ধাপে এটির প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক তীব্রদহনে acute stress reaction ঘটে সালমানের ভেতর। সঠিক নিউজটি সেই স্ট্রেস লাঘব করে। উপসর্গের ছোবল থেকে দ্রুতই রিলিজ পেয়ে যায় সালমান। কিন্তু তার বাবা রেহাই পায়নি। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ ধরনের stress এভাবেই আঘাত হানে। আবারই বিষয়টির ব্যাপারে পূর্ব ধারণা থাকা উচিত। মূলত গল্পের শেষ দৃশ্যে স্পষ্ট করে বলা না হলেও জাহিদ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন।

কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানমনস্ক মন
কল্পনার রথে যখন ভেসে যায় ওরা দুজন

সামনে পরীক্ষা।

সময় যেন তরতর করে বয়ে চলেছে। পরীক্ষা নামক বিভীষিকাটি ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে পিছন পানে।

এত দ্রুত চলে পরীক্ষার সময়ের কাঁটা! এত দ্রুত সামনে এসে দাঁড়ায় যমদূতের মতো।

শেষ রাতের দিকে ঘুম থেকে উঠেছে জ্যোতি। বুক শুকিয়ে গেছে, দুরুদুরু করছে। টেবিলে বসেছে পড়তে। পড়ার রুমে সে একা। কিছুক্ষণ পূর্বে টিউব লাইটটির সুইচ অন করেছে। আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেছে চারিদিক। জানালার ফাঁক গলিয়ে থোকা থোকা মিষ্টি আলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে বাইরে।

বই খুলে শিউরে ওঠে। প্রিপারেশন খুব খারাপ। মনে হচ্ছে এতদিন যা পড়েছে সব গুলিয়ে গেছে, কিছুই মনে নেই। বইয়ের পাতায় মনস্থির করার চেষ্টা চালায় সে।

হঠাৎ দুটি কাক সমস্বরে কা কা ডাক জুড়ে দেয়। রাতের নিস্তব্ধ নির্জনতা ছিঁড়ে গেছে। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই।

উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। দুশ্চিন্তার থমথমে বোঝাটি ক্রমশ ভারি হচ্ছে, মগজে চাপ সৃষ্টি করছে।

দুর্ভাবনার চারাটিও দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে, দ্রুত শেকড় বিস্তার করছে, দ্রুত যেন নিঃশেষ করে দিচ্ছে মগজের উর্বর রসাল উপাদান।

হা হা শূন্যতাও ক্রমশ ঘিরে ফেলছে ওকে। টেবিলে রয়েছে বিশাল সাইজের একটি গ্লোব।

গ্লোব ম্যাপটির গায়ে হাত বুলায় সে। চমৎকার, সশৃণ। স্ট্যান্ডটিও আকর্ষণীয়, অর্ধবৃত্তের মতো চাকতির একটি বিন্দুতে বসে আছে এটি।

হাত দিয়ে ধাতব ম্যাপটি ঘুরাতে শুরু করে জ্যোতি, মুহূর্তের ঘূর্ণনে এশিয়া চলে যাচ্ছে, আসছে ইউরোপ, আসছে আমেরিকা। আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর মিলিয়ে যাচ্ছে সময়ের মাইক্রোতম বিন্দুতে চড়ে।

দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় জ্যোতির হাতের গতি। গ্লোবটিও ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে থাকে। একটু থমকায় ও। মনে হলো পৃথিবী নামক গ্রহটিকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ঘুরানো যাচ্ছে। স্থির, কঠিন দৃষ্টি নিয়ে ঘূর্ণায়মান গোলাকার ম্যাপটি দেখছে সে। হাত তুলে নিয়েছে। মনে হলো সৌরজগতকে কেন্দ্র করে পৃথিবী যে গতিতে ঘুরছে, তার চেয়ে বেশি গতি প্রাপ্ত হয়েছে গ্লোবটি। মনে হচ্ছে একই সঙ্গে তার ভিতরও সম-গতির সঞ্চার হয়েছে। তবে কি স্থির বর্তমান থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছে সে সম্মুখ পানে!

আইনস্টাইনের 'থিউরি অব রিলেটিভিটি' তো তাই-ই বলে।

স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যে গতিতে আবর্তিত হচ্ছি, তার চেয়ে দ্রুততর গতি লাভ করতে পারলে ছুটে যাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। সেই গতি হতে হবে আলোর গতির চেয়ে বেশি। বর্তমানে কয়েক যুগ পার হয়ে গেলেও সেই ভবিষ্যতে মাত্র এক বৎসর অতিক্রান্ত হবে, পাওয়া যাবে যৌবনের সুদীর্ঘতম সময়ের স্বাদ।

সত্যি কী তা আছে ভবিষ্যতে!

সত্যিই!

বড় লোভ জাগে জ্যোতির, বড়ই লোভ।

বর্তমানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে ভবিষ্যতে। অচেনা, অজানা ভবিষ্যৎ কেমন! কেমন!

তোলপাড় ঢেউ ওঠে বুকের ভিতর, যেন সে পেয়ে গেছে দুর্বার গতি, এই গতি আলোর গতিকে হার মানায়। মনে হলো মহাশূন্যে সময় এর চতুর্মাত্রিক স্তরে ক্লোজ টাইম কার্ভ নামে যে বলয় রয়েছে তার মাধ্যমে যেন সে পরিভ্রমণ শুরু করেছে।

সাঁ করে যেন বিশাল অন্ধকার সাম্রাজ্যে তলিয়ে গেল জ্যোতি।

অন্ধকার! অন্ধকার!

ভূতুড়ে অন্ধকারের গভীরতা এত বেশি! এটিই কী তবে ব্লাক হোল! এই কালো গহ্বর নিয়ে কী তবে বিজ্ঞানীদের এত হৈ চৈ!

সুদীর্ঘ অন্ধকারের আস্তরণ পেরিয়ে দড়াম করে সে এসে পড়লো আলোর জগতে। এখন চারিদিকে আলো, বিচ্ছুরিত আলো, কেবলই আলো। আলোর ঢলে ভাসতে ভাসতে পেয়ে গেল একটি ঝাঁঝালো সিঁড়ি।

সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে যাচ্ছে ওপরে, অনেক ওপরে।

এঁমা! এ কোন জগত! এ কোন ভবিষ্যৎ!

গাছ-গাছালির রং সবুজ নয় কেন। যেন তামাটে, লালচে। রাস্তাগুলো পিচঢালা নয়, যেন গোল গোল পাথর দিয়ে গড়া, উঁচু-নিচু।

গাড়িগুলোর সাইজ বিশাল, যেন বদ্ধ ট্যাংকের মতো ছুটে চলেছে কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে। ট্যাংকগুলো চলছে যেন পাথরের রাস্তা কামড়িয়ে। কোনো শব্দ নেই, ধোঁয়া নেই। রাস্তার উভয় পাশে বিরাট বিরাট অট্টালিকা; পাথরে গড়া। জমাট পাথর যেন উঠে গেছে উপরে, অনেক উপরে। কোনো জানালা নেই, দরজা নেই। খোপে খোপে কেবল এয়ারকুলার চোখে পড়ছে। পুরু গ্লাসও আছে মনে হলো। যেন গ্লাস নয়– ধবধবে শাদা পাথর আলোর প্রতিফলন ঘটাচ্ছে, ঝলমল করছে চারিদিক। কোথাও মানুষজন চোখে পড়ছে না। নির্জনতায় গা ছমছম করে ওঠে। এ কোথায় এলো সে। মাথায় হাত দিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

একটি ট্যাংক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওপরের ঢাকনি খুলে গেছে। তিনজন ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে। দুজন বেঁটে মতো। ওরা পুরুষ। একজন লম্বাটে, সুবেশী। শরীর বেশ পুরুষ্টু। চুল ছাঁটা। ছোট ছোট। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল পুরুষ। না। পুরুষ নয়। বুকের উঁচু ঢেলা দুটো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে এটি মেয়ে।

মেয়েটির সাজে যুদ্ধংদেহী ভঙিমা ফুটে আছে। উদ্ধত পায়ে সামনে আসে। কর্কশ স্বরে জানতে চায়, কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো? ভরাট স্বর, ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ।

জ্যোতির মুখে রা নেই, বাকরুদ্ধ।

আবারও ধমকে ওঠে মেয়েটি।

কথা বলো! কে তুমি?

চমক খেলো জ্যোতি, নড়ে ওঠলো। উদ্‌ভ্রমের মতো বললে, আমি জ্যোতি। পৃথিবী থেকে এসেছি।

পৃথিবী থেকে?

হ্যাঁ।

কবে? কখন?

কিছুক্ষণ পূর্বে আমার রিডিং রুমে বসে পড়ছিলাম। পৃথিবীর গ্লোব ম্যাপটি ঘুরাচ্ছিলাম। তারপর কি হলো জানি না। এখন আমি কোথায়?

বলছো কি তুমি! পৃথিবী তো বহু বৎসর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে, যুদ্ধে যুদ্ধে গুঁড়িয়ে গেছে, পরিবেশ দূষণের কারণে বিলীন হয়ে গেছে।

না, আমি বিশ্বাস করি না। জ্যোতির কণ্ঠে জোর ফিরে আসে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমার ব্যাপার। তবে পৃথিবীর স্থির বর্তমান থেকে তুমি শত বৎসর সামনে চলে এসেছো এই পাথুরে সাম্রাজ্যে। টের পাচ্ছো না কিছু? মেয়েটির প্রশ্নে যেন আর্দ্রতা ভেসে ওঠে।

কিছু তো টের পাচ্ছি। তবে সব কিছু অবিশ্বাস্য লাগছে। মনে হচ্ছে আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে।

অচেনা নারীটি একটু এগিয়ে আসে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে জ্যোতি।

ভয় পাচ্ছো কেন? ভয়ের কিছু নেই। তোমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেনি। সব ঠিক আছে। তুমি আমাদের জগতে চলে এসেছো। এ জগতের সবকিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাকে, এসো। বলতে বলতে মেয়েটি জ্যোতির কম্পমান হাতটি আলতো করে ধরে।

জ্যোতি একবার হাতটি ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, পারলো না। মনে হলো কঠিন এক পাথরের তলে পিষ্ট হচ্ছে তার কোমল হাতটি।

শোন, আমার নাম রেমিংটন ফ্লোরা। ওরা আমার দুই পুরুষ বন্ধু, টমি এবং র‍্যাগ।

বন্ধু দু'টি যেন দু'টি গোল পাথরের পিলার, যন্ত্রদানব। অনুভূতি বলে কোনো সত্তা এদের আছে বলে মনে হলো না।

জ্যোতির ভয় কিছুটা কেটেছে। তবে বিস্ময় কাটেনি। পুরুষ দুটিকে ভয়াবহ মনে হচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে কী ওরা ওর টুঁটি টিপে ধরবে। চোখ বড় বড় করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কপালে ভাঁজ পড়েছে।

ভয় পেয়ো না। ওদের ভয়ের কিছু নেই। ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমার হুকুমের এক পাও বাইরে যাবে না ওরা।

তুমি কি ওদের দলনেতা? শাসক?

ঠিক দলনেতা নই, শাসকও নই। তবে ওরা আমার সেবক। আমার ইচ্ছে পূরণ করা ওদের প্রধান কাজ।

আমিও কি তবে ওদের দলের একজন হলাম?

না, তুমি ওদের দলের কেউ হবে না। কারণ তুমি হচ্ছো কোমল পুরুষ। কোমল পুরুষ আমাদের অর্থাৎ পাথুরে সাম্রাজ্যের মেয়েদের খুব পছন্দ। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, এখন তুমি আমার। এ জগতের এটাই নিয়ম। তোমাদের পৃথিবীর উল্টো। এখানে নারীরা কঠিন। পুরুষেরা নারীদের ব্যবহার্য সামগ্রীর মতো। কোমল না হলে পুরুষদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখি না। আমরা মেয়েরা কেবল কোমল পুরুষ সন্ধান করে বেড়াই। কারও ভাগ্যে জোটে, কারও ভাগ্যে জোটে না। একজন কোমল পুরুষ জোগাড় করতে এখানকার মেয়েদের বহু বৎসর লেগে যায়। কোমল পুরুষরাই আমাদের ভালোবাসা পায়। যারা ভুল করে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে পৃথিবী থেকে ভবিষ্যতের পাথুরে সাম্রাজ্যে চলে এসেছে তাদের আমরা খুবই বুদ্ধিমান মনে করি। মনে

করি, ওরাই কেবল পারে আমাদের নারীত্বের স্বাদ পূরণ করতে। তুমি এখন আমার কাছে তেমনই একজন। আমার সম্পদ। কারণ তোমাকে আমি আগে পেয়েছি।

অ্যাঁ! আঁৎকে ওঠে জ্যোতি।

এত উৎকণ্ঠিত হচ্ছো কেন? উৎকণ্ঠার কিছু নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসব। আদর করবো। আমার অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে আসবে না। জীবন থাকতে পারবে না ছিনিয়ে নিতে।

জ্যোতির জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। যুবতী মেয়েটি ওর বাম কব্জি টেনে অগ্রসর হচ্ছে।

এক পা এক পা করে তাকেও অগ্রসর হতে হচ্ছে।

রেমিংটন ফ্লোরার চোখ দু'টো শক্ত পাথরের মতো। তবে আনন্দে চিকচিক করছে। কোমল পুরুষটির নরম দেহটিকে লোভাতুর চোখ দিয়ে লেহন করছে যেন।

ভবিষ্যতের পাথুরে মেয়েটির ভিতরও কী তবে ভালোবাসা আছে! দুঃখ আছে! যন্ত্রণা আছে! আছে কী যৌবনের কামাগ্নি, ইন্সটিংক্ট ?

বোঝার চেষ্টা করে জ্যোতি। বুঝতে পারছে না।

ওরা কেবলই কী জড় পদার্থরূপী পাথুরে মানুষ ?

ওরা কী পৃথিবীর মানুষের মতোই ছিল ?

প্রাকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী ওদের এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ?

জড় রূপ কী এ কারণেই!

পদার্থ বিদ্যার ছাত্র ও।

সাইকোকাইনেসিস নিয়ে নিজে এক সময় গবেষণা করেছে। জড় পদার্থের ওপর মানসিক শক্তির প্রয়োগকেই সাইকোকাইনেসিস বলে।

এই বিদ্যার অল্প কিছু জ্ঞান কাজে লাগানো যাক। নিজেকে শক্ত করে। মনকে শক্ত করে। মেয়েটিকে জড় পদার্থ ভাবতে থাকে। নিজের মনের প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সাইকোকাইনেসিসের মাধ্যমে মেয়েটির অণু-পরমাণুগুলোর চরিত্র বোঝার চেষ্টা চালায়।

তাজ্জব বনে যায় জ্যোতি।

রেমিংটন ফ্লোরার বাইরের আবরণটিই কেবল কঠিন। ভিতরে রয়েছে অণুতে অণুতে আসক্তি। চুম্বকীয় গুণাবলী।

এই চুম্বকত্বই কী নারীকে পুরুষের দিকে টানে? পুরুষকে নারীর দিকে?

মেয়েটির কঠিন ড্রেসের আবরণটিকে ছিমছাম, সহজ ভাবতে পারছে না। নিজের উপলব্ধিকে নিশ্চিত ভাবতে পারছে না। তবে জ্যোতির স্মৃতির দরজায় তালি বাজতে থাকে। নিগারকে নিয়ে পুরনো একটি ঘটনা মনে পড়ে ঃ

রেমিংটনের ভিতরের সত্তার সঙ্গে নিগারের চরিত্রের একটা মিল খুঁজে পেতে চেষ্টা করে সে।

নিগার ওর বান্ধবী। ক্লাসমেট।

নারীত্বের সকল সৌন্দর্য নিগারের ভিতর স্পষ্ট। শরীরের বাঁকগুলো তীব্র আলোড়ন তোলে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হাসিটি দেখার মতো, মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ, হাসির মোহনীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করা কঠিন। দুর্বার আসক্তি জ্যোতিকে প্রতিক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়। একদিন দেখতে না পেলে বুকের ভিতর ফুটতে থাকে টগবগে ঢেউ, অশান্তির ঢেউ। এই ঢেউ সামাল দেওয়া ভীষণ কষ্টসাধ্য।

নিগারও একা পেতে চায় জ্যোতিকে। চায় জ্যোতি তার দরজা জানালা সব ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিক, গুঁড়িয়ে দিক লজ্জা-নম্র যৌবনের নরম দেয়াল।

জ্যোতি চেষ্টা করে, ধাপে ধাপে পা রাখে। সিঁড়ি ভাঙে, ওপরে ওঠে, নামে। উষ্ণ স্রোতে ভেসে যায় একুল-ওকুল।

নিগারের মুখে হাসি ফোটে, শান্তির হাসি। সেই হাসি ব্যাকুল করে জ্যোতিকে, কাতর করে। তৃপ্তিমাখা মুখেই বলে, তোমাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হয়। চলো বিয়ের বাঁধনটি সেরে ফেলি।

কী ? ভুরু বাঁকিয়ে, কপাল কুঁচকে বিরক্তি নিয়ে প্রশ্ন করে নিগার।

জ্যোতি একটু চুপসে যায়। থমকায়। তারপরই বলে, বিয়ে করি, চলো ঘর বাঁধি। তাহলে সারাক্ষণ তোমাকে কাছে পাবো।

হাসতে শুরু করে নিগার।

বিয়ে হচ্ছে পঁচা শ্যাওলার মতো। একবার পায়ে লাগলে লেপ্টে থাকে, পিচ্ছিল, বিরক্তিকর। তাছাড়া সব সময় কাছে পেলে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে, এক ঘেয়ে লাগবে আমার উপস্থিতি। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এখন তোমাকে ভালো লাগে, তুমি আছো। যখন তোমাকে ভালো লাগবে না, থাকবে না। অন্য কেউ আসবে, অন্য কেউ। বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়ে নিগার, লুটিয়ে গড়াগড়ি খায়।

দেখো, এত কঠিন হয়ো না। এ চিন্তা বাদ দাও। ওতে সুখ নেই। ক'দিন পর শরীরে ভাটা পড়বে। শরীরটাই সব নয়। মনটাও বড়। তাছাড়া সন্তান, মাতৃত্ব বিয়ে ছাড়া পূর্ণ হয় না, বৈধ হয় না।

বৈধতার জন্য কাগজের মোড়কে আবদ্ধ হতে হবে? মানি না আমি। প্রমাণ করবো, বিয়ে ছাড়াও মাতৃত্ব পূর্ণ হয়। সন্তানের পূর্ণ অধিকার নারীরা পাবে, ধারণ করবে। দেখে নিও। জেনারেশন বদলে যাচ্ছে। সেই বদলের হাওয়া কী আমরা উপেক্ষা করবো?

থ' বনে যায় জ্যোতি। নিজস্ব 'প্রিকগনিশন' সত্তা তথা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিটি জ্বল জ্বল করে ওঠে। ভবিষ্যতের অনেক কিছুই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

নিগারের ভবিষ্যৎ রূপটি যেন দেখতে পাচ্ছে জ্যোতি।

অন্ধকার। ঝড়ো হাওয়াই এলোমেলো, লণ্ডভণ্ড অন্য এক নিগার যেন এক যুগ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হতাশা ব্যর্থতা এবং মলিনতা যেন ওকে ঘিরে আছে। কাঁদছে সে কেবল, কেঁদেই দিন পার করছে। অলঙ্ঘনীয় একটি কঠিন দেয়ালের ঘেরাটোপ যেন ওর জীবনকে বন্দী করে রেখেছে।

কী ভাবছো পৃথিবীর যুবক? রেমিংটন ফ্লোরা আচমকা প্রশ্ন করে। হাত ধরে আছে জ্যোতির, ট্যাংকের মতো গাড়িটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জ্যোতি ধাতস্থ হয়, বিচলিতও হয়। নিগারকে নিয়ে পুরনো 'প্রিকগনিশন' দৃশ্যটির মিল খুঁজে পেতে চেষ্টা করে এ মুহূর্তে।

নারীতে নারীতে মৌলিক একটা মিল আছে যেন। কেন এ সাদৃশ্য, ভালো করে বুঝতে পারে না সে।

রেমিংটন কী আসলেই নিগারের ভবিষ্যৎ রূপ! তবে কী নিগার মহাশূন্যের "ক্লোজটাইম কার্ভ" নামক বলয়ের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে তার আগেই এ জগতে চলে এসেছে? এই রূপ ধারণ করেছে? হতেই পারে না।

মাথাটি ভোঁ ভোঁ করে ওঠে। কিন্তু বুকে সাহস জাগে, একটু শক্তি প্রয়োগ করে থমকে দাঁড়ায়। কঠিন কণ্ঠে জানতে চায়, পুরুষ নিয়েই কী কেবল তোমাদের কারবার? কোমল পুরুষদের কী কেবল তোমরা তোমাদের সম্পদ মনে করো?

হ্যাঁ, ওরা কেবল নারীদের সম্পদ। নারীদের মনোরঞ্জনই তাদের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর নারীদের উল্টো চরিত্র ধারণ করেছি। পরিবেশ, প্রকৃতির কারণে নারীদের 'ক্রোমোজম' এবং 'জিনের' স্বরূপ পাল্টে গেছে। এখানকার নারীরা তাই ক্ষমতাধর, পুরুষরা নারীদের অধীন।

ফ্লোরার আচরণে এখনও নিষ্ঠুরতার কোন প্রমাণ পায়নি ও, তবে উদ্বেগ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। নারীর অধীন থাকার সংকটজনক পরিস্থিতি কিছুতেই মানতে পারছে না। নিজস্ব 'জিনের' প্রকৃতি কিছুতেই তা মেনে নিতে পারবে না। তাই পালানোর চিন্তা দ্রুত মাথার ভিতর চক্কর খেতে শুরু করে।

রেমিংটন মৃদু হাসে। হাসিমুখেই বলে,

পালানোর চিন্তা ত্যাগ করো। পালাতে হয়তো পারবে, কারণ তুমি বুদ্ধিমান। তবে পালিয়ে পূর্বের পৃথিবীতে যেতে পারবে না, যেতে চাইলে যেতে পারবে অন্য জগতে, সেখানে নিষ্ঠুর ভয়াবহতা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। অলৌকিকভাবে যদি পৃথিবীতে পৌঁছতে পারো, দেখবে তোমার বান্ধবী বুড়িয়ে গেছে, তার বয়স বেড়ে গেছে কয়েক যুগ বেশি। আমরা কেবল কোমল পুরুষদের অধীন করে রাখি না, ভালোবাসাও দেই।

জ্যোতির কপালে ঘাম জমে গিয়েছিল। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মোছে। বড় বেশি ভালোবাসার কাঙাল সে। ওর মুখে আবারও ভালোবাসার কথা শুনে আতঙ্ক কমে আসে।

রেমিংটন গাড়িটির কাছাকাছি চলে এলো। ইশারায় টমি এবং র‍্যাংগকে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্যোতিকে ঘিরে ধরলো।

ভীতিকর অবস্থা। নিজের ভিতর কাঁপুনি টের পাচ্ছে সে। নিজের অজান্তেই পাথুরে মেয়েটির হাত শক্ত করে চেপে ধরে। নির্ভরতা খোঁজে রেমিংটনের কাছে।

নির্ভরতা সহজে আসে না। যেখানে ভয় এবং আতঙ্ক পদে পদে জড়িয়ে থাকে, নির্ভরতা সেখানে পালিয়ে যায়।

উপায়হীন জ্যোতি কঠিন হাতটির সংস্পর্শে দ্বিধাগ্রস্ত।

'টেলিপ্যাথি' তথা দূরচিন্তার অদৃশ্য সুতো বাঁধার চেষ্টা করে মেয়েটির মনের সঙ্গে। এও এক প্রকার শক্তি, অর্জন করতে হয়। বিপদে পড়লে মানুষ অলৌকিক অনেক কিছুই পেয়ে যায়। সেও যেন পেয়ে গেছে একই শক্তি।

রেমিংটন কী ভাবছে, বোঝার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ, যেন বুঝতে পারছে।

কঠিন পাথুরে মেয়েটির মনের গোপন ঘরের জীবন্ত চিত্রটি যেন দেখা যাচ্ছে। এ নারীর সঙ্গে আদিমতম নারীর কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল খোলসে, বহিরাবরণে, শক্তিমত্তায়।

মনের আলো দিয়ে মেয়েটির কোমল রূপটি দেখতে শুরু করে। ভিতরের রূপ অপরূপ। বিস্ময়কর সৌন্দর্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ তরঙ্গ যেন নিজ দৃষ্টি শক্তিকে অবশ করে দিচ্ছে। মস্তিষ্কে তোলপাড় শুরু হয়েছে, পজিটিভ স্পন্দন সৃষ্টি হচ্ছে। তবে কী মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে জ্যোতি!

নিজেকে সামলে নেয় ও।

মনের আলো নিয়ন্ত্রণে আনে। খোলা চোখে মেয়েটিকে ভালো করে পরখ করে।

উহ! এত কুৎসিত! এত কুৎসিত মেয়েটির মুখের বাইরের ছাঁচ!

কুৎসিত মুখের আদলটি যেন মুহূর্তে কুপিয়ে হত্যা করলো মনের শাণিত সৌন্দর্যবোধকে।

চোখ বন্ধ করে জ্যোতি চিৎকার দিয়ে ওঠে। শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়, রি রি করে ওঠে পুরো শরীর। ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আসে মুখ।

রেমিংটন বিকৃত উচ্চারণটি শুনে শক্ত করে ধরে জ্যোতিকে। কব্জিতে জোরে চাপ দেয়।

একটু ব্যথা লাগে, তবুও নিজের মাঝে নিজেকে ফিরিয়ে আনে, দ্রুত চিন্তা করতে থাকে, পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে থাকে জ্যোতি।

ভিতরের মাধুর্যময় রূপের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু বাহিরের কদর্যতা মেনে নেওয়া কঠিন।

নিজের ভিতর আবারও সন্ত্রস্তভাব জেগে ওঠে। নিজের ব্রেইন নিজেই যেন ওয়াশ করে নিলো সে। পালানোর চিন্তা দুর্বার হচ্ছে। কোনো মতেই কুৎসিত মেয়েটির সঙ্গে জড়ানো যাবে না।

ওরা ট্যাংকের মতো বদ্ধ গাড়িটিতে ওঠায় জ্যোতিকে। ওকে শক্ত করে ধরে বসেছে রেমিংটন। শরীরের সঙ্গে শরীর ঘেঁষে বসেছে, যেন শরীরের উত্তাপ নিচ্ছে মেয়েটি। টমি এবং র‍্যাংগ মেয়েটির ইশারায় বাইরে থেকে যায়। গাড়িতে এখন কেবল ওরা দু'জন, জ্যোতি এবং রেমিংটন ফ্লোরা।

গাড়িটি স্টার্ট দিয়েছে রেমিংটন। অটোকন্ট্রোল সিস্টেম। ঝড়ের বেগে ছুটছে গাড়ি। চালক সামনের দিকে তাকাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে জ্যোতির দিকে।

ফ্লোরার চোখে নেশা। মাদকাসক্তির নেশার চেয়েও তীব্র, ভয়ংকর। যেন চুষে নিচ্ছে জ্যোতির ঝলসানো পুরুষত্ব।

জ্যোতি চোখ বন্ধ করে।

বিপদে ধৈর্যহারা হয়নি মোটেই। বরং দুঃসাহসী হয়েছে।

'সাইকোকাইনেসিস শক্তি' এ মুহূর্তে পুরোপুরিই সে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, প্রয়োগ করতে থাকে নিমগ্ন চিত্তে।

যান্ত্রিক গাড়িটি হঠাৎ থেমে যায়।

উল্টো দিকে চলতে শুরু করে। গাড়িটির গতি এখন জ্যোতির করায়ত্তে। ছুটছে, দ্রুত, দ্রুততম গতিতে। আলোর গতির চেয়েও যেন বেশি গতি পেয়ে গেছে গাড়িটি। মহাকালের 'ক্লোজ টাইম কার্ভের' উল্টো রথে এখন ছুটছে ওরা অতীতের দিকে।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে.....গড়িয়ে যাচ্ছে সময়.....অনন্তের পথে।

ধ্যানমগ্ন জ্যোতির হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে এলো। পাশে বসা কঠিন মেয়েটির কাঠিন্য যেন টের পাচ্ছে না সে। ঘাড় শক্ত। সামনে তাকিয়ে আছে। আড়চোখে রেমিংটনকে দেখার চেষ্টা করলো।

বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু ছানা বড়া।

পেশীবহুল পাথুরে মেয়েটির স্বরূপ বদলে গেছে।

একেবারেই নগ্ন এক নারী তার পাশে বসা। কোমল অথচ মায়াবি। সুন্দর, সুন্দরতম মুখের তীক্ষ্ণ আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। উন্নত গ্রীবা, চিকন কটিদেশ, সুডৌল বুকের গভীর উপত্যকা জ্যোতির চেতনাশক্তি যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে।

বোকার মতো নিজ দেহের দিকেও তাকালো সে একবার।

সেও নগ্ন, শরীরের সুঠাম পুরুষালি গঠন যেন তাকেও বদলে দিয়েছে। মহাকালের রহস্যময় ঘূর্ণিপাকে কত বৎসর কাটিয়েছে তারা! কত যুগ!

তবে কী তারা আদিম নর-নারীতে বদলে গেল! অতীত যুগে চলে এসেছে!

পরবর্তিকালে নতুন রেমিংটনের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে আছে। তাকিয়ে আছে জ্যোতির চোখের দিকে। আবেগ, আনন্দে উদ্বেলিত উভয়ই।

দুজনেই বাইরে তাকায় এবার।

এ কোনো জগত!

এ পৃথিবী নয়, পাথুরে সাম্রাজ্য নয়, অতীত নয়, বর্তমানও নয়।

ওরা যেন ভাসছে মহাকালের চতুর্মাত্রিক স্তরে। অনন্ত যাত্রা পথে ওরা যেন হারিয়ে যাওয়া দু'জন নর-নারী। পথের সন্ধান চায় না, ওরা যেন কেবল অনন্তের নিঃশীম শূন্যতায় চায় একে অপরকে, চায় অনন্ত যৌবন।

দু'বাহু বাড়ায় জ্যোতি।

রেমিংটন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সুঠাম বুকে।

আহ্! বুকের ভেতর যেন হঠাৎ সমুদ্র জেগে উঠেছে। উত্তাল ঢেউ। তীব্র স্রোত। উথালপাতাল ঝড়ো বাতাসে যেন দুলছে উড়ন্ত যানটি।

রেমিংটনকে বুকে নিয়ে কি অনন্ত যৌবনের সময়ের চাকায় সেঁটে গেল জ্যোতি?

কোথায় যেন ঠাস ঠাস শব্দ হচ্ছে। তীক্ষ্ণ একটি ঝাঁকুনি খেল উভয়ে। ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে চারিদিক। বিদ্যুৎ সংযোগ কি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্ধকার লাগছে কেন। মাথাটিও যেন ঘুরে উঠলো ভোঁ ভোঁ করে।

সজোরে চোখ বুঁজে ফেললো জ্যোতি।

আবারো শব্দ। ঠাস ঠাস ঠাস।

একটু পরই চোখ খুললো। চমকে ওঠে সে। চারিদিক তাকালো, গোল গোল চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

কোথায় রেমিংটন? এ যে তার পড়ার রুম। বাহিরে ভোরের কাঁচা রোদ। হালকা বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে।

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

'জ্যোতি! এই জ্যোতি! উঠেছো?'

একি! এ যে ভাবীর কণ্ঠ।

তবে কী এতক্ষণ নিজের টেবিলেই বসেছিল ও! বিজ্ঞানের সূত্রগুলোই কী তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনন্ত সময়ের দেশে ?

মাথাটি এবার সত্যিই টনটন করে ওঠে। রেমিংটনের জন্য মনটি কাহিল হয়ে পড়ে।

কাঁপতে কাঁপতেই উঠে দাঁড়ায় সে, দরজা খোলে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বড় ভাবী। মুখে মৃদু হাসি। হাতে চায়ের কাপ। কাপ থেকে শাদা ধোঁয়া উড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। যেন শূন্য চক্র চুষে নিচ্ছে বুকের সব ঐশ্বর্য, ভালোবাসা।

ব্যাখ্যা ঃ

পরীক্ষার সময় আমরা তীব্র মানসিক চাপে ভুগে থাকি। এ সময়ে arousal অত্যধিক হলে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নানা চিন্তা মাথায় উঁকি দেয়।

তবে চিন্তাগুলো নিজস্ব জ্ঞান এবং পরিমণ্ডল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। জ্যোতি পরীক্ষার চাপে অনেক বেশি উদ্দীপ্ত ছিল, ব্রেইন অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। তাই নিজস্ব জ্ঞান ঃ থিওরি অব রিলেটিভিটি, টাইম ট্রাভেল, সাইকোকাইনেসিস, টেলিপ্যাথি, সর্বোপরি জেনেটিক মিউটেশন প্রভৃতি সূত্রের ওপর ভর করে অন্যমনস্কভাবেই কল্পনায় বিচরণ করেছে মাত্র। পাথুরে মেয়েটিকে অদ্ভূত মনে হলেও মঙ্গল গ্রহে জড় অস্তিত্বে যে প্রাণের আলামত পাওয়া গেছে সেই তথ্যটিই এখানে কল্পনার জালে বিন্যস্ত হয়েছে।

এভাবে অতি চাপে আমরা বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও, একটি নির্দিষ্ট সূতোর টানে আবার নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। গল্পের শেষাংশে তাই অতি অবাস্তব থেকে জ্যোতি বাস্তবের দরজায় ফিরে আসে।

সবই ঘটে কল্পনাবিলাসী মনের ক্ষুরধার চিন্তা শক্তির কারণে।

মনের ঘৃণা ও ভালোবাসা
প্রসঙ্গ ঃ ছোবল

তনুজা'পু। এই আপু! ওঠ! ওঠ! ন'টা বেজে যাচ্ছে। ভার্সিটিতে যাবি না? গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলতে থাকে ছোট বোন তামান্না।

তনুজা আড়মোড়া ভাঙে। চোখ খুলতে চাইছে, পারছে না খুলতে। পাতা দুটো যেন লেগে আছে।

সারারাত ঘুম হয়নি ওর। বিছানায় কেবল এপাশ-ওপাশ করেছে। আজকাল প্রায় এমন হয়, রাতে একটুও ঘুম হয় না। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসে, গাঢ় হয় সাতটা আটটার দিকে।

গাঢ় ঘুম ভেঙে কি আর উঠতে মন চায়।

জোর করে উঠে বসার চেষ্টা করলো সে। চোখের পাতা একটু খুললো, আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো বিছানায়।

মশারী খোলা হয়নি। সুন্দর করে মশারী গুজে রাতে শোয়। তারপরও কেথেকে যে এতো মশা আসে।

সারারাত মশাগুলো ওর নরম শরীরে হুল ফোটায়, রক্ত চুষে ঢোল হয়ে থাকে। এদিক-ওদিক বসে থাকে। হাত লাগলেই পেট ফুটো হয়ে রক্ত বের হয়। শাদা বেডকভারে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ লেগে থাকে।

নেশা লেগে গেছে তনুজার।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই রক্তের দাগ খোঁজে।

বহু কষ্টে চোখ খুললো সে। বিছানার দিকে তাকায়। বেশ কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া লাল দাগ বসে আছে শাদা বিছানায়।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কোঁচকানো বেডকভারের দিকে। আলতো করে হাত বুলোয় দাগের ওপর।

কোনো পরশ নিচ্ছে কি ?

কোনো উষ্ণতা কি সঞ্চারিত হচ্ছে ?

আহ্। এ রক্ত তার ধমনীতে প্রবহমান।

বাবার রক্ত!

'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা'.....

গানটি গুনগুন করে যেন বেজে উঠেছে মনের ভেতর।

বাবা। একসাগর রক্তের মাঝে তোমারও রক্ত মিশে আছে, মিশে আছে তোমার তেজ, সাহস।

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! চোখ বুজে আসে তনুজার।

কল্পনায় বাবার ছবিটি ভাসানোর চেষ্টা করছে। বাবার কথা তার মনে থাকার কথা নয়। মাত্র এক বছর বয়সে সে বাবাকে হারিয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, শহীদ হয়েছেন তিনি।

ক্রিং! ক্রিং!.... টেলিফোন বেজেই চলছে।

রিসিভার তুলছে না সে।

তামান্না ছুটে আসে, রিসিভার তোলে। হ্যালো, তামান্না বলছি। কে বলছেন প্লিজ?

আমি ডালিম, তোমার আপু আছে?

আছে, ধরুন।

আপু, তোর টেলিফোন। ডালিম ভাই করেছে।

তনুজা রিসিভার হাতে নেয়।

কি ব্যাপার ডালিম। এতো সকালে ?

বাহ্। সকাল কোথায়? এখন তো ন'টা, তুমি কি আসবে না আজ?

আসবো। দশটার দিকে।

জরুরী কথা আছে তনু। তাড়াতাড়ি এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

আচ্ছা।

ডালিমের টেলিফোন এলে আগে রিসিভার রাখে না তনুজা। আজ যেন মন কেমন হয়ে আছে। এই কেমন থাকার কোনো ব্যাখ্যা নেই। রিসিভার সেই-ই রাখলো প্রথম।

ডালিম পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। তবে বর্তমানে ওর ক্লাসমেট। বন্ধুও।

মনে হয় বন্ধুত্বের দেয়ালে ধস নেমেছে। ওরা যেন দেয়াল টপকে খোলা প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণ। বিশাল সমুদ্র, বিস্তৃত জলরাশির মতো ফেনিল উচ্ছ্বাস ওদের বন্ধুত্বে।

নাহ্। ডালিমের টেলিফোনও ওর মনটি সচল করতে পারেনি এখন। কেবল অবসাদ। কেবলই ক্লান্তি।

বের হবো বললেও, ওঠার কোনো তাড়া নেই ওর ভেতর।

অপেক্ষা করুক ডালিম। একসময় অপেক্ষা করে করে চলে যাবে। অভিমানে ফুলে থাকবে। রেগে টানটান হয়ে থাকবে। থাকুক।

ডালিমের রাগ ভাঙাতে তেমন কিছু করতে হয় না তনুজার। কেবল হাসিমুখে সামনে দাঁড়ালেই হলো।

ডালিম তখন সব কষ্ট ভুলে যায়। সব যন্ত্রণা ভুলে যায়। তনুজার হাসিমাখা মুখই কেবল যেন তার সব প্রেরণার উৎস। তনুজা মোটেই চায় না তার জন্যে কেউ কষ্ট পাক। তাকে দেখে দেখে যদি কারো ভেতরে অনুপ্রেরণা জাগে, জাগুক। তবে কেউ কষ্ট পেয়ে বিরহে দিন গুণবে, মূল্যবান সময় অপচয় করে হতাশায় ভুগবে, ব্যক্তিত্বের স্থূলতা ঘটাবে, মোটেই পছন্দ নয় তনুজার।

ওর মনের এই গতি-প্রকৃতি জানে ডালিম।

এ কারণেই তনুজার মনে হলো আপাতত গৃহবন্দী থাকাই শ্রেয়। লেপ মুড়ে শুয়ে থাকা। শুয়ে শুয়ে ডালিমের অনুভূতির ওম পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা চালানোই আরামপ্রদ।

লাইব্রেরীর বারান্দায় বসে আছে ডালিম।

বার বার ঘড়ি দেখছে। বারোটা বেজে যাচ্ছে।

এখনো আসছে না কেন তনুজা।

কোনো বিপদ হয়নি তো ওর!

প্রিয় মানুষের তো কথা দিয়ে কথা না রাখার কথা নয়। তবে কি সে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি!

ঠিক ঠাক বুঝতে পারে না ডালিম।

তনুজা মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখাবে যেন ডালিম ছাড়া জীবন বৃথা। কখনো কখনো দুর্দান্ত খারাপ আচরণ করে। এসব আচরণের রহস্য এবং জটিলতা কিছুই জানে না সে। ভেবে ভেবে আকুল হয়েছে। জট খুলতে চেয়েছে। খোলে না। দিনে দিনে যেন আরো ঘনীভূত হয়েছে রহস্য।

তনুজার সৌন্দর্যের কোনো তুলনা চলে না। ব্যাখ্যা বা বর্ণনাও চলে না। তন্বী তরুণীর চুল থেকে পা পর্যন্ত সৌন্দর্যের লাগামহীন ঘোড়া যেন ঢেউ তুলে লাফিয়ে বেড়ায়। একবার এই সৌন্দর্যচ্ছটা দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে কেবল।

এ জন্যেই তো ডালিম তাকে না দেখলে কাতর থাকে, কষ্ট এবং বিষণ্নতায় ডুবে থাকে। এই কষ্ট পাওয়ার অধিকার কি ডালিম এখনো পায়নি?

কতোজন তনুজার জন্যে পাগলপ্রায়, জানে ডালিম।

হাজার জন তনুকে ভালোবাসুক, হাজার জন ওর পিছে ছুটে বেড়াক, কোনো আপত্তি নেই। কেবল সে যেন ডালিমকেই ভালোবাসে, ডালিমকেই স্মরণ করে দিন কাটায়, এ টুকুই চাওয়া।

অথচ কি আশ্চর্য।

তনুজা ওর সব অনুরক্তদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবে। হাসিতে যেন উপচে পড়ে সৌজন্যতা।

সৌজন্যতার সঙ্গে কি ভালোলাগাও মিশে থাকে ?

থাকতেই পারে।

কিন্তু এটুকু যেন সইতে পারে না ডালিম।

তবে কি ডালিম সংকীর্ণ ?

নাহ্। নিজেকে সংকীর্ণ ভাবতে বড় কষ্ট হয়। তবুও যেন সংকীর্ণ দেয়াল চারপাশে মাথা গজিয়ে দাঁড়ায়।

কেন সে সংকীর্ণ হবে না। একশ'বার হবে। কেন কথা দিয়ে কথা রাখবে না তনু। কেন আসবে না। কেন তাকে কষ্ট দেবে।

উহ্! যন্ত্রণা হচ্ছে। অস্থিরতার চাবুক বুকে এসে যেন ঘা বসাচ্ছে।

কিরে ডালিম, এমন হাবলুর মতো বসে আছিস কেন? পেছন থেকে আচমকা এসে প্রশ্ন করে স্বপ্না।

চিন্তার সুতো কেটে যায়, মুখ তুলে তাকায় ডালিম। কতোক্ষণ তাকিয়ে থাকে। স্বপ্নার মুখে দুষ্টুমি মাখা হাসি। স্বপ্না ওর বন্ধু। স্রেফ বন্ধুত্বের জন্যে এমন মেয়ে বিরল।

ওকে নিশ্চয় সব বলা যায়। ভাঙা গলায় বলে, তনুজা আসার কথা দশটায়। এখন বারোটা বেজে যাচ্ছে। এলো না এখনো। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছি।

ও! এ জন্যেই মুখটি এমন প্যাঁচার মতো করে রেখেছিস।।

ডালিম এবার হেসে ফেলে। হেসে হেসে বলে, কাউকে ভালোবাসলে বুঝবি, প্রিয় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করা কতো কষ্টের।

কেবলই কি কষ্ট? স্বপ্নার তির্যক প্রশ্ন।

কষ্টের সঙ্গে আলাদা একটা আকুলতা, উদ্বিগ্নতাও মিশে থাকে। আনন্দও থাকে প্রচুর।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ তাই-ই।

তোদের প্রোগ্রামটি কি ছিল ?

ও অবশ্য প্রোগ্রামের কথা কিছু জানে না। কেবল আসার কথা বলেছিলাম। ভেবেছিলাম চাইনিজ খাবো। খেতে খেতে একটা সুখবর দেবো।

বাহ্! দারুণ তো! থ্রিলটা তাহলে তনুজা পেলো না। তো, সুখবরটা কি জানতে পারি?

ডালিম যেন একটু লজ্জা পেলো। লজ্জা মিশ্রিত হাসি ভেসে ওঠলো মুখে, জানতেই চাস।

হ্যাঁ চাই। আপত্তি না থাকলে বলতে পারিস।

শোন, মাকে তনুজার কথা বলেছি। মা আমাদের বিয়ের জন্যে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। তনুজাকে দেখতে চেয়েছেন। দু'এক দিনের মধ্যে ওদের বাড়ি যাবেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

উফ্! এতো মধুর খবর বুকে রেখে বিষণ্নতা তোকে মানায় না। এক কাজ করতে পারিস। প্রোগ্রামটি তুই ঠিক রাখ। আমি তনুদের বাসায় গিয়ে ধরে নিয়ে আসি ওকে।

ডালিম খুশিতে টগবগ করে ফুটতে থাকে। সব কষ্ট ভুলে যায়। স্বপ্নার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে।

স্বপ্না উঠে যায়। ডালিম বসে থাকে বারান্দায়। হঠাৎই চোখ যায় সামনের ফুলের বাগানটির দিকে।

আশ্চর্য। মন খারাপ হলে কি চোখ অন্ধ হয়ে যায় ? চোখের সৌন্দর্য হারিয়ে যায় ? এতোক্ষণ বাগানটি তার চোখেই পড়েনি।

এতো ফুল। থোকায় থোকায় ফুটে আছে।

কি সুন্দর! কি সুন্দর!

সারি সারি গাঁদা ফুলের সমাহার। এতো ছোট গাছ, যেন ফুলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল ফুল আর ফুল। গোল গোল চত্বরে মাঝে মাঝে রয়েছে গোলাপ। একপাশে শাদা, একপাশে লাল, একপাশে গাঢ় লাল। বাগানে ঢোকার মুখে ওল্টানো 'ইউ' আকারে একটি গেইট, গেইট জুড়ে নিবিড় করে জড়াজড়ি করে আছে বাগান বিলাস।

ডালিম ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে বাগানে ঢোকে। একটি গাঢ় লাল গোলাপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ইচ্ছে করছে ছিঁড়ে নিতে ফুলটি। ছেঁড়া যাবে না। ফুল ছেঁড়া নিষেধ। নোটিশ ঝুলানো আছে। কেবল দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য দেখা যায়। ছুঁয়ে দেখা যায়।

বুকের ঘরে ওম পাওয়া সৌন্দর্যের ঢেউ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। খারাপ হওয়া মনটি এখন বেশ ভালো।

স্থবির দাঁড়িয়ে থাকে ডালিম।

হঠাৎ পিঠের ওপর দশাসই এক থাপ্পড় এসে পড়ে। হকচকিয়ে যায়। পেছনে ফিরে দেখে ওর দুই বন্ধু অনুপম এবং সৈক-।

শালা। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান আর তুমি এখানে! সৈকত ঝাড়ি দিলো।

ডালিম অসহায় ভঙিতে ওদের দিকে তাকায়।

প্রেমের কি জোয়ার বইছে ? কাজের সময় ফুল বাগানে। ফোড়ন কাটলো অনুপম।

ইয়ে মানে....

মানে থাক। শিপার ভাই হন্যে হয়ে খুঁজছে তোকে। কাল বিজয় দিবস ভুলে গেছিস? তোকে মঞ্চ সজ্জার দায়িত্ব দিয়েছে। গেইটের ডেকোরেশনও তুই করবি, খবর পাসনি? সৈকত বললো।

না তো! আমাকে তো জানানো হয়নি।

সেজন্যেই তো তোকে খোঁজা হচ্ছে। চলে। কুইক। হাতে একদম সময় নেই।

ডালিম ওদের সঙ্গে চলে এলো অডিটরিয়ামের ভেতর। অনেকেই আছে ভেতরে। সবাই যার যার দায়িত্ব পালন করছে।

ডালিমের হাতের কাজ খুব ভালো। কোনো অনুষ্ঠান তাকে ছাড়া নীরস। কাজে লেগে যায় সে।

লাল কাগজ কেটে কেটে শব্দ বানাচ্ছে এখন।

মঞ্চের পেছনে কালো স্ক্রিন। স্ক্রিনের ওপর লাল শব্দ বসিয়ে বসিয়ে একটি বাক্য দাঁড় করিয়ে ফেললো 'যাঁদের রক্তে রঞ্জিত এই স্বাধীনতা।'

স্বপ্না এবং তনুজা এ সময় এসে ঢোকে অডিটরিয়ামে। ডালিমকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে তারা। ঢোকার মুখে দাঁড়াতেই চোখ গেল কালো স্ক্রিনের ওপর। ডালিমকেও দেখলো তনুজা। বাক্যটি পড়ে আর যেন নড়তে পারছে না সে। তীব্র ভালো লাগার শিহরণে পায়ের গতিশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। একই সঙ্গে চিনচিনে বিষাদও এসে যেন জড়িয়ে ধরলো, নড়তে পারে না আর।

টুপ করে বসে পড়লো পাশের একটি চেয়ারে।

কিরে! বসলি কেন! ওঠ! ওই তো ডালিম। স্বপ্না তাড়া দেয়।

তুইও বসে থাক চুপচাপ। ওকে দেখি, ওর কাজ দেখি।

বাব্বা! তোকে নিয়ে আর পারা গেল না তনুজা। বলেই সে হাঁটা দেয় স্টেজের দিকে। ডালিমের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ডালিম প্রশ্নভরা চোখে স্বপ্নার দিকে তাকায়। চোখ যেন বলছে, ও আসেনি?

স্বপ্না যেন ডালিমের চোখের ভাষা পড়তে পারলো। একটু হাসি মুখেই বললো, নিয়ে এসেছি, ওই দেখ বসে আছে।

ডালিমের ভেতর অভিমানের দানা জমাট বেঁধে ওঠে। একবার দেখলো ঘাড় ঘুরিয়ে, তারপর স্টেজের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাজে লেগে যায়। কিন্তু কাজ কিছুতেই এগুচ্ছে না। সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্না খোঁচা দেয়। কাজ পরে করিস। ওকে নিয়ে আয় তুই। যা। দেখি আমি কিছু কাজ এগিয়ে দিতে পারি কিনা।

ডালিম মুখ ঘুরিয়ে আবারো দেখে। এতো কাছে তনু। অভিমান করে কি সময় নষ্ট করে লাভ আছে।

ওঠে সে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় তনুজার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় ডালিম।

তনুজার চোখ টলমল করছে। ভেতর থেকে অদৃশ্য কান্নার স্রোত যেন বিপুল বিক্রমে চোখ উপচে বেরিয়ে আসছে।

কেন এ কান্না! কিসের কষ্ট! অভিমান না অন্য কিছু। তনু তো সহজে কাঁদে না।

ডালিম বুঝে উঠতে পারছে না। কেবল এটুকুই বোঝে, এই দুর্বোধ্য মেয়েটিই তার ভালোবাসার মশাল। মশালের আলো কি কখনো পথ দেখাবে তাকে ?

পাশে গিয়ে বসে ডালিম। কিছু জিজ্ঞাসা করা বোকামি। কাঁদছে সে, কাঁদুক। তনুজার কান্না যে তার বুক ভেঙে দিচ্ছে। এ কথা কি কোনোদিন বুঝবে না ও।

তনুজার ডান হাতটি তুলে নেয় ডালিম। নিজের দু'হাতের ভেতর জড়ো করে রাখে কতোক্ষণ। চুপচাপ।

বিস্ময়কর এক উষ্ণতা সঞ্চারিত হচ্ছে তনুজার দেহে। ভালো লাগার তীব্র পরশে বুকের কষ্ট ধুয়ে যেতে থাকে। চোখের টলমলো ভাব কমে আসে। স্থির তাকিয়ে থাকে স্টেজের কালো পর্দাটির দিকে।

তনু! কি হয়েছে তোমার? বলবে না আমায়।

কিছু না? আলতো করে জবাব দেয় তনুজা।

কিছু না মানে? কাঁদলে কেন?

এমনি। কান্না এলো কাঁদলাম। কতো কান্নাই তো মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকে। কারুরটা প্রকাশ পায়। কারুর পায় না।

তবুও বলছি। এ কান্না তোমার অস্বাভাবিক কান্না। পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কারণটি কি শোনার অধিকার আমার নেই, বলা যাবে না আমায়?

তনুজার মুখে ম্লান হাসি ফোটে। বলা যাবে না কেন? বলবো। শুনলে তোমারও মন খারাপ হয়ে যাবে। এ মুহূর্ত খুব ভালো লাগছে তোমাকে। চাই না মনটা খারাপ হয়ে যাক তোমার।

ডালিম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুশি মনেই বলে, কেবলই কি এখন ভালো লাগছে? সব সময় লাগে না?

বোঝ না তুমি? তনুজা পাল্টা প্রশ্ন করে।

তোমার মুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছে করছে। ডালিমের কণ্ঠে কাতরতা।

ভালোবাসার মানুষের কাছে কাতর হওয়ার আনন্দই আলাদা। টের পেলো ডালিম।

সব সময়ই তো ভালো লাগে, নইলে আসি কেন তোমার কাছে? তবে আজ অন্যরকম ভালো লাগছে তোমায়। একদম অন্যরকম।

আহ্! বুক ভরে বাতাস টেনে নিলো ডালিম। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কি বেড়ে গেল। উদ্বেলিত কণ্ঠেই বলে, বেশি ভালো লাগার একটু প্রমাণ দাও। অন্যরকম গীফট চাই, এখন।

তনুজা তাকায় ডালিমের চোখের দিকে। ডালিম চোখ নামিয়ে নেয়। তনুজা তাকিয়েই আছে। আচমকা ডালিমের হাতটি তুলে নেয় নিজের দু'হাতে।

এ হাত দিয়েই সে লিখেছে 'যাঁদের রক্তে রঞ্জিত এই স্বাধীনতা।'

কিছু বোঝার আগেই আলতো করে একটি চুমু বসিয়ে দেয় সে ডালিমের হাতের উল্টো পিঠে।

ডালিম কি মর্ত্যে আছে! নাকি অন্য লোকে চলে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না আর। যেন ওজন শূন্য হয়ে ভেসে চলেছে অচিন কোনো দেশে। দূর নীলিমায়। সেখানে কেবল সে আর তনুজা। আর কেউ নেই। কেউ নেই।

মাথাটি একটু ঝুঁকিয়ে নিচে নামায় ডালিম। বাম হাতের তর্জনী নিজ ঠোঁটে ছোঁয়ায়। ছোট্ট করে বলে, এখানে একটা।

উহ্। তা হবে না। বেশি পেতে চেয়ো না। যা পেয়েছো, তা নিয়ে খুশি থাকো। সময় হলে সব পাবে। বাসর রাতের জন্যে জমা করে রাখো। বুঝলে।

আহ্! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

খুশির জোয়ার জাগছে, বেসামাল করছে ডালিমকে। নিজেকে সালাম দিতে পারছে না। ইচ্ছে করছে তনুজাকে পাঁজাকোলে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে। ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে কোনো ইচ্ছেই পূরণ হয় না। ডালিমেরও হলো না।

কেবল আনন্দমিশ্রিত বিগলিত স্বরে বললো, মা তোমাদের বাসায় যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তোমার মা রাজি থাকলে খুব শিগ্‌গিরই বিয়ে হয়ে যাবে আমাদের।

তনুজা হাত চেপে বসিয়ে দেয় ডালিমকে। শান্ত স্বরেই বলে, পাঠিয়ে দিও তোমার মাকে।

করুণ সুরে শানাই বাজছে।

তনুজার চোখে পানি। ধবধবে শাদা টয়োটা গাড়িটিকে লাল গোলাপ মুড়ে সাজানো হয়েছে। বেলিফুলের কারুকার্যমণ্ডিত মনোরম সাজের মাঝে ঘোমটা দেওয়া একটি নববধূর মুখ যেন উঁকি দিচ্ছে। তনুজা চলে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। গাড়িতে চড়ে বসেছে বরের পাশে।

বর হিসেবে ডালিমকে বেশ সপ্রতিভ মনে হচ্ছে। ডালিম হাত চেপে ধরলো তনুজার।

খুশির দিনে চোখে পানি থাকতে নেই। ফিসফিস করে বললো ডালিম।

ওর কথা তনুজার কানে ঢুকলো কিনা কে জানে। ঘাড় বাঁকিয়ে একবার বাইরে তাকালো সে।

সবার চোখে জল। মা স্তব্ধ। ওঁনার দৃঢ়চেতা মুখটি নির্বিকার। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি।

তামান্না কোথায়?

তামান্নাকে তো দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। কাঁদছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। তনুজার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। যেন এক অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে সে।

এ সমুদ্র কি কেবলই কান্নার। নাকি আনন্দও আছে এখানে।

রাত প্রায় দুটো।

বাসর ঘর সাজানো হয়েছে আধুনিক সজ্জায়।

আভিজাত্যের ছোঁয়া প্রতিটি ছত্রে-বর্ণে।

ডীম লাইট জ্বালালো ডালিম। পাশে গিয়ে বসলো। তনুজা মুখ নিচু করে বসে আছে। এতো দিনের সম্পর্ক। তবুও লজ্জার পাহাড় যেন তার বুকে চেপে বসে আছে।

মুখ তুলে তাকাও তনু। আমার দিকে তাকাও। ডালিমের কণ্ঠে স্মার্টনেস।

লজ্জার খোলস থেকে যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো তনুজা। মুখ তুলে তাকালো।

ডালিমের মুখে হাসি ফোটে। বাসর রাতের জন্যে জমা রাখা গীফটটি দেবে না?

তনুজা মাথা নোয়ায়। দুষ্টুমিভরা মুখেই বলে, ওই ধরনের গীফট তো জোর করে দিতে হয়, নিতে হয়।

ডালিম দুহাত ভরে তনুজার মুখটি উপরে তোলে। ঠোঁটে ঠোঁট ডোবায়। অনেক ক্ষণ। অনেক ক্ষণ।

তনুজার নিঃশ্বার প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

উহ্! এভাবেই জ্বালাবে!

ডালিম তৃপ্তি নিয়ে তাকায়। না আপাতত আর জ্বালাচ্ছি না। আগে বলো ওই দিন অডিটরিয়ামে অমন করে কেন কেঁদেছিলে?

শুনবে?

হ্যাঁ অবশ্যই শুনবো।

তুমি সেদিন কালো স্ক্রিনের ওপর লাল শব্দ বসিয়ে লিখেছিলে, 'যাঁদের রক্তে রঞ্জিত এই স্বাধীনতা' মনে আছে?

আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ডালিম।

ওই বাক্যটিই আমার কান্নার উৎস।

কেন? ওতে কান্নার কি আছে।

তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার বাবার কথা জানো না তুমি। বাবার কথা কাউকে বলি না আমি। বাবা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা।

সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আমার বয়স তখন দুই বছর। তামান্না পাঁচ মাসের গর্ভাবস্থায়। আমি মুক্তিযোদ্ধার কন্যা। স্বাধীনতা দিবসে, বিজয় দিবসে উৎসব হয়। আলোচনা হয়। আমরা কেউই আনুষ্ঠানিকতায় যাই না। আমার মা ঘরে বসে কাঁদে। আমরাও।

তনুজার মুখে বিষণ্নতার ছাপ বসে গেছে।

ডালিমও হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়। বাসর রাতের আবহ পাল্টে গেছে। একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা খচ করে গেঁথে গেছে নিজ বুকে। উচ্ছলতা উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেছে মুহূর্তের মাঝে।

তুমি কি আমার বাবার কথা জানো তনু?

না। কারো বাবার কথা আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি না।

আমার বাবাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা গিয়েছিলেন।

তোমার বাবাও কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? উচ্ছ্বাস জেগে উঠে তনুজার মুখে।

না। তবে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে মেরেছিল বাবাকে। আমার বয়স তখন তিন।

কি। কি বললে?

ঠিকই বলেছি। বাবা পাকিস্তানিদের পক্ষে কাজ করেছিল।

তোমার বাবা কি রাজাকার ছিল? আলবদর, আল শামস?

জানি না তনু। তবে এই ধরনের কিছু ছিল। মা প্রায় বাবার প্রশংসা করেন। বাবার খারাপ কিছু আমাকে বলেননি। তাই, যাই-ই থাকুক না কেন স্মৃতিতে আমার বাবা আমার কাছে একজন ভালো বাবাই হয়ে আছেন। মা'র কারণেই আমি বাবাকে খারাপ ভাবতে পারিনি।

তনুজা ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে গুটিয়ে নেয়। খাটের এককোণে গিয়ে বসে। ভয়াবহ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ডালিমের দিকে।

ডালিম তার প্রিয়তম স্বামী। প্রিয়তম মানুষটির শরীরে রাজাকারের রক্ত প্রবহমান।

উহ্! মাগো! কঠিন দুটো শব্দ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে তনুজা। আবার তাকায় ডালিমের দিকে। চোখে ভয়ানক ক্রুদ্ধতা।

আমার প্রতি ঘৃণা জন্মেছে তোমার? ডালিম কাতরভাবে জানতে চায়।

ডালিম কাছ ঘেঁসে বসে, ছুঁতে চায়।

না, ছোঁবে না।

মুখ তুলে তাকায় ডালিম। চোখে রাজ্যের বিস্ময়। তাহলে?

দু'জনের চমৎকার ভালোবাসার খোলা জগতে বিষাক্ত ছোবল। অশনি ধ্বনিতে ভরে থাকে পুরো বাসররাত।

ব্যাখ্যা ঃ

তনুজা মুক্তিযোদ্ধার কন্যা। মুক্তিযুদ্ধ ওর অহংকার। মুক্তিযোদ্ধার রক্ত ওর শরীরে বহমান। বাবা ওর ভালোবাসা। ছোটবেলা থেকেই সেই ভালোবাসা সে গভীর যত্নে লালন করে রেখেছে। একই সঙ্গে লালন করে রেখেছে আলবদর রাজাকারদের প্রতি চরম ঘৃণা। দুটো বিপরীত ধর্মী ইমোশন তার বুকের ভেতর। যদিও বিপরীত ধর্মী ইমোশন একসঙ্গে অনুভবে আসে না, তবুও মাঝেমাঝে রাজকারদের প্রতি ঘৃণা উপচে উঠতো। ভালোবাসা গাঢ় হয় মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলে। শেষ দৃশ্যে যখন তনুজা জানতে পারলো ডালিম রাজাকারের পুত্র, তার ভালোবাসার মানুষের দেহে রাজাকারের রক্ত বহমান, সে ছোবল খেয়েছে একটি। বিষাক্ত ছোবল। এই ছোবলে সে বিপর্যস্ত। আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্বে সে রক্তাক্ত। বিপরীত ধর্মী ইমোশন ও দ্বন্দ্ব, মুক্তিযুদ্ধের আলোকেই এই গল্পে দিপ্যমান।

মনের চাওয়া, দেহ নাকি ভালোবাসা
প্রসঙ্গ ঃ ভিতরের চোখ

পরীক্ষা শেষ।

সবাই চলে যাচ্ছে। হল খালি হয়ে যাচ্ছে। হলের ভিতরে, করিডরে এক ভূতুড়ে নীরবতা বিরাজ করছে।

বীথির যেতে ইচ্ছে করছে না। দোতলার ডান পাশের ব্লকে সে ছাড়া আর কেউ নাই। বাম পাশের ব্লকের কোণার রুমে রয়েছে দু'বছরের সিনিয়র, শারমিন আপা। সারাদিন প্রায় রুম বন্ধ করে থাকেন। গান শোনেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাঝে মাঝে শোনেন গজল। বীথিও চুপচাপ শুয়ে শুয়ে দূর থেকে ভেসে আসা সুরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। সুরটি যেন ভিতরের কষ্ট, অস্থিরতা, অশান্তি চুষে নেয়; নিজ একাকীত্বের গভীরে জ্বালিয়ে রাখে হাজার বাল্বের আলো।

বড় ভালো লাগে। আপাটাকেও তার অদ্ভুত লাগে। অদ্ভুত আপার ভিতর যেন বাস করে রহস্যময়ী অন্য এক নারী। খুবই সুন্দর ওনার মনটি। সুন্দর মনের গভীরতা ছুঁতে পারা কঠিন। কিন্তু বীথি যেন সফল। আপার মনের গভীরতা ছুঁতে পেরেছে। বড়ই ভালোবাসেন তিনি বীথিকে।

লম্বা করিডরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত খোলামেলা। আপা ওনার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে। বীথি দাঁড়িয়ে নিজ রুমের সামনে। ইশারায় ডাকেন তিনি বীথিকে। ও ছুটে আসে।

বাড়ি যাবে না ? আদর মেখে জানতে চাইলেন তিনি।

না, যেতে ইচ্ছে করছে না।

কি ? যেতে ইচ্ছে করছে না? কেন?

বীথি মুখ ফুটে কিছুই বলে না। লজ্জায় যেন জমে যাচ্ছে।

ওঃ। বুঝেছি। শুভমের জন্যে? নয় কি?

আপার দিকে তাকায় বীথি। হাসিমুখ।

শোনো, তোমাকে একটা উপদেশ দেই। সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলারাম খেলে যা' বইটি পড়ে নেবে। একটু অশ্লীল মনে হতে পারে বইটিকে। তবে এরকম বই না পড়লে

পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারবে না। শিক্ষণীয় বই। বইটি মেয়েদের সজাগ করবে।

আচ্ছা। বলেই বীথি সামনে থেকে ছুটে এলো। নিজ রুমে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করলো। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চোখ জ্বল জ্বল করে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাহ্। সুন্দর তো। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিজেকে।

হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ হয়।

কে?

আমি আপামণি।

ওঃ। মঞ্জুরাণী?

হ' আপা। আপনার মেহমান আইছে।

বুকটা ধ্বক করে ওঠে। শুভম ভাই নিশ্চয়। উনি ছাড়া আর কে হতে পারে। মন যে কেবল ওনাকেই চাইছে, ওনার জন্যই জ্বলে আছে মনের উজ্জ্বল বাতিটি।

ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে বলো, আমি আসছি।

মঞ্জুরাণী ওদের ব্লকের আয়া। হলের প্রাণ। সবার জন্য দিল দরিয়া। নিজের কোনো সন্তান নেই। সবাই যেন তার মেয়ের মতো। চল্লিশের মতো বয়েস। বিয়ে হয়েছিল যৌবনের শুরুতে। কিছুদিনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় মঞ্জুরাণীর। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বুঝে, স্বামী পাশে নেই। অজানা শংকায় লাফিয়ে ওঠে। অন্ধকার হাতড়িয়ে দরজার কাছে আসে। দরজার হুক খোলা, ভেজানো।

আস্তে করে বাইরে আসে, উঠোনে দাঁড়ায়। কি এক অশরীরী শক্তি যেন তাকে টেনে নিয়ে যায় উঠোনের বাম পাশে, রান্না ঘরের কাছে। ভিতরে ফিসফিস শব্দ হচ্ছে।

মঞ্জুরাণী একটি লাকড়ির টুকরো হাতে দেয়, বেশ মোটা সাইজের।

রান্না ঘরের পূর্ব পাশের দরজা খোলা।

জোছনার আলো ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরের অবস্থা পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি দেখতে পায়। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে মূর্তি জোড়ার কাছে আসে। স্পষ্ট দেখে তার প্রিয়তম স্বামী পাশের বাসার বিধবা মেয়ে শিউলির উলঙ্গ শরীর শকুনের মতো খাবলে খাচ্ছে।

মাথায় যেন আশি হাজার বাল্ব একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। উন্মত্তের মতো লাকড়ি দিয়ে পিছন থেকে স্বামীর মাথায় সজোরে আঘাত হানে।

ওই দিনই, ওই কাপড়েই মাঝরাতে একাই বাপের বাড়ি চলে এসেছে। আর স্বামীর মুখোমুখি হয়নি।

পুরুষ মানুষের ওপর তাই তার প্রচণ্ড ঘেন্না, অবিশ্বাস।

বীথির কাছ থেকে এসে মঞ্জুরাণী বললো, সাব বইয়েন। আপা আইতাছে।

শুভম বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে।

হলের সামনে খালি জায়গায় একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটা হয়েছে।

আনাড়ি হাতে কোর্ট কাটা। মাপের কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি। কোর্টের অবস্থা দেখে হাসি ফোটে ওর ঠোঁটে।

হাসেন ক্যাঁ? মঞ্জুরাণী পাশ থেকে আচমকা প্রশ্ন করে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে শুভমের দিকে।

শুভম একটু ভড়কে যায়। সামলে নেয় নিজেকে।

এমনিই হাসলাম। হাসি তার মুখে লেগেই থাকে।

এমনি এমনি কেউ হাসে। পাগলে হাসে অবিশ্যি। আপনে কি পাগল?

বাব্বা। তুমি দেখছি পুলিশের মতো জেরা করছো খালা।

ক্যান, আঁৎকা পুলিশের কথা মনে অইল ক্যান? আপনার ভিতরে কি চোর আছে, না ডাকাত?

শুভম মুখরা রমণীটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কোনো জবাব দেয় না।

মঞ্জুরাণী আবারো বললো, 'অবিশ্যি সব পুরুষ মানুষই এক রকম ডাকাত, চোর'। আপনারে আর কি কমু? তো কইয়া রাখলাম, বীথি আপা কিন্তু খুব ভালো মাইয়া। তাইনেরে কোনো বিপদে ফালায়েন না যেন।

ওরে বাব্বা। তুমি দেখছি বীথির গার্জেন।

হ' হ' গার্জেন। হগল আপামণিদের গার্জেন আমি। মনে রাইখ্যেন। হগল পুরুষেরে চিনি। ফুঁসলাইয়া ফাঁসলাইয়া কেবল মাইয়া মানুষের গায়ে হাত লাগানই তাগো নেশা। হেইদিন যহন পেরথম আপনে বীথি আপারে সিলিপ পাডাইলেন, ওনার মুখে দেইখ্যা বেবাক বুইজ্যা ফালাইছি। আপামণি আর আপামণিতে নাই। হে যেন অন্য কোনো আপামণিতে বদলাইয়া গ্যাছে। এইডা লক্ষণ ভালা না। আপনে চোখে নেশা ধরাইয়া দিছেন, অহন ইচ্ছা মতো তারে উডাইতে পারবেন, বহাইতে পারবেন।

শুভম চুপ হয়ে যায়।

চোখ বুজেই নিজেকে দেখার চেষ্টা করে, বোঝার চেষ্টা করে। তার ভিতর কি অস্বাভাবিক অন্য কোনো শুভম লুকিয়ে আছে?

মঞ্জুরাণী কি জীবনের পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে সব দেখে ফেলেছে?

কি দেখেছে?

নিজে তো কিছুই বুঝতে পারছে না। বীথির মিষ্টি মুখের উজ্জ্বল হাসিই যেন কেবল তার ভিতরের মনে গেঁথে আছে, গেঁথে আছে ভিতরের চোখে।

বীথির শরীরের প্রতি কোনো লোভ, আকর্ষণ তো টের পাচ্ছে না নিজের ভিতর। ওর মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা, টানটান চোখের মিষ্টি চাউনিই তো কেবল তাকে টেনে আনে।

তবে কি সে নিজেকে নিজেই চেনে না। নিজের ভিতর কি হায়েনার মতো বাস করে অন্য কোনো শুভম? টেনে নিয়ে আসে বীথির কাছে?

কি শুভম ভাইয়া। চোখ বুজে আছেন কেন? কাকে ভাবছেন? বলতে বলতে উজ্জ্বল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বীথি।

হাসির শব্দে চোখ খোলে ও। স্থির চোখ দিয়ে বীথিকে দেখে।

ভূত দেখছেন বোধ হয়। আবারো হাসিতে ঢলে পড়ে বীথি।

শুভম কোনো কথা বলছে না।

বীথির বাঁধভাঙ্গা শরীরের ঢেউ, তীক্ষ্ণ বাঁক দেখতে পাচ্ছে আজ। মঞ্জুরাণীর কঠিন খোঁচা ভিতর থেকে যেন অন্য একটি চোখ জাগিয়ে দিয়েছে। আগাগোড়া দেখে নিচ্ছে বীথিকে। এ দেখার ভিতর সত্যিই নেশা আছে, মাদকতা আছে।

দেখার নেশা নিয়ন্ত্রণ করে সে। শান্তভাবে জানতে চায়, হল খালি মনে হচ্ছে, সবাই কি চলে গেছে?

হ্যাঁ। প্রায় সকলেই চলে গেছে।

তুমি যাবে না?

যাওয়া দরকার, যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনার যেতে তো আরো অনেক দিন বাকি, তাই না?

হ্যাঁ। পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে আমাদের। অসুবিধে নেই, তোমাকে দিয়েই পরের ট্রেনে ফিরে আসবো আমি।

শুভম ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। চাঁটগার একই এলাকাতে ওদের বাড়ি, একই সাবজেক্টে পড়ে। তবে বীথির দু'বছরের সিনিয়র সে।

দু'জনার ভিতর ভালোবাসার সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে, তবে সম্পর্ক এখনো 'তুমি'তে নিতে পারেনি বীথি।

আপনি দিয়ে আসবেন! খুশিতে ঝলসে ওঠে সে।

আজ রাতের ট্রেনেই চলো। আমি টিকেট কিনে রাখবো। তুমি রেডি থেকো। ঠিক সময়ে এসে যাবো।

বীথিকে তীক্ষ্ণভাবে পরখ করছে শুভম। চোখে যেন অন্য নেশা। অন্য সুর। অন্য কথা।

বীথি মিষ্টি হাসি দিয়ে শুভমের চোখের দিকে তাকায়। শরীর যেন ছম ছম করে উঠলো। কোথাও কি ছন্দপতন হলো। বুকটা এমন কেঁপে উঠলো কেন।

রাত সাড়ে দশটার মেইল ট্রেন।

দশটার দিকেই ওরা স্টেশনে চলে এসেছে।

ডাবল বেডেড সিঙ্গেল কুপ। কুপের ভিতর দুটো বসার চেয়ার, একটা ছোট্ট টেবিল। একটা লুকিং গ্লাস। আর কিছু নেই।

রুমে ঢুকে অদ্ভুত এক শিহরণ টের পেলো বীথি। মাথা থেকে বিদ্যুৎবেগে যেন স্পন্দনটি পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তের মাঝে।

শুভমের দিকে তাকালো সে। চোখে চোখ রাখতে পারছে না। চোখ নামিয়ে নিল। শরীরটিকে ভয়ানক এক কারখানা মনে হচ্ছে। যেন কারখানার ভিতর দুমদাম, খটাখট শব্দ হচ্ছে কেবল।

কেন এ অনিয়ন্ত্রিত শব্দরাজি ?

কিসের দোলায় দুলছে দেহ, বুঝে না বীথি।

দু'জনেই চুপচাপ, কথা নেই কারো মুখে। অথচ বুকের ভিতর সহস্র শব্দমালা উত্তপ্ত হচ্ছে, টগবট করে ফুটছে কেবল, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না একটি শব্দও।

এই দেহ, এই মন যেন বীথির নয়, যেন শুভমের নয়, যেন বাহির থেকে অন্য কোনো শক্তির যাদুমন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রতিটি অভিব্যক্তি।

দরজা লাগিয়ে দেয় শুভম।

রিলাক্স করো। খিদা লাগলে বলো। ব্যাগে বিরাণীর প্যাকেট আছে। মিনারেল ওয়াটার আছে। অসহনীয় নীরবতার খোলস থেকে কোনো রকম বেরিয়ে এলো সে।

না। ক্ষুধা লাগেনি এখনো। তৃষ্ণা পেয়েছে। পানি দেন।

মিনারেল ওয়াটার বোতলের মুখটি খোলে শুভম। বাড়িয়ে দেয়।

দু'হাতে বোতলটি আঁকড়ে ধরে বীথি। গলগল করে টেনে নেয় অনেকটুকু পানি।

বুকটা যেন একটু হালকা হয়েছে। শুভমের দিকে তাকায়।

মনের ভিতর হঠাৎ এলোমেলো ঝড় ওঠে।

সিঙ্গেল কুপ কেন নিলো শুভম। আলাদা করেই কি চায় ওকে! ওর শরীরের প্রতি কি নেশা ঢুকেছে।

মুখ ফুটে কিছুই জানতে চাইলো না সে। নিচের বার্থে ব্যাগটি রেখে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে।

খারাপ লাগছে তোমার। শুভম উদ্বিগ্ন হয়।

না। খারাপ লাগবে কেন। একটু রিলাক্স করে নেই।

আবারো চুপচাপ, দু'জনেই। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। দু'জনার মাঝে যেন এক উত্তপ্ত স্রোতধারা বয়ে চলেছে; ব্যারিকেড তৈরি করেছে। ইচ্ছে করলেই যেন শুভম বীথিকে ছুঁতে পারবে না, বীথি পারবে না শুভমের কাছে যেতে।

এ কিসের ব্যারিকেড।

কেবলই কি লজ্জার। নাকি অন্য কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার জাল পাকাচ্ছে নিজেদের ভিতর। বুঝতে পারে না কেউই।

দরজায় টোকা পড়ে। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

প্রতিটি শব্দই যেন বীথির বুক কাঁপিয়ে দিলো, সোজা হয়ে বসে।

শুভম উঠে দরজা খুলে দেয়। কম্পার্টমেন্টের গার্ড দরজায় দাঁড়িয়ে।

স্যার, রাতের খাওয়া কি লাগবে?

না। ধন্যবাদ। আমরা সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছি।

গার্ড চলে যায়। দরজা লাগিয়ে দেয় ও। ফিরে এসে চেয়ারে বসে।

বীথিও সটান শুয়ে পড়ে আবার, চোখ বুজে আছে এখন।

বীথির মুখের দিকে তাকালো শুভম।

ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা। মুখের উষ্ণ লাল আভা যেন ক্রমশ বাড়ছে।

টাইট জিনসের প্যান্ট পরেছে, শার্ট পরেছে বীথি। কোমর থেকে নিচের দিকে কেমন ঢেউ খেলানো। বুক বেশ পুরুষ্টু, ভারী। হালকা তালে ওঠানামা করছে।

না, বীথির দেহের দিকে আর তাকাতে পারে না। চোখজোড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। মঞ্জুরাণীর কথা মনে পড়ছে 'অবিশ্যি সব পুরুষ মানুষই এক রকম ডাকাত, চোর।'

মঞ্জুরাণীর কথা ঠিক নয়। সব পুরুষই চোর না। ডাকাত না। নারী বিষয়ক অদৃশ্য অন্য কোনো ভালোলাগার আবেগও পুরুষকে তাড়িত করে, কেবল দেহের জন্য নয়। মনের জন্যও। নারীর মন ছুঁতেও পুরুষ কাঙাল থাকে। নারীও তেমনি অনুভূতি ধারণ করে।

চোখ দিয়ে নয়, দেহ দিয়ে নয়, কেবল মন দিয়েই সে বীথিকে ছোঁবে। জয় করবে।

নিজেকে শক্ত করে। মন শক্ত করে। নিয়ন্ত্রণের লাগামটি মনের সঙ্গে গিট দেয়। বেশ ক্ষমতাধর মনে হচ্ছে নিজেকে। মিনারেল ওয়াটারের বোতলটি টেনে নেয়। ঢক ঢক করে পান করে প্রায় অর্ধেক পানি।

বাঁ-হাতে কব্জি দিয়ে মুখ মোছে। একটু সহজ হয়।

ওঠো বীথি। খেয়ে নাও। এতো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে যে।

আরো একটু রিলাক্স করি। চোখ বুজেই বললো ও।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। দরজার আবারো নক হচ্ছে। একটু জোরেই। এবার ভয় পেলো না কেউ। বীথি শুয়েই থাকলো।

শুভম দরজা খুললো।

স্যরি। ডিস্টার্ব করলাম। দিয়াশলাই হবে আপনার কাছে? একটি তরুণ সামনে দাঁড়িয়ে। কর্কশ মুখ। চুল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো। মুখের পেশীগুলো শক্ত। রুক্ষ। শুষ্ক।

তরুণটিকে দেখে একটু যেন ধাক্কা খেলো শুভম।

স্যরি, আমি নন স্মোকার।

থ্যাংক্স। আমরা পাশের কুপে আছি। প্রয়োজন হলে আসবেন। বলেই চলে যাচ্ছিল ছেলেটি। একটু থমকায়। আবার ফিরে বীথির দিকে তাকায়। তাকানোর মধ্যে যেন রহস্যোদঘাটনের স্পৃহা লুকিয়ে আছে।

উনি কে? আবারো প্রশ্ন করে তরুণটি।

আমার বোন। শীতল কণ্ঠে বললো শুভম।

ওঃ। আচ্ছা। বোন। ঠিক আছে। থ্যাংক্স।

দরজার বাইরে আরো দু' জন দু'চক্কর হেঁটে গেল।

হঠাৎ করেই শরীর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠলো। শক্ত করেই দরজা লক করে দিলো ও। ফিরে চেয়ারে বসে। বীথি শুয়েই আছে। সিঙ্গেল কুপে সিট রিজার্ভ করাতে কি ওকে সন্দেহ করছে বীথি।

না। ওর সন্দেহ দূর করতেই হবে। স্মার্টনেস হারানো চলবে না। দৃঢ় হতে হবে। দৃঢ়তর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দিতেই হবে আজ। নিরিবিলিতে পাওয়ার হয়তো সুপ্ত একটি ইচ্ছে টিকেট রিজার্ভ করার সময় কাজ করেছিল, কাজটি ভুল হয়েছে, বুঝতে পারে শুভম।

বীথি।

উঁ।

শুয়ে আছো কেন?

ভালো লাগছে শুয়ে থাকতে।

কথা বলো, চুপচাপ থাকতে কেমন যেন অস্থির লাগছে।

চুপচাপ থাকুন। নীরবতা ভালোই লাগছে।

বীথি একটু সরে শুলো। চওড়া সীটটির জায়গা ছেড়ে দিলো অনেকটুকু। চোখ বুজেই বললো, ইচ্ছে হলে পাশে শুতে পারেন।

শুভম এবার সত্যিই ঘাবড়ে যায়। বীথি নিশ্চয় মন খারাপ করেছে। এটিই তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ নয় কি?

নিশ্চিত হতে পারছে না। মেয়েদের বোঝা কষ্টকর। কি চায়, কি চায় না, টের পাওয়া বড়ই ঝামেলার ব্যাপার। ওরা যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে থাকে। ভিতরে থাকে এক ইচ্ছে, প্রকাশ করে অন্যটি।

বীথির এ মুহূর্তে ইচ্ছেটা কি। অপমানকর কিছু একটা করার মতলব আঁটছে কি সে।

উদ্বেগ পুরো শরীরকে সংক্রামিত করছে। অবসাদ আর তিরতিরে অশান্তি কাবু করে ফেলছে শুভমকে।

সত্যিই শোবো?

হুঁ।

তোমার ইচ্ছেই কি এটি?

হুঁ।

সত্যি।

হুঁ।

শুভম এবার বেশ হালকাবোধ করছে। বীথির মনের অতল সাম্রাজ্যের বন্ধ দরজায় সে কড়া নাড়তে পেরেছে। প্রকৃত ইচ্ছে বুঝতে পেরেছে।

নিজেকে আলতো করে টেনে নেয় ওর পাশে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

কড়া সেন্ট মেখেছে বীথি।

পারফিউমের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। মগজ যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। একটি তরতাজা তরুণীর পাশে এই প্রথম শুলো শুভম। সহজ থাকার চেষ্টা করছে। পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। তবে মন আপাতত বিট্রে করছে না। মিশ্র অনুভূতি নিয়ে যেন জমে আছে এ মুহূর্তে।

ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে।

ছুটছে। ছোটার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, তাল আছে। কান পেতে ট্রেনের শব্দ শুনতে লাগলো ওরা। ট্রেনের ছন্দোময় তালের সঙ্গে নিজেদের মনের গতি যেন মিশে যাচ্ছে.....

ঝিক....ঝিক...ঝাঁ। ঝিক.....ঝিক.....ঝাঁ....

এই তালে সমান্তরাল লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেনটি। জানালা বন্ধ। বাইরের পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না। বদ্ধ কুপে কেবল শুয়ে আছে দু'জন টগবগে তরুণ-তরুণী, পাশাপাশি। মাঝে একটু ফাঁক, একটু দূরত্ব।

সমান্তরাল লাইনের বিস্তারের মতোই কি তাদের দূরত্ব।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ দরজায় নক হচ্ছে।

শুভম ত্বরিৎ উঠে বসে। বসে থাকে কতোক্ষণ। আবারো শব্দ, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কে? কোনো জবাব নেই। একটু বিরতি। আবারো শব্দ।

ঠক্, ঠক্, ঠক্।

কে? আবারো জানতে চাইলো শুভম। একটু জোরেই বললো এবার। গলার ভিতর যেন শক্ত একটা কিছু ঢুকে বসেছে। স্বর যেন বেরুচ্ছিলই না।

একটু খুলবেন কি? একটি ভদ্র গলার স্বর শোনা গেল।

শুভম ওঠে। লক খোলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কা। দরজার পাটাতন এসে ঠাস করে কপালে আঘাত হানে।

আহ্। বলেই দুম করে নিচে বসে পড়লো শুভম।

হুড়মুড় করে তিনজন উগ্র তরুণ রুমে ঢুকে গেল। একজন দরজা লাগিয়ে দিলো। একজন শুভমের মুখের ভিতর একটা কাপড়ের পোটলা ঢুকিয়ে গামছা দিয়ে মাথার পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিলো।

আর একজন সজোরে জাপটে ধরলো বীথিকে। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে।

আচমকা আক্রমণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় ও। ধস্তাধস্তি কিংবা চিৎকার দিতে ভুলে গেছে। শুভমের কপাল বেয়ে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। রক্ত দেখে হুঁশ ফিরে এলো বীথির।

ট্রেন ছুটছে রাতের শীতল বাতাসের বুক চিরে। বীথির মনে হলো ট্রেনটি যেন শুভমের বুক চিরেই হুস হুস করে ছুটে যাচ্ছে। ছন্দোময় তালটি যেন আরো ভয়ংকর হয়েছে, ভয়াবহ আরো কিছু ঘটার ডাক শুনতে পাচ্ছে যেন ও।

একজন পকেট থেকে সিগ্রেট বের করলো। লাইটার জ্বালালো।

উহ্। এতো বিকট গন্ধ। বীথির মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। ওরা গাঁজা টানছে এখন। সিগ্রেটের ভিতর গাঁজা।

জ্বলন্ত চুরুটের শীর্ষাংশটুকু দেখছে বিথী।

নিজের মনের শীর্ষ বিন্দুতেই যেন আগুন জ্বলে উঠেছে, দাউ দাউ করে তেড়ে উঠছে যেন আগুনের হলকা।

মুহূর্তের মাঝে নিজের অসহায়বোধ মিলিয়ে যায়, গর্জে ওঠে সে।

হাতের বাঁধনটি ততো মজবুত হয়নি। এক ঝটকায় খুলে ফেলে বাঁধনটি। মুখের কাপড়টিও এক টানে খুলে নেয়। চিৎকার দিতে ভুলে গেছে সে। চোখে ক্রুদ্ধতা।

একজন একটু এগিয়ে আসে। চকচকে একটি ধারালো ছোড়া বের করে। আর একজন বের করে একটি পিস্তল। শুভমের কপালে তাক করেছে পিস্তলটি।

কাপড় খুলে ফেল সুন্দরী, নইলে তোর নাগরের কপাল ফুটো হয়ে যাবে। তৃতীয় জনের নেশাচ্ছন্ন থমথমে আহ্বান। হুমকি।

বীথির চোখে আগুন। মুখ থেকেও বের হচ্ছে আগুনের ছটা। পিস্তলের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে শরীরে ভিতর যেন অন্য একটি আবহ তৈরি হলো।

অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই ভাবলো না, ভয় লজ্জা মুহূর্তের মাঝে যেন উবে গেল। দুর্দমনীয় এক তেজ এখন ওকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এক টানে খুলে ফেলে জীনসের প্যান্ট, ওপরের শার্টটিও খুলে ফেলে বীথি।

শরীরে এখন কেবল প্যান্টি এবং ব্রা। পুরো শরীর উদোম। জ্যান্ত এক নগ্নপ্রায় ধবধবে ফর্সা তরুণী ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। বেতের মতো ফিগারের টানটান বক্রতা। চোখ ধাঁধিয়ে যায় যুবকদের। কি করবে বুঝতে পারছে না তারা। বীথির উগ্র আচরণের সামনে ওদের প্লান প্রোগ্রাম যেন ভেসে যাচ্ছে।

বীথির চোখ জ্বলছে এখন। ক্ষোভের তীব্র আগুণ যেন ভস্ম করে দিচ্ছে যুবক তিনটিকে।

একজন কড়া একটা টান দেয় চুরুটে। চোখ পাকিয়ে বলে, আগে বসকে নিয়ে আয়, বসই প্রথম সোয়ারী হবে। তারপর আমরা। একে একে।

একজন দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

একজন খপ করে বীথির বাম হাত চেপে ধরলো।

শুয়ে পড় মাগী।

শাট আপ। গর্জে ওঠে বীথি। অপরিচিত মেয়েমানুষ দেখলেই মাগী মনে হয়, না? তোদের বোনও কি মাগী? মা?

ভয়াবহ ব্যাপার।

যুবক দুটি যেন নগ্নপ্রায় তরুণীটির তেজ দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছে। এ বিপদের মুখেও মেয়েটির ক্রুদ্ধতা নত হয়নি।

এ সময় দরজা খুলে প্রবেশ করছে সুদর্শন এক যুবক, কিছুটা বিক্ষিপ্ত। পাথরের মতো চোখ। অভিব্যক্তিহীন। হাতে একটি সিরিঞ্জ, খোলা।

গেঁথে দাও বস, পাছায় গেঁথে দাও। মাগীর তেজ কমিয়ে দাও।

চুপ। মাগী বলবি না। ধমকে ওঠে বীথি।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে নতুন যুবকটি। রুমে ঢুকেই ধারালো তরুণীটিকে দেখে নেশা কেটে গিয়েছিল, স্বর যেন পুরোপুরি বাস্তবে নিয়ে এলো ওকে।

নিজেই জানে না, কতোটুকু সাহস দেখাচ্ছে বীথি। নিজের অজান্তেই কেটে যাচ্ছিল প্রতিটি মুহূর্ত। সুদর্শন তরুণটির হাতে সিরিঞ্জ দেখে একটু নড়ে ওঠলো সে। বুঝতে পারে ওরা সব নেশাখোর। মাদকাসক্ত। নেশাখোররা সাধারণত নারী লোভী হয় না। সেক্সের প্রতি আসক্তি ওদের কমে যায়, একটা জার্নালে পড়েছিল। টাকার জন্য হেন কাজ নেই ওরা করতে পারে না।

এ মুহূর্তে কি চায় ওরা? ওর দেহ, না টাকা?

নেতাটি শুভমের দিকে আঙুল তুলে বলে, কে ও?

ভাই। দাপটের সঙ্গেই জবাব দিলো বীথি।

আপন ভাই?

হ্যাঁ, আপন। মিথ্যে বলতে একটুও কাঁপলো না বীথির স্বর।

আপন? আবারো জানতে চায় যুবকটি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনই। কেন, তোদের বোন নেই কারুর?

নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল যুবকটির। তবুও যেন মাতালের মতো টলে উঠলো, নাড়া খেলো।

নেশার ঘোরে নয়, বাস্তবের ঝাঁঝালো চাবুক যেন সড়াৎ করে পড়লো যুবকটির পিঠে। চেতনায়।

কি নাম তোর?

বীথি।

কি?

বীথি, বীথি। দু'বার উচ্চারণ করে সে, জোরেই।

বীথি নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। মুষ্টিবদ্ধ করলো। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে চিৎকার দিয়ে উঠলো, না। না।

সবাই থতমত খায়। বীথিও কম অবাক হয় না।

ওই চিৎকার ভয়াবহ বেদনার মর্মধ্বনিই যেন টেনে নিয়ে এলো যুবকটির ভিতর থেকে।

চোখ খোলে তরুণটি। গোল গোল চোখ দুটো ঘুরছে কেবল। হা হয়ে যায় সে।

একটু আগের মেয়েটি যেন উধাও হয়ে গেছে সামনে থেকে। যেন এই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তার আদরের ছোট বোন, যার নাম বীথি। যেন বলছে, ছিঃ। ছিঃ। দাদা, ছিঃ।

সিরিঞ্জটি সে খপ করে ঢুকিয়ে দেয় নিজ উরুতে। দ্রুত হাতে এলোমেলো লুটিয়ে থাকা বীথির ড্রেসগুলো কুড়িয়ে নেয়, ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে। শুভমের হাতের বাঁধন খুলে দেয়, মুখের কাপড় খুলে নেয়। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে রুম থেকে বের করে দেয়। নিজেও বেরিয়ে যাচ্ছিল, একবার ফিরে তাকালো, চোখে যেন মিনতি ঝড়ে পড়ছে। চোখ যেন ক্ষমা চাইছে, যেন বলছে আমাকে মাফ করে দিস বীথি।

শুভম টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, বীথির দিকে এগিয়ে যায়। বীথি এখনো স্তব্ধ। বাকরুদ্ধ। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শুভমকে দেখে নিজের চেতনা ফিরে পেলো।

দ্রুত প্যান্ট পরে। শার্ট পরে।

সোজা হয়ে দাঁড়ায়। শুভমকে ধরে নিচের বাথে শুইয়ে দেয়।

শুভম চোখ বদ্ধ করে আছে। বার বার মঞ্জুরাণীর কথা মনে পড়ছে। বিড়বিড় করে যেন আওড়াচ্ছে, সব পুরুষই চোর নয়, ডাকাত নয়। খারাপের ভিতরেও থাকে অনেক ভালো কিছু। ভালোটা আমরা খুঁজে পাই না, খুঁজে দেখি না। কেবল খারাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করি।

বীথির দুর্বল দুর্বল লাগছে। হাঁটু গেড়ে বসে শুভমের পাশে। হলের সিনিয়র ছাত্রী শারমিন আপার কথা মনে পড়ছে। পুরুষ চরিত্র বোঝা কঠিন, বড়ই কঠিন।

কঠিনের মাঝেও থাকে তরল। সেই প্রবাহধারায় সিক্ত এখন তার পুরো শরীর। শান্তিতে নিজের মাথা নোয়ায় শুভমের বুকের ওপর।

খারাপ যুবকটির চোখের ভিতর সে দেখতে পেয়েছে একটি সুন্দর চোখ। এই চোখ তার ভালোবাসার বিশ্বাসের মূলে যেন সিরিঞ্জিং করে ঢুকিয়ে দিয়েছে অলৌকিক এক শক্তি। সেই শক্তিতে দু'বাহু দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে শুভমকে, ভালোবাসার মানুষটিকে।

পুরুষের প্রতি বিশ্বাস বেড়ে গেছে সহস্র গুণ বেশি।

ব্যাখ্যা ঃ

দু'টি তরুণ-তরুণীর আবেগ, দৈহিক প্রতিক্রিয়া ধারাবাহিকভাবেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে গল্পটিতে।

মন কী চায় ?

আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে এটিই প্রমাণিত যে, মন চায় দেহ। মন চায় ভালোবাসা। মন চায় বিশ্বাস। বিশ্বাসই আবেগের গিঁট শক্ত করে– পজিটিভ ইমোশন সমুজ্জ্বল করে। বিশ্বাসহীনতায় ভালোবাসার কোনো ভিত রচিত হতে পারে না। বিশ্বাসের অভাব হলে দৈহিক ব্যাপারগুলোও শীতল হয়ে যায়।

মনের একটি জটিল ব্যাধিঃ সিজোফ্রেনিয়া

সিজোফ্রেনিয়া বলতে কি বোঝায়?

সিজোফ্রেনিয়া একটি জটিল মানসিক ব্যাধি।

এই রোগে মূলত চিন্তা, আবেগ, আচরণ, ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার মাঝে গোলমাল দেখা দেয়। রোগীর নিজস্ব চিন্তা ও আচরণের মাঝে সমন্বিত ধারা বজায় থাকে না, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। ফলে রোগীর ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

'সিজো' অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া, 'ফ্রেনিয়া' অর্থ মন।

অর্থাৎ এই রোগে মনের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিল হারিয়ে যায়, বিশৃঙ্খলার জট তৈরি হয় মনের ভেতর। ফলে ব্যক্তিত্বের কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায়, অধঃপতিত হয় ব্যক্তিত্বের নানা বৈশিষ্ট্য।

যদি চিকিৎসা না করা হয়, বা চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব ঘটে তবে রোগটি ক্রমান্বয়ে জটিল হতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত তীব্রতার কারণেও সিজোফ্রেনিয়া দীর্ঘায়িত হতে পারে, ক্রনিক হতে পারে।

সিজোফ্রেনিকস কাদের বলা হয়?

সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত রোগীদের সিজোফ্রেনিকস বলা হয়ে থাকে।

সিজোফ্রেনিয়ার বর্ণনা ঃ সিজোফ্রেনিকস শনাক্ত করার উপায় কি ?

সিজোফ্রেনিয়া শনাক্ত করার জন্য রয়েছে কিছু গুচ্ছ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সব সিজোফ্রেনিয়া রোগের বহিঃপ্রকাশ একইরকমভাবে ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ধারার উপসর্গ দেখা যায় রোগীর ভেতর।

সাধারণত সমস্যা শুরু হয় চিন্তার অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে। চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতার কারণে ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় রোগী। যে-কোনো বিষয়ই তখন তার কাছে জটিলতর মনে হতে থাকে। ধীরে ধীরে চিন্তার বিভ্রান্তির সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগীয় সমস্যা– অ্যাংজাইটি কিংবা ডিপ্রেশনেও ডুবে যেতে পারে রোগী।

জট পাকতে থাকা চিন্তার শুরু থেকেই দৃঢ় ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের আসন পেতে বসতে পারে রোগীর ভেতর। নিজের সঙ্গে নিজেই বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলতে পারে, একা একা হাসতে পারে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে, অথবা পুরনো জানা শব্দের নতুন অর্থ বের করতে পারে রোগী।

মনের চিন্তা এবং আবেগীয় অবস্থা আক্রান্ত হওয়ার পরই আচরণগত অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। হঠাৎই সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণে বিঘ্ন ঘটতে পারে, অতি ধীর গতিতেও আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন চলে আসে সিজোফ্রেনিকসদের ভেতর। ভয় কিংবা দৃঢ়মূল অলীক বিশ্বাসের কারণে রোগী নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছেড়ে দিতে পারে। ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিজেকে সেঁটে ফেলতে পারে, একাকী জীবনের বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে যেতে পারে।

এমনও হতে পারে, রোগীর ভেতর আগ্রাসী ধ্বংসাত্মক উন্মাদনা জেগে উঠেছে, জিনিসপত্র ভাংচুর করছে, অন্যকে আঘাত করছে। নিজস্ব কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা অনুধাবণ করতে পারে না বলেই রোগীর আচরণের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যায়, অবাস্তব জগতের গোলক ধাঁধায় আটকে যায় রোগী।

এ ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতি সাইকিয়াট্রিক ইমারজেন্সি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এক পর্যায়ে রোগীর প্রত্যক্ষণে সমস্যা শুরু হয়ে যেতে পারে। একা একা আছে রোগী, আশেপাশে কেউ নেই, কেউ কথা বলছে না, কিন্তু রোগী কানে কথা শুনতে পারে। কান খাড়া করে অনেক সময় কথা শোনার চেষ্টা করে। সিজোফ্রেনিয়া রোগের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কথা শোনার ব্যাপারে। সাধারণত রোগী দুই তিনজন বা বহুজনের কথা শুনতে পায়। রোগীর মনে হতে থাকে কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। তবে কথা শোনার ব্যাপারে বহু বৈচিত্র্যতা রয়েছে।

এমনও হতে পারে, নিজের চিন্তা নিজেই কানে শুনতে পায় রোগী। অথবা বিশ্বাস করে, সে যা চিন্তা করছে এগুলো তার চিন্তা নয়। অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তিধর তার মাথায় চিন্তাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে বা কোনো যন্ত্রের সাহায্যে তার চিন্তাগুলো কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মিডিয়ার মাধ্যমে চিন্তাগুলো ছড়িয়ে পরছে, সবাই জেনে ফেলছে। রোগী অনেক সময় বিশ্বাস করতে থাকে যা সে করছে বা ভাবছে, এগুলো তাকে দিয়ে কেউ করিয়ে নিচ্ছে, নিজে করছে না, নিজে ভাবছে না।

অনেক সময় খেলার ধারা বিবরণীর মতো নিজের প্রতিটি কাজ বা ভাবনার 'রানিং কমেনট্রি' শুনতে পায় রোগী। সিজোফ্রেনিয়া রোগের ডায়াগনোসিসের জন্য এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য।

নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে অধিকাংশ সিজোফ্রেনিকসেরই কোনো তাগিদ থাকে না, নজর থাকে না। গন্ধময় হয়ে ওঠে শরীর, পোশাক পরিচ্ছদ। রোগীর মাঝে নেগেটিভ উপসর্গও দেখা দিতে পারে ঃ কথাবার্তা একদম কমে যেতে পারে, যে-কোনো ধরনের কাজের তাগিদ ও উদ্যোগ একদম নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরী আলাদা হয়ে যেতে পারে রোগী, আবেগের দিক থেকে একেবারেই ভোতা হয়ে যেতে পারে বা আবেগ শূন্যও হয়ে যেতে পারে।

কারা এই রোগে ভুগে থাকে

কারা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নাই। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, যারা অতিমাত্রায় লাজুক, কিংবা নিজেই নিজের মাঝে ডুবে থাকে এমন ব্যক্তিত্বের মানুষই বেশি ভুগে থাকে এই রোগে। সিজোফ্রেনিয়া রোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে, এমন জনগোষ্ঠীও রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থেকে যান।

১৫-৪৫ বৎসরের মধ্যে ব্যাধিটি শুরু হতে পারে। তবে আক্রান্ত রোগীদের পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পুরুষের ব্যাধিটি শুরু হওয়ার গড় বয়স ২৮ বৎসর, মহিলাদের ৩২ বৎসর। ব্যতিক্রমধর্মী এক ধরনের সিজোফ্রেনিয়া আরো বিলম্বে শুরু হতে পারে। এটিকে বলে 'লেট অনসেট সিজোফ্রেনিয়া'। দেখা গেছে ৪৫ বৎসরের পর, এমনকি ৫০-৭০ বৎসরের মধ্যেও রোগটি শুরু হতে পারে।

মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি হারে এবং বেশি জটিলতা নিয়ে আক্রান্ত হয়। অত্যধিক মানসিক চাপের মুখোমুখি হলে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিরা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে।

দেখা গেছে দুর্দশাগ্রস্ত আর্থসামাজিক এলাকাগুলোতে রোগের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। চিকিৎসা সেবা গ্রহণ না করার কারণেই এমনটি ঘটতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ধনী দরিদ্র প্রভেদ নেই, সবারই রোগের প্রতিরক্ষাব্যুহ একই রকম, একই হারে ঝুঁকিতে থেকে যায় সবায়।

কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা পেলে রোগের উন্নতি ঘটে থাকে, সুস্থ হয়ে ওঠে রোগী।

সিজোফ্রেনিকসদের কি ব্রেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

না। তবে অতি সামান্য গাঠনিক পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া গেছে ব্রেইনে। এই পরিবর্তনের কারণে সিজোফ্রেনিয়া আছে কি নাই তা প্রমাণিত হয় না। তবে ব্রেইনের নিউরো ট্রান্সমিটর-ডোপামিনের পরিমাণ বেড়ে যায় এই রোগ।

বিনা চিকিৎসার ফলাফল কি?

অস্বাভাবিকভাবে রোগটি জটিলতর হতে থাকবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিদ্রুত রোগটি জট পাকাতে থাকে।

রোগের ধরন হতে পারে মৃদু প্রকৃতির, মধ্যম ও তীব্র আকারের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবন বিধ্বংসী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের রোগীদের ১০% আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে।

সাধারণ জনগোষ্ঠী সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানতে হবে নিজ থেকেই ভালো হওয়ার মতো রোগ নয় এটি। বিনাচিকিৎসায় অযত্ন অবহেলার শিকার হলে রোগের ধ্বংসযোগ্য গতি অতিরোধ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

এই রোগে কি বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে?

বুদ্ধিদীপ্ত ফ্যাকালটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

সিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোসিস হয়েছে এমন রোগীদের স্বাভাবিক বুদ্ধির ঘাটতি নাও থাকতে পারে।

সব ধরনের সিজোফ্রেনিয়ার কি চিকিৎসা আছে?

অবশ্যই আছে।

তীব্রতা এবং ধরনের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা সেবার প্রকৃতি, সময় এবং পদ্ধতি বা কৌশল ভিন্নতর হতে পারে।

কোনো রোগই বিনা চিকিৎসায় রেখে দেওয়া উচিত নয়। রোগ হলেই সঠিক উত্তর হলো সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মনে রাখতে হবে, অতিন্দ্রিয় কোনো ক্ষমতাবলে রোগটি ভালো হয় না, আরো মনে রাখতে হবে, জীন-পরী বা ভূত, প্রেত্নীর আছরের কারণে এই রোগের উদ্ভব ঘটে না।

এগুলো সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব। এই কুসংস্কারের কারণে রোগী অমানবিক পরিস্থিতির শিকার হয়।

শারীরিক অনেক রোগই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, অ্যাজমা ইত্যাদি। এসব রোগের জন্য সারাজীবনই ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়ার জন্যেও দীর্ঘদিন বা পুরোজীবন ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোয়ালিটিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা

এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হলো সাইকিয়াট্রিক ও মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট। ওষুধের মাধ্যমে এই চিকিৎসা চালাতে হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ ও ফলো আপ চিকিৎসার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে বিশ্বে নতুন নতুন অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সিজোফ্রেনিয়া রোগের বিরুদ্ধে কোয়ালিটিপূর্ণ এসব ওষুধের মাধ্যমে যুদ্ধে অনেক পজিটিভ লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ইলেকট্রিক শক (ইসিটি- ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি) এর মাধমে বিশেষ ধরনের সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসা করা হয়। ফলাফল খুবই ভালো। তবে ইসিটি নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ। মিথের প্রভাব থেকে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত একজন রোগী অন্যান্য শারীরিক রোগেও ভুগতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, এরা সাধারণ জনগোষ্ঠী অপেক্ষা দুই গুণ বেশি হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও ত্বকের সমস্যা, ইনফেকশন, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, ফুসফুস ও মূত্রযন্ত্রের নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাইকিয়াট্রির পাশাপাশি এদের মেডিক্যাল চিকিৎসার প্রতি নজর রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, কমিউনিটি চিকিৎসক, মেডিক্যাল অফিসার, সাইকিয়াট্রিক নার্সেস সবার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়াও আছে সাইকোলজিক্যাল ও সোশাল ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি। রোগীর পুনর্বাসনও একটি বড় অধ্যায়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিক সোশাল ওয়ার্কারদের ভূমিকাও প্রয়োজনীয় একটি পর্ব।

শুরু থেকেই অভিভাবকদের কাউন্সিলিং ভালো ফল দেয়। রোগী অনুযায়ী বেহেভিয়ার থেরাপি, ফ্যামিলি থেরাপি অকুপেশনাল থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে

সমৃদ্ধ করা যায়। চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হচ্ছে গ্রুপ থেরাপি। এই থেরাপির মাধমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে রোগী নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হয় সিজোফ্রেনিক রোগীরা। এদের পুষ্টির বিষয়টির প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

সারা জীবনই কি ওষুধ খেতে হবে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর হলো "না"।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা কারণে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে।

এসব ক্ষেত্রে উত্তর হলো "হ্যাঁ"।

আরোগ্য লাভের পর কেন রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে?

- ❑ পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া।
- ❑ অনিয়মিত ওষুধ খাওয়া।
- ❑ পারিবারিক সদস্যদের উগ্রব্যবহার, পারিবারিক ও আবেগীয় চাপের মুখোমুখি হওয়া।
- ❑ সামর্থের বাইরে এমন কাজ হাতে নেওয়া বা চাপিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি।

কিভাবে পুনরাক্রমণ রোধ করা যায়?

- ❑ নিয়মিত 'ফলো আপ' চিকিৎসা পর্বটি বজায় রাখা।
- ❑ পারিবারিক সদস্যদের চিকিৎসা সেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ।
- ❑ রোগীর পুনর্বাসন।
- ❑ চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা ও প্রতিকারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

রোগী কি ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে?

না। সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধে রোগী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে না। চিকিৎসক মনে করলে যে-কোনো সময় ওষুধ বন্ধ করে দিতে পারেন। এতে রোগীর ওপরে ওষুধের কারণে কোনো অসুবিধে হয় না।

ওষুধের কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে?

হ্যাঁ। অন্যান্য ওষুধের মতো সিজোফ্রেনিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধের টক্সিক প্রভাব থাকতে পারে। যুক্তিসংগত কারণে ওষুধটি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিত। যে-কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর হতে পারে, অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতার কারণে কম বেশি হতে পারে, নাও হতে পারে। আসলে খুব অল্প সংখ্যক রোগীর মধ্যেই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পূর্ব থেকেই সাইড এফেক্ট বোঝার মতো কোনো মার্কার নাই। তবুও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। সব সমস্যাই সহজে মোকাবেলা করা যায়।

বিয়ে কি এই রোগের একটি সমাধান?

না। চিকিৎসার জন্য কিংবা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে উত্তর হবে অবশ্যই 'না'।

মনে রাখতে হবে বিয়ে হচ্ছে মানুষের একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভুলভালে সমাজে বিশ্বাস করা হয়, বিয়ের মাধ্যমে সমস্যার উন্নতি সম্ভব। কখনই না।

প্রকৃতপক্ষে বিয়েজনিত মানসিক চাপ উপসর্গের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, চলমান চিকিৎসার সুফল বাধাগ্রস্ত করে। ফলে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে কিংবা ভালো হওয়ার পর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তবে দেখা গেছে, পুরোপুরী ভালো হয়ে গেছে, এমন রোগীরা বিয়ের পর সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে। কিন্তু যারা দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যায় ভুগেছে তারা বেশি সমস্যায় পড়ে বিয়ের কারণে।

বাড়িতে রেখে কি সিজোফ্রেনিকসদের চিকিৎসা সম্ভব?

হ্যাঁ। অধিকাংশ রোগীকেই সফলতার সঙ্গে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব। শর্ত হলো, চিকিৎসার সুপারভিশনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে বাড়ির কাউকে।

কখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে?

রোগীর ভর্তির ব্যাপারে চিকিৎসকের 'অ্যাসেসমেন্ট' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্ত কারণে ভর্তি করানো হয়ে থাকে–

❑ যখন রোগী সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষণের সমস্যায় ভোগে। সন্দেহ প্রবণতার কারণে ধ্বংসযোগ্য উন্মত্ততায় লিপ্ত হয়।

❑ তার আচরণ যখন নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করে।

❑ যখন রোগী আত্মহত্যার পরিকল্পনা কিংবা 'এটেমন্ট' গ্রহণ করে।

সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা

❑ পরিবারের একটি প্রধান কাজ হলো চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মেডিকেল টীমের সঙ্গে রোগীর যোগসূত্র নিয়মিত রক্ষা করা। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সার্বিকভাবে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।

❑ রোগীর শারীরিক নিরাপত্তা, অপূর্ণ চাহিদা মেটানো, এবং আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেখাতে হবে পরিবারকে। কোনো মতেই রোগীর সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়, সমালোচনা করা চলবে না, সামাজিক বিধি নিষেধের খড়্গ ঝুলিয়ে রোগীর জীবন প্রবাহ অবরুদ্ধ করা যাবে না।

❑ রোগীর জন্য প্রয়োজন আনন্দপূর্ণ কোনো কাজের ব্যবস্থা করা। পুনর্বাসন ও সাপোর্ট নিশ্চিত করা গেলে রোগের উন্নতিও দ্রুত আশা করা যায়।

❑ সব ক্ষেত্রেই রোগীর জন্য সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। তবে ওভার প্রটেকশনের দরকার নেই। তার মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবারকে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। রোগীর খাবারের প্রতি নজর রাখতে হবে, পুষ্টিহীনতা রোধ করতে হবে।

সিজোফ্রেনিকসদের কি কর্মক্ষম রাখা সম্ভব?

বিশ্বব্যাপী গবেষণায় দেখা গেছে, এদের প্রতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের রয়েছে একটি নেগেটিভ এটিচ্যুড। এই মনোভাব গড়ে উঠেছে সনাতন কুসংস্কারের কারণে। ইদানীংকালে গবেষণার আরো দেখা যাচ্ছে, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এদের সুস্থ করা সম্ভব। কর্মক্ষম রাখা যায়। নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে, কিছুটা সহমর্মী হতে হবে। কর্মকালীন সময়ে রোগীকে কিছুটা সুবিধা দিতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবর্তে সহজ কাজের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকলে রোগী কর্মক্ষম থাকতে পারে। উপার্জন হাতে এলে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে তার। মনের দাবী পূরণ হবে।

বেকারত্বই এ ধরনের রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। তাই গ্রন্থিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক স্লোগান 'বেকারত্ব ও মানসিক চাপ ঃ কর্মসংস্থানই প্রতিকার'।

সাধারণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় সিজোফ্রেনিকসদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগীদের সহায়তার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা মানবিক দায়িত্ব।

মনের ব্যায়াম ঃ স্মরণশক্তি যেভাবে শাণিত করা যায়

ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ চলছে।

সৌরভ গাঙ্গুলি এবং শচীন তেন্ডুলকার ব্যাট করছে। সোনি টিভি সরাসরি খেলাটি সম্প্রচার করছে।

এক সপ্তাহ পরই বার্ষিক পরীক্ষা ময়ুখের। তবুও টিভির সামনে থেকে নড়তে পারছে না। শচীনের ব্যাটিং না দেখে কি পারা যায়?

ময়ুখ মেধাবী ছাত্র। পড়ার ইচ্ছেও আছে। তবুও এক নাগাড়ে বসে আছে টিভি রুমে। মা-মণি একটি প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করতে দিয়েছেন, বিকেলেই পড়া ধরবেন বলেছেন। সেই তাগিদটিও তার ভেতরে কাজ করছে।

খেলা দেখার নেশা ছাড়া যায় না, পড়ার ইচ্ছেও বাদ দেয়া যায় না– দুটোই পছন্দনীয় ব্যাপার, দুটো বিষয়ের প্রতিই সমান আকর্ষণ। কোনোটিই পালন করা যাচ্ছে না ঠিকমতো। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের অবস্থাকে বলে আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব (approach- approach conflict)।

এ ধরনের দ্বন্দ্ব মনের ওপর চাপ ফেলে। সহজে এ অবস্থায় মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। পড়া মুখস্থ করা কঠিন। এ ছাড়াও সব সময় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে থাকলে নানা ধরনের ক্ষতিকর শারীরিক এবং মানসিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

ইতিমধ্যেই মামণি কয়েকবার টিভি রুমে এসেছেন। মুখে কিছুই বলেননি, কেবল কড়া চোখে ময়ূখকে দেখে গেছেন।

মায়ের আদর পেয়েই অভ্যস্ত সে। কড়া শাসনে অভ্যস্ত নয়। এক সময় টনক নড়ে তার। পড়ার রুমে এসে বই খুলে বসে। এক লাইন পড়ে, আবার উঠে টিভি রুমে উঁকি দেয়, স্কোর দেখে আসে। এভাবে দশ মিনিটের পড়া মুখস্থ হতে সময় লাগে একঘণ্টারও বেশি।

মা-মণি পড়া লিখতে দিয়েছেন।

অবাক হয় ময়ূখ। পদে পদে ঠেকে যাচ্ছে, লিখতে পারছে না টানা গতিতে। ভুল হচ্ছে বার বার। এমন তো সাধারণত ঘটে না। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

স্মরণশক্তি কি কমে গেছে তার?

স্মরণশক্তি কীভাবে বাড়ানো যায়, কীভাবে সুসংহত করা যায় বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই।

বিজ্ঞান বলছে, মনের গভীর একাগ্রতাই স্মরণশক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ধারাকে সহজতর করে।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জন্মগত বা জেনেটিক একটি বিষয় জড়িত আছে ঠিকই, এক্ষেত্রে পরিবেশের অবদানও কম নয়। সুন্দর পরিবেশ মনকে সতেজ করে, নানাভাবে বুদ্ধি বিকাশের ধারাকে উদ্দীপ্ত করে।

খুব মনোযোগের সঙ্গে যা শেখা হয়, স্মৃতির পাতায় তার ছাপ হয় দৃঢ়। ব্রেইনের তথ্যলিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি হয় দীর্ঘস্থায়ী। ফলে সহজে 'অনেক পড়া' বা তথ্য দীর্ঘদিন মনে রাখা যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরাই ভাল রেজাল্ট করে। শুরুতেই আমরা মেধাবী ছাত্র ময়ূখকে দেখলাম। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে মনোযোগের ঘাটতি চলতে থাকলে তার রেজাল্টও ক্রমে খারাপ হতে থাকবে। একটি মেধাবী ছাত্র এভাবেই তলিয়ে যেতে থাকে।

গুরুজনরা বলে থাকেন, 'মন দিয়ে পড়ো, চোখ কান খোলা রেখে শেখো।'

এই বাক্যটি কেবলমাত্র গুরুজনদের শাদামাঠা উপদেশ নয়, এখানেও লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা সেই লুকানো সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

তাই জানতে হবে মন কী?

সাধারণত বুকের বামদিকে আলতো করে হাত রাখি আমরা। বলি এই তো এখানে মন।

এটি কিন্তু সত্য নয়। বুকের বামদিকে আছে হৃৎপিণ্ড বা হার্ট। মন হচ্ছে ব্রেইনেরই অংশ যা চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিষয়বস্তুর ওপর মন নিমগ্ন করার অর্থ বা মনোযোগী হওয়ার মূল সূত্রই হচ্ছে 'শিক্ষণীয় পড়ার' সঙ্গে ব্রেইনের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় বন্ধনে ধরে রাখা, চালিত করা।

স্মৃতির ভিতকে দৃঢ় করতে চোখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিজ্ঞানের যুগে অডিও-ভিডিও শব্দগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচিতি দিন-দিনই বাড়ছে। কানে শোনা, চোখে দেখা, দেখা ও শোনার মাধ্যমে মিল ঘটিয়ে যদি কিছু শেখা যায়, দীর্ঘদিন মনে থাকে। স্মরণ করা যায় সহজে।

চোখের সঙ্গে ব্রেইনের রয়েছে সরাসরি সংযোগ। চোখ দৃশ্যমান বস্তুর ছবি ধারণ করে, ইমেজ সৃষ্টি করে। ইমেজকে বিশ্লেষণ করে ব্রেইন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণের কারণেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

বড়রা আর একটি উপদেশ প্রায় দিয়ে থাকেন, 'খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া।' উপদেশটি শুনতে শুনতে গা-সওয়া হয়ে গেছে, তেমন পাত্তাই দিতে চাই না আমরা, তাই না?

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই উপদেশটিও বিজ্ঞানের মূল সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গুরুজনরা হয়তো বিজ্ঞানের সেই সত্যটুকু জানে না।

ময়ূখ-এর দিকে আমরা আর একবার ফিরে তাকাতে পারি। মেধাবী এই ছাত্রটি দুটো কাজ একসঙ্গে চালাতে গিয়ে আজ বিব্রত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। ময়ূখ খেলা দেখবে, কিংবা খেলায় অংশ গ্রহণ করবে, এই ধারায় বিজ্ঞান নিষেধ করে না। বরং উৎসাহিত করে। যখন যে কাজটি প্রয়োজন, যেটির উপযুক্ত সময় বা যেটির গুরুত্ব বেশি সেই 'মোক্ষম সময়টি' উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেককেই। এভাবেই একজন পেয়ে যেতে পারে উপরে ওঠার স্বচ্ছল সিঁড়িটি। মনে রাখতে হবে, সময়ের মূল্য অনেক বেশি। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চাওয়া-পাওয়া, ব্যর্থতা বা হতাশা, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি ইত্যাদি যদি সব সময় মনের ভেতর ঘুরঘুর করতে থাকে তাহলে ব্রেইন নতুন তথ্য সহজেই ধারণ করতে পারে না।

তথ্যই যদি লিপিবদ্ধ না হয়, স্মরণশক্তি বাড়বে কীভাবে?

স্মরণশক্তি ভালো না হলে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে– সবাই বলবে ছেলে বা মেয়েটির মেরিট ভালো না, বুদ্ধি কম।

এই অপবাদের বোঝা সহজেই দূর করা যায়। টেবিলে পড়তে বসে যদি চারপাশের সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বইয়ের সঙ্গে মনকে একাত্ম করা যায়, তাহলে শিখতে সময় লাগে কম, স্মরণশক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়। বুদ্ধি হয় শাণিত।

আমাদের দেশ ক্রিকেটে বিশ্বকাপ খেলে এসেছে, বিরাট সাফল্য ও সম্মান বয়ে এনেছে ক্রিকেট বীররা। আমরাও এখন ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে চাই, তাই না?

বিখ্যাত ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার বলেছেন, 'একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান হতে হলে প্রতিটি বলের সঙ্গে মনের সূক্ষ্ম যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে, তীক্ষ্ণ চোখে বলটি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।'

এই বাক্যটির ভিতরও বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে আছে মন ও চোখ। যে যতো বেশি মনোযোগী হতে পারবে– কী লেখায়, কী পড়ায়, কী খেলায়, চিত্রাংকনে, গানে কিংবা আবৃত্তিতে, সে ততোবেশি সফল হবে, জয়ী হবে।

স্মরণশক্তি শাণিত করার কিছু কৌশল

❑ উইলিয়াম জেমস নামক একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, 'স্মৃতি হচ্ছে পেশীর মতো। নিয়মিত ব্যায়াম করলে পেশি হয় সুদৃঢ়, পুরুষ্ট।' স্মৃতিকেও তেমনি ধারালো ও সতেজ রাখা যায় নিয়মিত পরিচর্চার মাধ্যমে।

❑ যা শেখা হচ্ছে, কেবলমাত্র গড়গড় করে মুখস্থ করে গেলেই চলবে না। একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে কী শিখলাম, দেখতে হবে যা পূর্বে শিখেছি তার সঙ্গে নতুন শিক্ষণীয় তথ্যের সঙ্গে কোনো মিল আছে কিনা। এই প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজিতে বলে elaborative rehearsal। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক শিখলাম, মৌলিক রং তিনটি– লাল, নীল, সবুজ।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হয়তো শব্দ তিনটি মুখস্থ হয়ে গেল। পরের দিন যদি প্রশ্ন করা হয় মৌলিক রং কি কি?

দেখা যাবে হয়তো লাল নীল সবুজের সঙ্গে হলুদ, শাদা এসেও ভিড় জমাচ্ছে। সঠিক উত্তর দেয়া যাচ্ছে না।

যদি এভাবে শিখি, যদি শেখার সময় এভাবে মনে মনে চিন্তা করি ঃ

লাল– সূর্যের রং লাল।

নীল – আকাশের রং নীল।

সবুজ – গাছ-গাছালির রং সবুজ।

একমাস পরও যদি মৌলিক রং সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, সহজেই উত্তর বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে সূর্য, আকাশ, গাছ-গাছালি কিউ (Cue) হিসাবে কাজ করবে। সূর্যের কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল রঙের কথা ভেসে উঠবে চোখের সামনে, আকাশের দিকে চোখ পড়লে নীল রঙের কথা মনে পড়বে, গাছ-গাছালির দিকে তাকালে সবুজ রঙের কথা স্মরণ করা সহজতর হবে।

❑ নির্দিষ্ট সময়ের কাজ সঠিক সময়েই শেষ করা উচিত। আজকের পড়া আগামীদিনের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে না।

প্রবাদ আছে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।' খুবই সত্যি প্রবাদ এটি। একসঙ্গে বেশি পড়া শিখতে গেলে স্মৃতির ভিত নড়বড়ে হয় যায়।

❑ বার বার পড়তে হবে, জানা থাকলেও বার বার আবৃত্তি করতে হবে। 'মনে আছে' এমন বিষয় পর পর কয়েকবার রিহার্সেল দিতে পারলে স্মৃতির ভান্ডারে স্থায়ী আন গেঁড়ে বসে। সহজে উড়ে যেতে পারে না। মগজের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থায়ীভাবে গাঠনিক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। এই পরিবর্তন সুদূর প্রসারী ফল দেয়।

❑ শেখার পর লেখার চর্চা করতে পারলে লাভ হয় সবচেয়ে বেশি। লিখে লিখেও শেখার ফলাফল ভালো। শেখা বিষয় থেকে প্রশ্ন তৈরি করে মনে মনে উত্তর খুঁজে নেওয়ার চর্চাও গুরুত্বপূর্ণ।

❑ মনে রাখার আর একটি সহজ উপায় হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ করে শেখা। আমরা ছড়া শিখি, গান ও কবিতা শিখি। এক লাইন মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের মিল থাকার কারণে পরবর্তী লাইনটিও মনে এসে যায়।

জটিল বিষয়বস্তুকে যদি ধাপে ধাপে সুসংগঠিত (organised) করে শেখা যায়, অনায়াসে স্মরণ করা সম্ভব।

❑ কিছু শেখার পর ঘুমাতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তখন কোনো রকম ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই আসন কেড়ে নিতে পারে স্মৃতির পাতায়।

❑ সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যাচ্ছে এক ধরনের ফ্যাটি এসিড ব্রেইনের বিভিন্ন কার্যক্রমের জড়তা দূর করে, চিন্তা শক্তির প্রখরতা বাড়ায়, বুদ্ধিদীপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে, স্নায়ুকোষের উন্নতি সাধন করে, ব্রেইনের ভেতর সরু রক্তনালীগুলোর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ রাখে স্বচ্ছল, স্বাভাবিক। এই ফ্যাটি এসিডটির নাম ওমেগা-তিন।

সামুদ্রিক মাছে পর্যাপ্ত ওমেগা-তিন রয়েছে। বিশেষ করে ইলিশ, রূপচান্দা এবং সামুদ্রিক চিংড়ি মাছে ওমেগা-তিন এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। গবেষকরা বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় এই সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

❑ সবুজ পাতাযুক্ত উজ্জ্বল রঙের শাক-সবজিতে আছে ভিটামিন- এ, সি এবং ই। বিভিন্ন ধরনের তাজা ফলেও রয়েছে এই উপাদান। এই উপাদানগুলো এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, স্নায়ুকোষের সুরক্ষার জন্য যা খুবই প্রয়োজন। ভিটামিন-বি গ্রুপের উপাদান ইনোসিটল এবং কোলিন, এসিটাইলকোলিন নামক নিউরো-ট্রান্সমিটর পদার্থটি তৈরি করে। এটি স্নায়ুকোষের ত্বরিত যোগাযোগ ব্যবস্থাটি সচল রাখে। এসিটাইলকোলিনের অভাবে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

কলিজা, ডাল, বাদাম, ভাত এবং আটায় এই উপাদানের ভিটামিন পাওয়া যায়।

যারা সবুজ শাক-শবজি, তাজা ফলমূল এবং উল্লিখিত সামুদ্রিক মাছ খেতে চায় না তথ্যগুলো জানার পর আশা রাখছি তারা এসব খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হবে, উৎসাহী হবে।

❑ নিয়মিত খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা উচিত।

তবে খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া– এই কথাটি মনে রাখতে হবে। এরোবিক ব্যায়ামও প্রয়োজন।

খেলাধূলা এবং এরোবিক এক্সারসাইজের মাধ্যমে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো যায়। অক্সিজেন হচ্ছে ব্রেইনের কোষের জ্বালানি।

জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত থাকলে ব্রেইনের কাজের ক্ষিপ্রতাও থাকে স্বাভাবিক। স্মৃতিশক্তি, দ্রুত চিন্তা করা, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এভাবে বাড়ানো যেতে পারে।

❑ সবার ওপরে মন।

থাকতে হবে মনের একাগ্রতা অদম্য ইচ্ছা, দৃঢ়তা।

তবেই স্মৃতির ভিত হবে উন্নততর, পুষ্টিসমৃদ্ধ, সমুজ্জ্বল।

মনের চর্চা ঃ বুদ্ধি যেভাবে ধারালো করা সম্ভব
প্রসঙ্গঃ ব্রেইন আইকিউ ও পরিবেশ

বুদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই।

গবেষকরা বুদ্ধির নানা অনুষঙ্গ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। সবার দৃষ্টিভঙি এবং গবেষণার প্রেক্ষাপট একই নয়। তাই মতামতে রয়েছে ভিন্নতা। বুদ্ধি মূলত প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া নির্ভর। চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বুদ্ধির অবয়বটি ফুটে ওঠে, পুরিপুষ্ট হয় বুদ্ধি দীপ্তির বিভিন্ন স্তর বা ধাপ।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক শিশুই ইন্টারনেটে হান্ট করার সুযোগ পাচ্ছে। ষাটের দশকের একজন ব্যক্তির রেডিও প্রীতিকে এরা কী চোখে দেখবে? ইন্টারনেট প্রযুক্তির জয়জয়কারের স্রোতে রেডিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নতুন প্রজন্মের শিশুটির কাছে হাস্যকরই মনে হতে পারে, সেকেলের বোকামো আচরণ হিসাবেই মূল্যায়ন পাবে। অর্থাৎ যুগের আবাহ ও সময়ের দাবী বৃদ্ধিদীপ্তির প্রকাশভঙিটি বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে।

গ্রীক সভ্যতায় বুদ্ধির পরিমাপক ছিল 'ধারালো বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা।' লেখার ক্ষমতা যাদের বেশি ছিল, লেখার মাধ্যমে যারা সৃজনশীলতা দেখাতে পেরেছিলেন চীনারা তাদেরই বুদ্ধিমান হিসাবে সম্মান করতো। যারা শিকারে ক্ষিপ্রতা দেখাতে পারতেন, সাহসের সঙ্গে হিংস্রপ্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে জিতে যেতেন, প্রাচীন আফ্রিকার বিভিন্ন গোত্রে তারাই ছিল বুদ্ধিমান। ডিঙ্গী নৌকা চালানোর দক্ষতাই ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে বুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। গার্ডনার নামক একজন গবেষক সঙ্গীতের পারদর্শিতা এবং খেলাধূলার দক্ষতাকে ক্ষুরধার বুদ্ধির উপাদান হিসাবে দেখেছেন।

তাহলে কি বলা যায় বুদ্ধি একক কোনো মনন ক্ষমতা নয়?

বুদ্ধি কী অনেক গুণের সমাহার?

আসুন, বুদ্ধির গ্রহণযোগ্য সঞ্জার দিকে আমরা ফিরে তাকাই। ডেভিড ওয়েসলার বুদ্ধির টেস্ট নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রণীত সজ্ঞা (১৯৫৮) এবং টেস্টগুলো এখনো সমান মর্যাদা পেয়ে আসছে।

ওয়েসলারের মতে "লক্ষ্য নির্ধারণ করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাজ করা, যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করা, সাফল্যজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং পরিবেশ উদ্ভূত সমস্যার বাস্তব সম্মত সামাধান করার দক্ষতাই হলো বুদ্ধি।

প্রণীত বুদ্ধির পরিমাপককে বলা হয় আইকিউ (intelligence quotient)।

$$\text{আইকিউ} = \frac{\text{মনের বয়স}}{\text{সত্যিকার বয়স}} \times ১০০$$

মনের বয়স এবং সত্যিকার বয়স যদি সমান সমান হয় তবে গড় আইকিউ হয় ১০০। মনের বয়স যখন সত্যিকার বয়স থেকে বেশি হয় তখন আইকিউ-এর গড় একশোর উপরে চলে যায়। আবার যখন মনের বয়স সত্যিকার বয়স থেকে কম থাকে তখন আইকিউও গড়মান থেকে কমে আসে।

বলা হয়ে থাকে ১৫ বৎসরের পর আইকিউ আর বাড়ে না (Fish)। ১৫-৩৫ বৎসর পর্যন্ত স্থিতি থাকে, সহজে এ সময় পরিবর্তিত হয় না আইকিউ। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশেরই আইকিউ থাকে ৭০–১৩০ এর মধ্যে। যাদের আইকিউ ১৩০-এর উর্ধ্বে তাদের বলা হয় সুপার জিনিয়াস বা intellectually gifted বা আশির্বাদপুষ্ট বুদ্ধিমান। এরা অবশ্যই প্রতিভাবান, চারপাশের অপর দশজন থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

সুপার জিনিয়াসদের নিয়ে প্রচলিত আচে নানাধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস। মনে করা হয়, এদের শরীর হয় ক্ষীণকায়, সমাজের অন্যদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে পারে না, পাগলাটে ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যাপারটি আসলেই উল্টো।

গবেষণায় দেখা গেছে, দৈহিক দিক থেকে সুপার জিনিয়াসরা অনেক বেশি সুস্থ-সবল, স্মার্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এরা শিক্ষা, সামাজিকতা এবং আর্থিক দিক থেকেও সফল। নানা আঙ্গিক থেকে সুপার জিনিয়াসরা সমৃদ্ধ। যাদের আইকিউ বেশি, দ্রুততার সঙ্গেই তারা সঠিক সমাধান টানতে পারেন, যে-কোনো সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সহজ। সমাধান পেতে তাই অসুবিধে হয় না।

আইকিউ-এর মানের ওপর ভিত্তি করে টারমান ও মেরিল বুদ্ধির নিম্নোক্ত ধাপগুলো নির্দিষ্ট করেছেন ঃ

আইকিউ মান		বুদ্ধির অবস্থা
❑ ১৩০ ও উর্ধ্বে	→	সুপার জিনিয়াস বা আশির্বাদ পুষ্ট প্রতিভা
❑ ১২০—১২৯	→	বিশেষ উজ্জ্বল বুদ্ধি
❑ ১১১—১১৯	→	স্বাভাবিকের চেয়ে উজ্জ্বল বুদ্ধি।
❑ ৯০— ১১০	→	স্বাভবিক বুদ্ধি
❑ ৮০—৮৯	→	অল্প বুদ্ধি
❑ ৭০—৭৯	→	সীমারেখা সম্পন্ন বুদ্ধি
❑ ৭০ এর নিচে	→	মানসিক প্রতিবন্ধি।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, জনসংখ্যার ২.৫%-এর আইকিউ ৭০-এর কম। এখানে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, মানসিক প্রতিবন্ধী মানেই মানসিক রোগ নয়। তবে দেখা গেছে, যাদের আইকিউ ৫০-এর কম তাদের কয়েক ধরনের মানসিক সমস্যা বেশি দেখা যায় ঃ যেমন,

- অতিরিক্ত চঞ্চলতা
- অটিজম
- নিজেকে ক্ষতি করার প্রবণতা
- মৃগীরোগ ইত্যাদি।

ব্রেইন বা মস্তিষ্কে রয়েছে দুটি বলয় বা গোলার্ধ। বলয় দুটি একে অপরের সঙ্গে করপাস ক্যালোসাম দ্বারা সংযুক্ত। প্রতিটি বলয়ে রয়েছে কয়েকটি লোব ঃ যেমন, ফ্রন্টাল প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, লিম্বিক ও ইনসুলার লোব। এগুলোর মধ্যে ফ্রন্টাল লোবের সামনের অংশ ও লিম্বিক লোব বুদ্ধি, বিবেচনা ও স্মৃতিশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ব্রেইনের বাইরের 'সারফেস' থাকে কোঁচকানো, ভাঁজ করা। এগুলোকে বলে জাইরাই। জাইরাই-এর কারণে ব্রেইনের আয়তন দৃশ্যমান আয়তনের চেয়ে অনেক বেশি। এই স্তর গ্রে ম্যাটার দ্বারা গঠিত। মানুষের গ্রে ম্যাটার প্রায় ২-৪ মিলিমিটার পুরু। আর ব্রেইনের ভেতরে অংশ হোয়াইট ম্যাটার দ্বারা গঠিত। গ্রে ম্যাটার স্নায়ুকোষ (নিউরন) এর মূল অংশ তথা সেলবডি দ্বারা গঠিত। গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে গ্রেম্যাটার বা ভাঁজ করা জাইরাই-এর পরিমাণ যতোবেশি থাকে, আইকিউ হয় ততোবেশি। এতো বেশি পুরু গ্রে ম্যাটার আর কোনো প্রাণীর মাঝে দেখা যায় না।

এছাড়া মানুষের ফ্রন্টাল লোব অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এটিই বুদ্ধির লোব হিসাবে পরিচিত। একারণে মানব জাতি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে পৃথিবী নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মানব মস্তিষ্কে রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন নিউরন। প্রতিদিন প্রায় ২৫ লক্ষ নিউরন ক্ষয় হয়। মানুষের জন্মের পর নতুন কোনো নিউরন সৃষ্টি হয় না। তবে নতুন স্নায়ুসন্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে স্নায়ুকোষ সমৃদ্ধ হয়, মানুষের চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধি অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমে পরিপুষ্ট হতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের মন লুকিয়ে আছে মস্তিষ্কের নিউরনের গহীনে। স্নায়ুতন্ত্রের অংকুরোদগমের মধ্যদিয়ে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ শুরু হয়। দেহের অন্যান্য অংশের চেয়ে মস্তিষ্ক দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করে। প্রথম দুই বছরের মধ্যেই পরিণত হয়ে যায়। গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, স্নায়ুকোষগুলো ১২০ বৎসর বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু খুব কম সংখ্যকই এতোগুলো বছর টিকে থাকতে পারে। নানা কারণে স্নায়ুকোষ ক্ষয় হয়, বার্ধক্য চলে আসে। জাইরাই-এর পরিমাণ কমে গেলে বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে।

বুদ্ধি কি ধারালো করা যায় ?

❑ বুদ্ধি ধারালো করা যায়, বুদ্ধির ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে। একই সঙ্গে প্রয়োজন রয়েছে সুস্থদেহ ও পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধ। পুষ্টিহীন ব্রেইনে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

❑ বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন, মস্তিষ্ক সচল ও সুস্থ রাখতে প্রয়োজন প্রতি মিনিটে প্রতি একশো গ্রাম ব্রেইন টিস্যুতে পঞ্চান্ন মিলিলিটার রক্ত, পাঁচ দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ এবং তিন দশমিক পাঁচ মিলিলিটার অক্সিজেন পরিবহণ। সুতরাং ব্রেইনে রক্ত প্রবাহ ও অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে হলে দৈহিক ব্যায়ামের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিদিন ভোর বেলায় খোলা আকাশে বিশুদ্ধ বাতাসে কমপক্ষে আধাঘন্টা হাঁটার অভ্যাস করা উচিত। এভাবে হাঁটার মাধ্যমে ব্রেইনে অক্সিজেনের প্রবাহ সঠিক রাখা সহজ হয়।

❑ রক্তের লোহিত কণিকা দেহের বিভিন্ন অংশে কোষে কোষে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়।

যারা রক্তশূন্যতা রোগে ভোগে তাদের রক্তে লৌহের পরিমাণ কম থাকে। লোহিত কণিকা তখন অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা হারাতে থাকে।ফলে বুদ্ধির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে আসে।

রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত শিশুরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, নতুন তথ্য শিখতে পারে না। আমাদের দেশে শিশুদের রক্তশূন্যতার সাধারণ একটি কারণ হলো কৃমি। খুব সহজে এর চিকিৎসা সম্ভব। শিশুর রক্ত শুন্যতারোধ করার এটি একটি উপায়। সুতরাং স্কুল হেলথ ইস্যুতে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ যেন সাধারণ একটি কারণে বিপদগ্রস্ত না হয়, খেয়াল রাখতে হবে।

❑ বুদ্ধি বিকাশের জন্য বংশগত প্রাপ্ত জিনের বৈশিষ্ট্যই সব নয়। পরিবেশের গুরুত্বও অপরিসীম। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশুর বুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয়। বিষয়টি পরে বিস্তারিত আলাপ করা হয়েছে।

❑ আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে আয়োডিনের ঘাটতি। আয়োডিনের অভাবে শিশুর বুদ্ধিদীপ্তি হ্রাস পায়। ফলে আইকিউ কমে যায়। মানসিক প্রতিবন্ধীত্বের একটি বড়ো কারণ আয়োডিনের অভাব। এই অভাবটিও সহজে মোকাবেলা করা যায়।

অযত্ন অবহেলায় যেন কোনো শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে না যায়, সতর্ক থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

বৃটেনের মনোগবেষক রাটারের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পরিবেশের কারণে শিশুর আইকিউ ২০ পর্যন্ত ওটা-নামা করতে পারে। তাই সুন্দর পরিবেশ নির্মাণের জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

❑ বুদ্ধিদীপ্ত কাজের জন্য নিয়মিত ভালো ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। ভালো ঘুম হলে দেহ মন সুস্থ থাকে। কাজে উদ্যম জাগে।

ভালো ঘুমের জন্য সুষনি শাক খাওয়া যেতে পারে। এ শাকে রয়েছে স্নিগ্ধ ও নিদ্রাকর উপাদান। অনেকে মনে করেন, বাহ্মী শাকের রসও বুদ্ধিদীপ্তি বাড়িয়ে থাকে।

❑ প্রতিটি কাজে মনোযোগ থাকতে হবে। চোখকান খোলা রেখে যা শেখা হয়, তার স্থায়িত্ব ততোবেশি। চিন্তা-চেতনা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তখন বেড়ে যায়। ব্রেইন ম্যাটারের অ্যাসোসিয়েশন ফাইবারের রিফ্লেক্স ক্ষমতা ধারালো করা যায় এভাবে। ফলে বুদ্ধির ধার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

শিশুর বুদ্ধির বিকাশ

মন ও বোধের বিকাশই বুদ্ধি বিকাশের মূল স্তম্ভ। মন হচ্ছে ব্রেনেরই অংশ যা চিন্তা চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটির মাধ্যমেই আমরা কোনো কিছু শনাক্ত করতে পারি, জানতে এবং বুঝতে পারি জিনিসটি কী। যে-কোনো ঘটনা প্রবাহের পেছনের অন্তর্নিহিত কারণও উদঘাটন করতে পারি বুদ্ধির মাধ্যমে।

জন্মের পরপরই শিশুর মনটিও সক্রিয় হয়। শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মনও বিকশিত হতে শুরু করে। কারণ তখন সে–

১। মানুষ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে।

২। বস্তু সম্পর্কে শেখে।

৩। নতুন কৌশল আয়ত্তে আনে। দক্ষতা বাড়ে।

৪। পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করে।

৫। অনেক তথ্য, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে।

মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি ক্রমশ ধীশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। সে কতটুকু বুদ্ধির অধিকারী হবে, তা নির্ভর করে দুটো প্রধান বিষয়ের ওপরঃ

জিন (Genes) ঃ জিন প্রকৃতি প্রদত্ত ধীশক্তির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিবেশঃ শিশুটি কীভাবে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে নিজেকে ধাবিত করছে, কীভাবে ধীশক্তির বিকাশ সাধিত হবে, মূলত এসব কিছুই নির্ভর করছে তার চারপাশের পরিবেশের ওপর।

পুরো শৈশবকালে জিন এবং পরিবেশের ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপরই মনের নানা ধারার উত্তরণ ঘটে। তাই কেবল জন্মগতভাবে প্রাপ্ত জিনের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, শিশুর বুদ্ধি বিকাশের জন্য পরিবেশের গুরুত্বও কম নয়। ঐশ্বর্যময় পরিবেশই নিশ্চিত করতে পারে শিশুটির জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যৎ।

বুদ্ধিশক্তি বিকাশে কীভাবে শিশুকে উৎসাহিত করা যায়?

প্রথম বৎসরে শিশুটির মনের বিকাশের জন্য নানাভাবে সহায়তা করা যায়। যদি মা-বাবা ঃ

১। শিশুটির সঙ্গে কথা বিনিময় করার চেষ্টা করেন।

২। শিশুটির সঙ্গে খেলাধুলায় শরিক হন।

৩। এমন একটি স্থানে শিশুকে রাখেন যার পাশে কী ঘটছে না ঘটছে তিনি দেখতে পান। এতে শিশুর আস্থা বাড়ে।

৪। খেলনা এবং কৌতূহলোদ্দীপক কোনো কিছু শিশুকে দেওয়া উচিত যা শিশু নেড়েচেড়ে দেখতে পারে, খুলতে পারে।

৫। তাকে নতুন কৌশল শিখতে দেওয়া উচিত। যেমন, নিজ হাতে খেতে দেওয়া, ইত্যাদি।

প্রথম বৎসরের পর মনের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে যদি শিশুকে নিচের কাজগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়ঃ

১। কথা বলতে দেওয়া।

২। নতুন কৌশল, যেমন নিজের পোশাক পরতে দেওয়া, ছবি আঁকার চর্চায় শিশুকে নিয়োজিত রাখা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইচ্ছেটি জাগিয়ে রাখার কৌশল নির্ধারণ করা।

৩। জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা।

৪। নতুন নতুন স্থানে শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

৫। এমন খেলনা সরবরাহ করা যা তার চিন্তা শক্তিকে স্পন্দিত করে।

৬। সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দেওয়া।

৭। পড়তে উৎসাহিত করে তোলা।

বুদ্ধি বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

চারপাশের নানা বিষয় এবং উদ্দীপক বস্তু থেকে তথ্য আহরণ করে নবজাতকটি ধীরে ধীরে পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন হতে থাকে। সাধারণত শিশুরা নতুন কিছুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে, মেধার অদৃশ্য সুতোটিকে গভীরভাবে জড়াতে চায়। এই প্রবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবিকাশের সাবলীল ধারাটির সূচনা হয়। নতুন উদ্দীপক বস্তু আবিষ্কার কিংবা পরিচিত হওয়ার পথে যেন কোনোক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়– সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।

তিন মাস পর থেকেই শিশুটি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোটখাট বস্তু স্পর্শ করতে চায়, নাড়াচাড়া করে মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে। আসলে তারা বস্তুর আকার, আকৃতি, ধরন বুঝে নতুন তথ্য শেখা শুরু করে। বুঝতে পারে বস্তুটি কেমন, কী ধরনের দেখতে, কিংবা ছুঁড়ে দিলে কী ধরনের শব্দ হয় ইত্যাদি। নতুন নতুন বস্তু থেকে এভাবেই শিশুটি প্রতিনিয়ত শিখতে থাকে, মেধার ভান্ডারটি পূর্ণ করে তোলে।

যখন চলাফেরা কিংবা কথা বলতে শেখে তখন নতুন কিছু অথবা নতুন জায়গা সম্পর্কে বার বার জানতে চাইবে, নতুন স্থানে যেতে চাইবে। আগ্রহ সৃষ্টিকারী পরিবেশের

ব্যাপারে বার বার খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে। বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। তার জানার নেশাটি তীব্র করে তোলাই শ্রেয়। শিশুর তথ্য ভান্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুলুন। তার বুদ্ধি বিকাশের চাবিটি আপনার হাতে।

মনে করুন সন্তান নিয়ে 'শিশু পার্কে' গেছেন। উড়ন্ত যানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কৌশলে সংখ্যা সম্পর্কে তাকে দক্ষ করে তোলা যায়।

প্রশ্ন করুন, বলতো মা কটি উড়ন্ত যান আছে সামনে?

সে গুণতে থাকবে। যদি গুণতে সফল হয়, তবে আবার প্রশ্ন করুন, কটি লাল রঙের? ক'টি হলুদ কিংবা নীল রঙের?

অথবা মনে করুন ফুল বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছের ফুলগুলো গুণতে বলুন। এক, দুই, তিন থেকে দশ পর্যন্ত গোনা হলে, উল্টো দিক থেকে গুণতে বলুন-দশ নয় আট এভাবে।

পুরো ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে বলা যাবে, শিশুটি রঙ এবং সংখ্যা সম্বন্ধে পারদর্শী হয়ে উঠবে, তার মনোসংযোগ বাড়বে, শেখার প্রতি উদ্দীপনা জাগবে। মেধা হবে ক্ষুরধার, স্মৃতি হবে স্থায়ী।

এভাবে বিভিন্ন খেলাচ্ছলেও তাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়।

দেখবেন আড়াই বৎসর বয়স থেকে শিশুটি প্রশ্ন করা শুরু করেছে, 'কি' 'কে'।

তিন বৎসর বয়সে জানতে চাইবে, 'কোথায়'।

চার বৎসরে প্রশ্ন করবে, 'কেন' কখন' 'কীভাবে'।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ সম্বন্ধে তাদের জানার পরিধিও বাড়বে, বাড়তে থাকবে লাগাতার প্রশ্নের ধারা।

এক সময় এমন একটি বয়সে পৌঁছে যাবে যখন কখনো দেখেনি এমন মানুষ কিংবা জায়গা সম্বন্ধে বুঝতে পারবে। অতীতে কী ঘটেছিল, ভবিষ্যতে কী ঘটবে ইত্যাকার বিষয়ে ধারণা করতে পারবে নিজস্ব বোধশক্তি উত্তরণের কারণে।

সন্তানকে জ্ঞান এবং বোধশক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী করতে চান?

একটি বই তার হাতে তুলে দিন। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিন।

ছবির বই দিলে ছবির অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিয়ে বলুন।

গল্প শোনাতে পারেন শিশুটিকে। প্রায় আমরা গল্প বলি। কিন্তু তার attention & concentration আছে কিনা খেয়াল করি না। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুটিকে সচেতনভাবে সুস্থির মনোযোগের মাধ্যমে কিছু শেখানো গেলে, তার স্মৃতিশক্তির ভিত্ হবে মজবুত, অবশ্যই সে ব্রিলিয়ান্ট হতে বাধ্য।

অনেক সময় বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে শিশুটির মনের চাহিদা থমকে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত।

বুদ্ধি বিকাশে যা অন্তরায় সৃষ্টি করে

১। কথা বলা এবং খেলাধুলার পর্যন্ত সুযোগ না পাওয়া।

২। নতুন কিছু করার ব্যাপারে বাধার সম্মুখীন হওয়া বা উৎসাহ হারিয়ে ফেলা।

৩। যদি অবিরাম শিশুটির খুঁত ধরা হয়, বকাঝাকা করা হয়।

৪। কানে না শোনা।

৫। ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া।

৬। স্কুলে অনিয়মিত বা প্রায় অনুপস্থিত থাকা।

আমরা সবাই চাই শিশুটি সুস্থ থাকুক, নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠুক। চাই শিশুটি ধীশক্তি সম্পন্ন হোক।

সব চাওয়ার সফল রূপায়নের জন্য শিশুর চারপাশের প্রতি নজর রাখতে হবে বেশি।

নিত্যনৈমেত্তিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে আমরা পারি শিশুটিকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে।

দ্বন্দ্ব হতাশার ভিতর বাহির কীভাবে এড়াবেন মানসিক চাপ

মানুষের মনের চেয়ে বিচিত্র জিনিস আর দ্বিতীয়টি নেই।

চারপাশের নানা ঘটনা প্রথমেই আলোড়িত হয় তার মনে।

আনন্দের খবর বা ব্যক্তি সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয় মন, আবার দুঃখের ঘটনা বা ব্যর্থতায় হয় ক্ষত-বিক্ষত। সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ। এই চাপ এড়ানোর কোনো উপায় নেই। মানুষের যেহেতু মন আছে, মানসিক চাপ থাকবেই। চেষ্টা কেবল সহজে মানসিক চাপ মোকাবেলার। অর্থাৎ কত সহজে কত কম সময়ে মুক্তি পাওয়া যায় মানসিক চাপ থেকে?

মনোগবেষকরা এ নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন। কেননা কখনো তা শারীরিক বিপর্যয় ঘটিয়ে মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিককালে মানুষের বুদ্ধি যেমন বেড়েছে, তেমন বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবনও হয়ে পড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। যে কারণে মানসিক চাপও বেড়েছে বহুগুণ। আর তাই এ বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এখন। উপায় খোঁজা হচ্ছে মানসিক চাপ থেকে মুক্তির।

মন থাকে কোথায়?

মনের অবস্থান কোথায়? মানুষের শরীরের কোন অংশে লুকিয়ে থেকে মানব জীবনে এত জটিলতার সৃষ্টি করে? এমন প্রশ্ন করা হলে যে-কেউ চট করে উত্তর দেবেন, মন লুকিয়ে থাকে হৃৎপিণ্ডের মাঝে। মন বোঝাতে তো মানুষ পান পাতার মতো দেখতে হৃৎপিণ্ডের ছবিটাই আঁকে?

আসলে কি তাই?

মানুষের মনের অবস্থান যে হৃৎপিণ্ডে নয় তা অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। যাকে আমরা মন বলছি তা আসলে স্নায়বিক কার্যকলাপ, নার্ভাস অ্যাকশনের শাব্দিক রূপ মাত্র। যার উৎস হলো মস্তিষ্ক বা মগজে। এই মগজে রয়েছে নানা ভাগ-

সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, ব্রেইনস্টোম ইত্যাদি। মস্তিষ্কের বাইরের স্তরে থাকে গ্রে-ম্যাটার, ওয়াইট ম্যাটার আছে ভেতরে। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় গ্রে-ম্যাটার থাকে ভেতরে। এই গ্রে-ম্যাটার যেখানে আছে সেখানে নিউরোনের সেলবডির প্রাধান্য বেশি। আর সেরিব্রাম হচ্ছে মস্তিষ্কের সবচে' বড় অংশ যার সঙ্গে রয়েছে আবেগের সম্পর্ক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেরিবেলাম।

সেরিব্রাম-এর ভেতরে, কিছুটা নিচের দিকে লিম্বিক সিস্টেম বলে একটা অংশ আছে (অবশ্য বাইরেও এই লিম্বিক সিস্টেম কিছুটা আছে)। এই লিম্বিক সিস্টেমই আবেগের উৎস। তবে লিম্বিক সিস্টেমই সব আবেগের উৎস নয়, এখানে সেরিব্রাল কর্টেক্স-এর ভূমিকাও থাকে কিছু। যেমন কাউকে দেখে (পুরুষ অথবা নারী) হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হওয়া, এই আবেগের উৎস সেরিব্রাল কর্টেক্স।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এতদিন মানুষ যা জেনে এসেছে, মনের অবস্থান হৃৎপিণ্ডে, তা কি পুরোপুরি মিথ্যে? একেবারে কল্পনা প্রসূত? কেন মানুষ মনের অবস্থান হৃৎপিণ্ডে ধরে নিলো? এর খানিকটা ব্যাখ্যা এভাবে দাঁড় করিয়েছেন গবেষকরা। মনের সমার্থক শব্দ হলো 'হৃদয়'। এই 'হৃদয়' শব্দটির উৎপত্তি হৃৎপিণ্ড থেকে। মানুষের শরীরের হৃদপিণ্ডের কাজ গ্রহণ এবং বর্জন। সারা শরীরের দূষিত রক্ত যেমন হৃৎপিণ্ডে শিরার মাধ্যমে গৃহীত হয়, তেমনি বিশুদ্ধ করণের পর তা আবার ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এ অবস্থাকে বর্জন বলা যায়। হৃদয়ের ভূমিকাতে আছে এই গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি। যা গ্রহণযোগ্য তা আনন্দের কারণ হয়, যা অনাকাঙ্ক্ষিত তা বর্জনীয়। হয়তো সে কারণেই মানুষ হৃদপিণ্ডের মধ্যে মনের অস্তিত্ব খুঁজেছিল। তাছাড়া কোনো আনন্দ, বেদনা ভয়ের কথায় হৃৎপিণ্ডই প্রথম হাতুড়ি পিটিয়ে জানিয়ে দেয়। অর্থাৎ সব অনুভূতির প্রতিফলন হৃদপিণ্ডেই ঘটে। যে কারণে সাধারণ মানুষ মনের অবস্থান হৃৎপিণ্ডের মাঝে ধরে নিয়েছে।

মানসিক চাপের কারণ

পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনার প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। এর কারণ মানুষ অনুভূতিপ্রবণ। যে যেমন স্পর্শ টের পায়, শ্রবণ বা দর্শনেও তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ স্নায়ু সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্নায়ুর এই ক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে স্নায়ু চাপ। নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে এই চাপের সৃষ্টি হতে পারে। যার পরিমাণ তীব্র হলে মানসিক বিপর্যয়, যেমন মস্তিষ্ক বিকৃতি, আচরণে অসংলগ্নতা দেখা দেয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলে জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

প্রতিটি মানুষ নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় বেড়ে ওঠে। এই চিন্তা-চেতনার বিরাট প্রভাব থাকে পারিবারিক, কিছুটা পারিপার্শ্বিক (কখনো বা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব প্রবল থাকে)। এর বিপরীত কিছু যদি তার অস্তিত্বে, পছন্দে, আবেগে বা মর্যাদায় আঘাত হানে, তা থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই দ্বন্দ্বকে চার ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব, বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব, দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব।

আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব

এ ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় দু'টি বা তার বেশি আরাধ্য লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে। প্রাপ্তি বা দখলের ইচ্ছে যেখানে সবগুলো কিন্তু একটির বেশি কোনোভাবেই লাভ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ একটি পেলে দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি পাওয়া যাবে না। ফলে কোন প্রাপ্তি তার জন্য আনন্দের বা লাভজনক হবে তার ভাবনাটা তাকে বিচলিত করে।

যেমন ধরা যাক, অনেক চেষ্টার পর বেকার আলমগীর আমেরিকা যাবার ভিসা পেয়েছে। সে আনন্দের এই খবরটি দেয়ার জন্য তার প্রেমিকা স্বপ্নার কাছে গেল। প্রায় পাঁচ বছরের প্রেম দু'জনের মধ্যে। স্বপ্নাকে ছাড়া সে দ্বিতীয় কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না। তার খুশির খবর শুনে স্বপ্নার চেহারায় গভীর বিষণ্নতা ফুটে উঠলো। দুঃখী গলায় স্বপ্না বললো, 'তুমি চলে গেলে আমি থাকবো কী করে?'

প্রেমিকার এই আর্তস্বরে মুহূর্তেই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল আলমগীর। সে কোনটা রক্ষা করবে ? আমেরিকা যাওয়ার দুর্লভ সুযোগটি সে যেমন হারাতে চায় না, তেমনি স্বপ্নাকেও। বেড়ে যায় মানসিক চাপ। এই ধরনের দ্বন্দ্বকে বলা হয় আকর্ষণ-আকর্ষণ দ্বন্দ্ব। ইংরেজিতে অ্যাপ্রোচ-অ্যাপোচ কনফ্লিক্ট অথবা অনেকদিন বেকার থাকার পর দু'টো চাকরি এক সঙ্গে পেয়ে যাওয়া, দু'টোর গুরুত্বই সমান অথবা পরীক্ষার একই নম্বরে 'ক' বা 'খ' প্রশ্ন, দুটোই কমন, সমান নম্বর, কোনোটার উত্তর দিলে একটু বেশি নম্বর পাওয়া যাবে– এ নিয়ে শুরু হয় মনের সঙ্গে যুদ্ধ। যা একধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাধারণত তৃতীয় জনের কাছে যাওয়া বা উপদেশ গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে। অথবা একাধিক জনকে জিজ্ঞেস করে বা আলোচনার ভিত্তিতে লাভজনক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার প্রবণতা জাগে। কিন্তু তারপরও মনের ভেতর আক্ষেপ থেকে যায় দ্বিতীয় বস্তুটি না পাওয়ার। যা থেকে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।

বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব

এ ক্ষেত্রেও দু'টি বস্তু বা লক্ষ্যমাত্রা সামনে থাকবে কিন্তু কোনোটাই কাঙ্ক্ষিত বা পছন্দের নয় অথচ যে-কোনো একটাকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। যাকে বলা হয় বিকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব বা অ্যাভয়ডেন্স-অ্যাভয়ডেন্স কনফ্লিক্ট। এখানেও প্রশ্ন ওঠে, কোনটি বেছে নেবে সে? কোনটি বেছে নিলে তুলনামূলক ক্ষতির সম্ভাবনা কম বা সামান্যতম মানসিক তৃপ্তি আসবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি প্রায়ই হতে হয়। যা তীব্র মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়া বা নির্বিকার ভূমিকা পালনের প্রবণতা জাগে মানুষের মধ্যে। কাজের ক্ষেত্রে অলসতা বা ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যাকে বলে ফিজিওলোজিক্যাল উইথড্রয়াল।

আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব

একই সঙ্গে কাউকে ভালোবাসা এবং ঘৃণা করাও এক ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যে দ্বন্দ্বকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব বা অ্যাপ্রোচ-অ্যাভয়ডেন্স কনফ্লিক্ট বলে। যেমন একই মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য ভালো আবার অন্যটি খারাপ। বন্ধুত্ব বা প্রেমের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিপরীতমুখি বিষয় একই জনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে সম্পর্ক রাখা না রাখা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যা থেকেও সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ।

যেমন ধরা যাক, সাদিক এবং রাতুল দুই বন্ধু, ছেলেবেলা থেকেই একই মহল্লায় বড় হয়েছে। সাদিক লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু রাতুল সামাজিক অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়েছে। নেশায় আসক্ত। সন্ত্রাসী। সাদিক তার সবই জানে। কিন্তু বন্ধু হিসেবে রাতুল ভালো। তারপরও তার সঙ্গে চলাফেরা নিয়ে সাদিকের সংশয় জাগে। কেননা, তার সঙ্গে চলাফেরা মানেই যে-কোনো পুলিশি ঝামেলায় পড়া অথচ বন্ধু হিসেবে রাতুল যথেষ্ট ভালো। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করে। রাতুলের কারণ তার বোন রুমকীকে চলাফেলায় কোনো অমর্যাদার শিকার হতে হয় না, যা রাতুলের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ঘটতে পারে। যে কারণে সাদিক ছাড়তে পারে না রাতুলকে। আবার তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেও ভয় হয়। ফলে সব সময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয় তাকে। প্রতিনিয়ত এই মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে সে।

দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব

ধরা যাক, এ ঘটনার নায়ক শুভ্র। সে ছাত্র। সামনে পরীক্ষা। এই সময় সে জানলো তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু দল বেঁধে সেন্টমার্টিন যাচ্ছে। শুভ্রর ও মন টানে সেন্টমার্টিন যেতে। কিন্তু পরীক্ষার কথা মনে হতেই দুশ্চিন্তা বাড়ে। কেননা তার প্রতিদ্বন্দ্বী অনল। সে শুভ্রকে ক্লাশে অতিক্রম করার জন্যই খুব পড়াশোনা করছে। শুভ্রর চিন্তা, এই সময় বেড়াতে গিয়ে সময় নষ্ট করলে যদি পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হয়! তাই সে বেড়ানোর প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়। কিন্তু তাতে কি তার পড়ায় মন বসে? বন্ধুদের সেন্টমার্টিনে গিয়ে আনন্দের কথা বার বার মনে পড়ে। যে পড়ার কারণে সেন্টমার্টিন গেল না সে, সেই পড়াতেই তো মন বসছে না। এখন উপায়?

শুরু হয় মানসিক চাপ। এই ধরনের মানসিক চাপ যে দ্বন্দ্ব থেকে তৈরি হয় তাকে দ্বৈত আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা ডাবল অ্যাপ্রোচ-অ্যাভয়ডেন্স কনফ্লিক্ট বলে। অর্থাৎ যে প্রাপ্তির আশায় অন্য একটি জিনিস ত্যাগ করা হলো কিন্তু সেই প্রাপ্তি ঘটলো না। এমন ঘটনা কি অহরহ ঘটে না? উল্লিখিত ঘটনাগুলো থেকেই যে কেবল মানসিক চাপের সৃষ্টি হবে তা নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা যার সঙ্গে নিজে সম্পৃক্ত না থাকলেও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের মানসিক চাপের শিকার হতে হয়। সারাদেশে সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে? ঘরের একজন সদস্য বাইরে বেরুলেই তো গোটা বাড়ির সদস্যদের বাড়তি মানসিক চাপ শুরু হয় সে ঠিকমতো ঘরে ফিরবে কিনা? আকস্মিক কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পড়ে অকালে সে প্রাণ হারাবে কিনা? অথবা ঘাতক ট্রাকের নিচে পিষ্ট হবে কিনা? বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন তাদের মধ্যে তো এই উদ্বেগ সব সময়ই কাজ করে, আগামী কাল তার হাতে টার্মিনেশন লেটার ধরিয়ে দেবে কিনা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। চাকরি চলে গেলে সংসার চলবে কীভাবে? মানসিক চাপ শুরু হয় ঘরে মেয়ে বড় হতে শুরু করলেও। তাকে উপযুক্ত ছেলের হাতে সমর্পণের ভাবনা তো বোঝার মতো চেপে থাকে মাথায়। দুশ্চিন্তা ছেলেকে নিয়ে, বেকারত্বের যন্ত্রণায় সে নেশাগ্রস্থ হচ্ছে কিনা।

নিরন্তর মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয় কর্মক্ষেত্রেও। প্রোমোশন আটকে যাওয়া, নিরলস কাজ করেও বসের মন না পাওয়া, অথবা হঠাৎ করে অনেক দূরে বদলি করে দেয়া।

ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা যাদের স্বভাবের অন্যতম দিক মানসিক চাপ তাদের নিত্য সঙ্গী। সাধ যাদের সাধ্যের বাইরে থাকে চিরজীবন তাদের বসবাস করতে হয় হতাশার অন্ধকারে, যে হতাশা থেকে সৃষ্টি হয় তীব্র মানসিক চাপ।

হতাশার কারণ আবার দু'টি– বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। কোনো কাজে ব্যর্থ হওয়া বা লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারা অথবা কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছেটি পূরণ না হওয়া থেকে যে হতাশার জন্ম তা বাহ্যিক, আর শারীরিক ত্রুটি, যেমন প্যারালাইসিস, অন্ধত্ব, বধিরতা, বিকলাঙ্গতা অথবা অন্তর্গত সমস্যা থেকে যে হতাশার জন্ম তা হলো অভ্যন্তরীণ। দু'ধরনের হতাশাই মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।

মানসিক চাপের পরিণতি

আমাদের স্বাভাবিক চিন্তায় দীর্ঘকাল ধরে যে কথাটি জেনে এসেছি, মনের গতিবিধির ওপর মানুষের আচরণ নির্ভর করে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে, বিজ্ঞানের ভাষা এখানে আলাদা। ব্যাখ্যা ভিন্ন। বিজ্ঞানের ভাষায়, মানুষের আবেগ, অনুভূতি, উত্তেজনা, ক্ষোভ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে স্নায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে। এই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে বলা হয় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম। এটি মস্তিষ্কের যে জায়গায় উদ্দীপ্ত হয় তাকে বলা হয় লিম্বিক সিস্টেম। এই লিম্বিক সিস্টেমের নির্দেশেই হৃদপিণ্ড তথা অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়া চলে। এই সিস্টেম কেবল একটি গ্রন্থি নয়, অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ তৈরি করে। আগে শুধুমাত্র হাইপোথ্যালামাসকেই লিম্বিক সিস্টেমের একমাত্র নির্দেশক ধরা হতো, এখন এ ধারণার বদল ঘটেছে। হাইপোথ্যালামাস ছাড়াও আরো ছোট ছোট অংশ এক সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। লিম্বিক সিস্টেম আবেগ, আশা, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি অনুভূতির ধারক এবং সঞ্চারক। যেহেতু পুরো বিষয়টি স্নায়ু বাহিত এবং নিয়ন্ত্রিত কাজেই এর সঙ্গে হৃদপিণ্ডের যোগাযোগ তো রয়েছেই। যে কারণে ভয় পেলে, দুশ্চিন্তায় হৃদপিণ্ডের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। হার্ট বিট বেড়ে যায়। সাধারণ কথায় যাকে বলে বুক ধড়ফড় করা। একটানা উদ্বেগ বা উত্তেজনায় থাকলে হৃদযন্ত্রের ওপর বাড়তি যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে এর ভেতরকার রক্ত সঞ্চালনের হার স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেকখানি বেড়ে যায়। অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের কাজ বেড়ে যায়। আর হৃদযন্ত্রের কাজ বেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এর ভেতর অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। এ চাহিদা মেটাতে না পারলেই হৃদপিণ্ডের সমস্যা দেখা দেয়। হৃদপিণ্ডের পেশী এবং ধমনী ধীরে ধীরে পুরু হতে থাকে। এটা ক্রমাগত চলতে থাকলে হার্টফেলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অর্থাৎ জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মানসিক চাপের পরিণাম কখনো কখনো বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ পায়। যেমন চিৎকার

চেঁচামেচি করা, অসংলগ্ন আচরণ, খিটখিটে মেজাজ, হননেচ্ছা, প্রতিশোধপ্রবণতা ইত্যাদি। এটি তখনি ঘটে যখন অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ যখন কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাপ্তির চরম নেশা থেকে এ ধরনের অভিব্যক্তির জন্ম হয়। প্রেমে ব্যর্থ হলে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কখনো কখনো, অনেকে তীব্র মানসিক চাপের কারণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। হয় সে প্রেমিকার কোনো ক্ষতি সাধনের (পুরুষের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে) মাধ্যমে নিজের ক্ষোভের নিষ্পত্তি ঘটাতে চায়, নয় তো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় (যদি খুন বা ক্ষতি সাধনের সাহস বা শক্তি না থাকে)। কোনো পরিণতিই সুস্থ মানুষের কাম্য নয়। বৈষয়িক দ্বন্দ্ব থেকেও সৃষ্ট মানসিক চাপ কখনো কখনো মানুষকে সহিংস করে তোলে। কাজের লোড নিদ্রাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারো কারো ক্ষেত্রে। অস্থিরতা বাড়ে। নার্ভাস সিস্টেমের অনুভাবক বা সেনসরি অংশের গুরুত্বহীন উত্তেজনা কখনো কখনো বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। মূলতঃ অপ্রাপ্তির আক্ষেপ থেকেই এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। শরীরের কারণে যেমন মনের অসুখ হয়, মনের কারণেও শরীরের অসুখ হয়। মন ও শরীরের অসুখ তাই গলায় গলায় বিস্তার লাভ করছে মানুষের জীবনে। আর এই অসুখের নাম সাইকোসোম্যাটিক বা সোমাটোফর্ম ডিসওর্ডার।

মানসিক চাপ এড়াবেন কীভাবে

জীবনে চাপ আছেই। কাজের চাপ, সময়ের চাপ, দেনার চাপ। আছে ব্যর্থতার যন্ত্রণা। হারানোর কষ্ট। এগুলো মানসিক চাপের কারণ হয়ে ওঠে। এই মানসিক চাপ এড়াবেন কীভাবে?

এ চাপ থেকেই কি আদৌ মুক্তি পাওয়া যায়?
আসলে মানসিক চাপ থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। কাজেই একে মোকাবেলা করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। মানসিক চাপ নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন চাপ মোকাবেলার।
কীভাবে মোকাবেলা করবেন এই মানসিক চাপ ?

সদা হাসি খুশি থাকুন

মানসিক চাপ উপশমে হাসির কোনো জুড়ি নেই। মনোবিজ্ঞানী রবার্ট হোল্ডেনের মতে হাসি পেশীকে শিথিল করে, টেনশন কমায়, রক্তচাপ কমায়, অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। বাড়ায় রক্ত চলাচল। স্ট্রেস হরমোন উৎপাদনও কমায়। প্রাপ্তিতে যেমন আনন্দিত হন, পাশাপাশি মেনে নিন অপ্রাপ্তিকেও। কারণ এক জীবনে সব প্রাপ্তি আসে না। মনকে সতেজ রাখুন অফুরন্ত হাসিতে।

চাহিদা থাকুক সীমার মধ্যে

নিজের উপার্জনের ওপর চাহিদার সীমারেখা টানা জরুরি। সাধ যদি সাধ্যের নাগালের বাইরে থাকে অপ্রাপ্তি হবে নিত্যসঙ্গী। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা থেকে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীরা স্বামীর উপার্জনের বিষয়টি বিবেচনা করুন। এতে আপনার স্বামী যেমন মানসিক চাপ থেকে রেহাই পাবে, আপনার হৃদয়েও থাকবে না অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা। অর্থাৎ সাধ্যের সীমারেখায় সাধকে ধরে রাখুন। মানসিক চাপ থেকে অনেকটা রেহাই পাবেন।

নিজের সদগুণগুলো প্রস্ফুটিত করুন

এমন মানুষ নেই যার মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ নেই। কারো এটি প্রকাশিত থাকে, কারো বা অপ্রকাশিত। আপনার সেই বিশেষ গুণটি আবিষ্কারের চেষ্টা করুন। যদি দেখেন, গানের গলাটি একেবারে মন্দ নয়, সুরের অনুকরণ বেশ করতে পারেন, তবে একটি হারমোনিয়াম নিয়ে শুরু করে দিন চর্চা। সঙ্গীত মানুষের অন্তর্গত যন্ত্রণা উপশমে অনেকখানি সহায়ক। অথবা শিল্পাঙ্গণের অন্যান্য দিকে মনোযোগ বাড়ান। নিজেকে বিকশিত করুন বিশেষ মহিমায়। সৃজনশীল কাজ মনের আনন্দ বাড়ায়। মনে আনে প্রশান্তি।

বর্তমান নিয়ে ভাবুন

মনোবিজ্ঞানী জোয়ান বরিসেঙ্কোর মতে, মানুষের দুশ্চিন্তা মূলতঃ অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে। অথচ অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না, ভবিষ্যতকেও ধরা যায় না । অতএব ভাবুন বর্তমান নিয়ে। বর্তমানে আপনার কর্মই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কাজেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে সেই মোতাবেক কাজ করুন, ভবিষ্যৎ আপনার উজ্জ্বল হবেই।

মেডিটেশন বা প্রার্থনা করুন

বিজ্ঞানীদের মতে প্রার্থনা, ধ্যান বা মেডিটেশন করলে স্ট্রেস হরমোন নরএড্রেনালিন ও এড্রেনালিনের প্রভাব কমে। এতে মানসিক দুশ্চিন্তা হ্রাস পায়।

চাই অবসর

সারাদিনে কাজের ব্যস্ততা কখনো কখনো মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। কীভাবে শেষ করবেন সব কাজ তা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। কাজেই কাজের একটি ছক করে নিন। কাজ করুণ সেই অনুযায়ী। মাঝখানে একটু কাজের ফাঁকে অবসর নিলে অনেকখানি চিন্তা ভারমুক্ত হওয়া যায়।

সহজভাবে দেখুন জীবনকে

জীবনকে সহজ ভাবলে সহজ, জটিল ভাবলে জটিল। প্রতিটি কাজের মধ্যে সুন্দর দিকটা আগে খুঁজুন। তাহলে কাজটি করতে আগ্রহ বোধ করবেন, আনন্দ পাবেন। এতে মানসিক চাপ কম হবে। অনেকের স্বভাবে আছে সব কিছুর মধ্যে নেতিবাচক দিকটি খুঁজে বের করা। অভ্যাসটি ত্যাগ করার চেষ্টা করুন। পৃথিবীটা খুব সুন্দর। অতএব সুন্দরের সন্ধান করুন। পেয়ে যাবেন মধুর সুন্দরের স্বর্ণদ্বার।

ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন

শরীরচর্চায় দুশ্চিন্তা কমে, বিষণ্নতা দূর হয়। ১৬৬৮ সালে ডাঃ কেনেথ কুপার এ তত্ত্ব দিয়েছেন, তিনি এরোবিক ব্যায়ামকে জনপ্রিয় করেছেন। ঘরেই এই ব্যায়াম করতে পারেন। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান ছেড়ে দিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে পারেন। এই ব্যায়ামকেই এরোবিক ব্যায়াম বলে। এতে আপনার মানসিক চাপ কমতে পারে। তবে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা চলবে না। মনে রাখতে হবে ব্যায়াম যেন নিজেই চাপের কারণ না হয়।

ইগো ঝেড়ে ফেলুন

মানুষের ইগো একটি মারাত্মক জিনিস। কারণে অকারণে ইগো কমপ্লেক্স-এ ভুগবেন না। প্রথমে নিজেকে জয় করুন। নিজের অবস্থানকে বুঝতে চেষ্টা করুন। ইগো কমপ্লেক্স

মানসিক চাপের আরো একটি কারণ। সহজভাবে অন্যের সঙ্গে মেশার মানসিকতা গড়ে তুলুন। অভিযোজন ক্ষমতা বা এডাপটেশন পাওয়ার বাড়াতে সচেষ্ট হোন। খেয়াল করুন, আপনার কোনো কাজ বা আচরণ অন্যের মানসিক চাপের কারণ হচ্ছে কিনা।

মেধা বিনিয়োগ করুন

নিজের মেধা পরের ক্ষতির কাজে ব্যয় না করে তা নিজের উন্নয়নে ব্যয় করুন, দেখবেন তার ফলাফল আপনাকে আনন্দ দেবে। সুখী করবে। আপনার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। পরের ক্ষতিতে মেধা ব্যয় করলে তা এক সময় নিজেরই মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। শিল্পচর্চায় নিজের মনোযোগ বাড়ান। পাঠভ্যাস গড়ে তুলুন। এসব আপনার শুধু নিঃসঙ্গতা জনিত মানসিক চাপ দূর করবে না, অনেকের মধ্যে আপনাকে করবে অনন্য।

উপসংহার

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে মানসিক চাপ নিরাময়ের অন্তর্গত কৌশল। সেই কৌশল মোকাবেলা করবে মানসিক চাপের।

নিজেকে যেমন বুঝতে হবে, তেমনি অন্যকেও। সমস্যায় ভেঙ্গে না পড়ে, সমস্যার কারণ বুঝে সমাধানের চেষ্টা করুন। কোনো কাজে হাজার জনের পরামর্শের মুখাপেক্ষী না হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের মতামতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ান। বাস্তবমুখী হোন। এ সবই আপনার নিয়ন্ত্রণে। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার। এই সদিচ্ছা দিয়েই কমিয়ে আনা যায় মানসিক চাপ। সবার আগে প্রয়োজন সুস্থ দেহ। সুস্থ দেহেই থাকে সুস্থ মনের বাস। আর এই সুস্থ মনই পারে মানসিক চাপের মোকাবেলা করতে।

ডাঃ মোহিত কামাল

এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমফিল (সাইকিয়াট্রি)
ইএমডিআর ট্রেনিং (শাপিরো, ইউএসএ) এবং
সাইকোথেরাপি ট্রেনিং (নাসিরুল্লাহ, বিডি)
মনোরোগ স্নায়বিকরোগ ও মাদকাসক্তি বিশেষজ্ঞ
(সাইকিয়াট্রিস্ট), ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ
এন্ড রিসার্চ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

অন্যান্য ক্ষেত্র

১১ নভেম্বর ১৯৯৩, যায়যায়দিন এর সহযোগী পত্রিকা মৌচাকে ঢিল এর সেরা লেখক হিসাবে লেখালেখিতে আত্মপ্রকাশ।

দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশু সাহিত্য ও গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গবেষণা, চিকিৎসা-শিক্ষা, ও প্রশিক্ষণ কর্মক্রমের সাথে জড়িত।

শিশু সংগঠক-টেকনাফ প্রবাল কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি
কীভাবে ধারালো করা যাবে - বিদ্যাপ্রকাশ
ব্রেইনঅ্যাটাক অনিদ্রা ও মাথাব্যথা - বিদ্যাপ্রকাশ
The Mind of War-Injured Freedom Fighters of Bangladesh- বিদ্যাপ্রকাশ
কাছের তুমি দূরের তুমি (গল্পগ্রন্থ) - সময় প্রকাশন